ভলিউম-২
দ্বিতীয় খণ্ড
তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম ২

দ্বিতীয় খণ্ড

তিন গোয়েন্দা

১০, ১১, ১২

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ছত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-1282-8

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-2
Part-2
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

জলদস্যুর দ্বীপ ১

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ১৯৮৭

মৃদু ঢেউয়ে দুলছে দুটো জাহাজ—একটা ব্রিটিশ, নাম সাউথ আটলান্টিক, অন্যটা স্প্যানিশ, নাম সান্তা মারিয়া, গায়ে গা ঘষা লেগে আওয়াজ উঠছে ক্যাঁচকোঁচ, শোনা যাচ্ছে শেকলের ঝনাৎঝন। মোটা দড়ি দিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা বেঁধে রাখা হয়েছে, কখনও টানটান হয়ে যাচ্ছে দড়ি, ছেঁড়ে ছেঁড়ে অবস্থা, তার পরেই আবার একেবারে ঢিল হয়ে যাচ্ছে।

মাথার ওপর মস্ত খোলা আকাশ গাঢ় নীল, শুধু অনেক পশ্চিমে হিসপ্যানিওলা পর্বতের ধোঁয়াটে চূড়ার মাথায় তুলোর মত খানিকটা শাদা মেঘ, ধীরে ধীরে ভেসে আসছে এদিকে। জাহাজদুটোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে একটা অ্যালবেট্রস, তুষারশুভ্র ছড়ানো বিশাল ডানা স্থির, সামান্যতম কাঁপনও নেই পালকগুলোতে, কি এক অদ্ভুত কৌশলে বাতাসে ভেসে রয়েছে পাখিটা, নিচে কাচের মত পরিষ্কার পানিতে তার ছায়া ভেঙে যাচ্ছে ডলফিনের দাপাদাপিতে। কাছাকাছিই রয়েছে ঝাঁকটা, কখনও জাহাজের একেবারে কাছে চলে আসছে, পরক্ষণেই একে অন্যকে তাড়া করে সরে যাচ্ছে আবার দূরে।

জ্যান্ত এই ছবির সঙ্গে মানিয়ে গেছে চমৎকার স্প্যানিশ জাহাজটা—রাজকীয় একটা কাঠের গ্যালিয়ন, লাল আর রূপালী রঙ করা কাউন্টার, পেছনের উঁচু পুপ সোনালি, কিছু পাল মাখনরঙা, কিছু টকটকে লাল।

অন্য জাহাজটা ঠিক তেমনি বেমানান, বড় একটা ক্যানভাস, যেটা দিয়ে কামান ঢেকে রাখা হত, সেটা এখন দলেমুচড়ে পড়ে রয়েছে ভাঙা প্রধান মাস্তুলের গোড়ায়, তাতে অসংখ্য গুলির ফুটো। জাহাজের উজ্জ্বল রঙ জায়গায় জায়গায় মলিন করে দিয়েছে শুকনো রক্তের কালচে দাগ। ডেকে জমাট রক্তের মাঝে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে নাবিকদের লাশ, কেউ শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, কেউ মুখ গুঁজে পড়ে আছে ডেকে, কেউবা আবার চেয়ে আছে যেন গ্যালিয়নের পতাকাদণ্ডে উড়তে থাকা ভয়ঙ্কর পতাকাটার দিকে, তাতে আঁকা মানুষের হাড়ের একটা ক্রস, ক্রসের ওপর মড়ার খুলি—জলদস্যুর প্রতীকচিহ্ন। অতি সাধারণ একটা দৃশ্য ছিল এটা শতশত বছর আগে, ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের আমলে।

সাউথ আটলান্টিক আড়াইশো টনী জাহাজ, স্প্যানিশ মেঈন থেকে বাড়ি ফিরছিল, ইংল্যাণ্ডে, পথে দেখা হয়ে যায় সান্তা মারিয়ার সঙ্গে। সান্তা মারিয়া তখন ওই অঞ্চলের সাগরের ত্রাস লুই ডেকেইনির দখলে। লোকে বলে, লুই ডেকেইনি মানুষ না, মানুষরূপী খোদ ইবলিস, গায়ে ফরাসী ওলন্দাজের মিশ্র রক্ত, নাবিকেরা তার নাম শুনলেই আঁতকে উঠত তখন। কাউকে রেহাই দিত না। ডেকেইনি.

এমনকি শিশু আর বৃদ্ধরাও নিস্তার পেত না তার হাত থেকে, নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়ে যেত। সেই ডাকাতের কবলে পড়ল ব্রিটিশ জাহাজটা।

সেদিন ভোরে দিগন্তে দেখা দিল সান্তা মারিয়া, দূর থেকে দেখেই, চিনল সাউথ আটলান্টিকের ক্যাপ্টেন রিচার্ড হ্যারিসন। চমকে উঠল। মহাদানব দেখা দিয়েছে, নিস্তার পাওয়া মুশকিল! তাদের ভাগ্য খারাপ, হঠাৎ করেই বাতাস পড়ে গেল এই সময়, গতি কমে গেল জাহাজের। সান্তা মারিয়া জাহাজ বড়, তার পালও বড়, পালে হাওয়া বেশি লাগে, ফলে ব্রিটিশ জাহাজের চেয়ে গতি বেশি এখন তার।

দ্রুত এগিয়ে আসছে জলদস্যুর জাহাজ। বুঝে গেল ক্যাপ্টেন হ্যারিসন, তার দিন শেষ হয়ে এসেছে। ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইল, নাবিকদের ডেকে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিল, তাদেরকে বলল, মরতেই যখন হবে, বিনা লড়াইয়ে মরবে না, বীরের মত লড়ে যাবে শেষ অবধি, যে ক'টা ডাকাতকে শেষ করে দেয়া যায়, তা-ই লাভ।

বীরের মতই লড়ল হ্যারিসন আর তার দল। কিন্তু টিকল না বেশিক্ষণ। পিলপিল করে জাহাজে উঠে এল ডাকাতের দল, ঘিরে ফেলল। তারপর শুরু হলো পাইকারী গণহত্যা। ক্যাপ্টেনের হাতে খোলা তলোয়ার, মুখে ঈশ্বরের নাম। একে একে মারা গেল ব্রিটিশ জাহাজের সব নাবিক, পেছন থেকে মাথায় আঘাত খেয়ে হুমড়ি খেয়ে ডেকে পড়ে গেল হ্যারিসন...

মরল না ক্যাপ্টেন। তার সঙ্গীসাথীরা কেউ জীবিত নেই। ক্যাপ্টেনের ঠ্যাঙ ধরে হিড়হিড় করে সারা ডেকে টেনে হিঁচড়ে কষ্ট দিতে লাগল কয়েক ডাকাত মিলে, অন্যেরা লুটপাট চালাল জাহাজে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আনা হলো ডেকেইনির সামনে। স্প্যানিশ মেইই থেকে সহসা আর কোন জাহাজ ছাড়বে কিনা, ছাড়লে কোনদিকে যাবে, জানতে চাইল ডেকেইন। কিন্তু মুখে খিল এঁটে রইল ক্যাপ্টেন, কোন জবাবই দিল না। চাবুক দিয়ে তাকে যেভাবে খুশি পেটাল ডাকাতেরা, ক্যাপ্টেন অটল, টুঁ শব্দ করল না। শেষে ডাকাতরাই বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল। হাত পিছমোড়া করে বেঁধে, জাহাজের গা থেকে বের করে রাখা চওড়া একটা তক্তার ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো তাকে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের চেহারায় মৃত্যুভয় নেই, 'মেরে ফেলো বা যাই করো, থোড়াই কেয়ার করি!' এমনি ভাব ফুটে রয়েছে।

তার চেহারার এই ড্যাম কেয়ার ভাব দেখে চমকে গেছে ডাকাতেরা, থমথমে নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। শুধু মাছখেকো পাখির চিৎকার আর ঢেউয়ের মৃদু বিড়বিড় ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

খুনী লুই ডেকেইনি, যার অনেকগুলো ভয়ংকর নাম, সে-ও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ক্যাপ্টেনের দিকে। তার নাম শুনলেই লোকে আতকে ওঠে, চেহারা দেখে ভিরমি খায়, স্প্যানিশ মেইনের আতঙ্ক সেই দানব লুইয়ের সামনেও এতখানি অটল থাকছে কি করে লোকটা, এত আত্মবিশ্বাস কিসের! জানে মরবে, তবুও এত শান্ত রয়েছে কি করে ওই ইংরেজ ক্যাপ্টেন? কেমন যেন সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে ডেকেইনির মনে। ব্যাপারটা কি?

কোনমতে ঘাড় ঘুরিয়ে অনেক নিচের সাগরের দিকে চাইল একবার ক্যাপ্টেন, তারপর তাকাল আবার ডাকাতদের মুখের দিকে। তাদের চোখে ঘৃণা নেই, ভয় নেই, রয়েছে কেমন একটা দ্বিধা, জয়ের আনন্দ ফুটতে পারছে না ঠিকমত। ওদের দৃষ্টি স্থির ক্যাপ্টেনের কপালের দিকে। বন্দির ভুরুর ওপরে একটা রক্তাক্ত কাটা জখমের ওপরে উপরের আরেকটা জখম থেকে এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামছে, ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছে একটা ক্রুশ।

অশুভ সঙ্কেত! গুঞ্জন উঠল ডাকাতদের মাঝে, অদ্ভুত গুঞ্জন, বহুদূরের পাথুরে সৈকতে সাগরের ঢেউ ভাঙল যেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল শব্দ, কথা বলে উঠেছে ক্যাপ্টেন।

'নরকের কুত্তার দল!' চেঁচিয়ে বলল ক্যাপ্টেন, 'তোদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আরেক পূর্ণিমা দেখার সুযোগ পাবি না কেউ!'

রোদতপ্ত বাতাস চিরে দিল যেন ডাকাতদের মিলিত চিৎকার।

'গুলি করো!' ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কয়লার মত কালো এক নিগ্রো।

'পেররো! ভামো আ ভার!' চাপা গলায় গর্জে উঠল আরেক স্প্যানিয়ার্ড।

'গোড়ালিতে দড়ি বেঁধে উল্টো করে লটকে দাও!' গোঁ গোঁ করল একচোখো এক দানব।

'উডল···উডল চালাও, শিক্ষা হয়ে যাবে ব্যাটার!' পরামর্শ দিল আরেকজন।

'চুপ!' দস্যু-সর্দারের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন চাবুক মেরে নীরব করে দিল সবাইকে। সে তাকিয়ে রয়েছে ইংরেজ ক্যাপ্টেনের শান্ত হাসিহাসি মুখের দিকে। আশ্চর্য! মৃত্যুকে সামনে দেখেও ভয় পাচ্ছে না কেন লোকটা!

'আমার জাহাজ থেকে যেসব মোহর নিয়ে তোমার মোহরের সঙ্গে মিশিয়েছ,' ডেকেইনিকে বলল ক্যাপ্টেন, 'তার মধ্যে বিশেষ একটা ডাবলুন রয়েছে, মন্ত্রপূত অভিশপ্ত মোহর। তোমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল ডেকেইনি, মরেছ তোমরা। জোসেপ বউন-এর নাম নিশ্চয় শুনেছ, লালচুলো সেই বিখ্যাত দস্যু, ছায়ার মত যার গতিবিধি ছিল, গত হপ্তায় পোর্ট রয়ালে ধরে আনা হয়েছিলো তাকে। ওই মোহরটা ছিল তার পকেটে। মৃত্যুর আগে কি করেছে সে জানো? ফাঁসিকাঠে দাঁড়িয়ে মোহরটাতে তিনবার থুথু ছিটিয়ে অভিশাপ দিয়েছে সে—যার হাতেই যাবে ওই মোহর, ধ্বংস হয়ে যাবে সে, খুব দ্রুত।'

কেঁপে উঠল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নাবিকেরা, আবার উঠল ভয়ার্ত গুঞ্জন।

'সেই মোহরটা এই জাহাজেই আছে, ইংল্যাণ্ডে রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম,' বলে গেল ক্যাপ্টেন, 'আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। সাত দিনের বেশি টিকলাম না, তারমানে বউনের অভিশাপ কাজ করেছে। তোমাদেরও সময় ঘনিয়ে আসছে, রেহাই পাবে না কিছুতেই। তোমার ধনের সঙ্গে মোহর এখন মিশে গেছে। বাঁচতে হলে এখন সব মোহর ঢেলে ফেলে দিতে হবে সাগরে, সেটা করার কলজে তোমার হবে না। কাজেই মরেছ!'

জবান বন্ধ হয়ে গেছে ডাকাতদের। থমথমে হয়ে গেছে চেহারা, মনে মনে ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে কেউ কেউ, সবার মুখেই স্পষ্ট ভয়।

নীল আকাশের দিকে নীল চোখ তুলল ক্যাপ্টেন হ্যারিসন! 'ঈশ্বর, আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ। বউনের অভিশাপের সঙ্গে মিলিয়ে অভিশাপ দিচ্ছি আমি, মোহরের ধ্বংস-ক্ষমতা জোরালো করো, আরও আরও অনেক বেশি জোরালো, যতক্ষণ না...'

গর্জে উঠল ডেকেইনির পিস্তল, আগুনের একটা হলকা ছুটে এসে ঢুকে গেল ক্যাপ্টেনের বুকে।

কথা থেমে গেছে হ্যারিসনের, আকাশের দিকেই চেয়ে রয়েছে নীল চোখের তারা, ঠোঁট নড়ল সামান্য, তারপর স্থির হয়ে গেল। উল্টে ডিগবাজি খেয়ে দেহটা ঝপাং করে পড়ল পানিতে।

ছুটে এসে দাঁড়াল ডাকাতেরা রেলিঙের ধারে। লাশটা দেখা যাচ্ছে না, ডুবে গেছে, পানিতে অদ্ভুত একটা গোল ঢেউয়ের চক্র ক্রমেই ছড়িয়ে যাচ্ছে, ঠিক মাঝখান থেকে ফুট ফুট করে উঠছে লালচে বুদবুদ। মাস্তুল আর পালের দড়িতে বাড়ি খেয়ে গোঙানি তুলল এক ঝলক বাতাস।

'কি...কি হলো!' আঁতকে উঠল ডেকেইনি, মুখ রক্তশূন্য।

'বোধহয় অ্যালবেট্রস...' মুখ তুলে চেয়েই থেমে গেল কোয়ার্টার মাস্টার ব্ল্যাক জিউস। 'কই! নেই তো। কখন চলে গেছে! ...আরে, দেখো, দেখো!'

দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল ডাকাতেরা। পশ্চিম দিগন্তে, উত্তর-দক্ষিণ ছেয়ে দিয়েছে যেন গাঢ় বেগুনী একটা চওড়া মেঘলা, আকাশের নীল ঢেকে দিয়েছে, খুব নিচু দিয়ে ধেয়ে আসছে যেন ওদেরকেই গ্রাস করার জন্যে।

'জলদি!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল ডেকেইনি, 'জলদি জাহাজে গিয়ে উঠো! সব্বাই!' কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল তার কণ্ঠ থেকে, ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ।

•

হারিকেনের প্রথম ঝাপটায়ই ব্রিটিশ জাহাজের সঙ্গে বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেল ডেকেইনির জাহাজের। প্রচণ্ড ঝটকা দিয়ে ফুলে উঠল সামনের পাল, দড়ির টানে যেন উড়ে গিয়ে সাগরে পড়ল দু'জন ডাকাত, চোখের পলকে হারিয়ে গেল ফেনায়িত ঢেউয়ের তলায়। কাকতালীয় ঘটনাই বোধহয়, এই দুজন বেশি কষ্ট দিয়েছিল ইংরেজ ক্যাপ্টেনকে। ব্যাপারটা অন্য নাবিকদের চোখ এড়াল না। ওরা ধরে নিল, এতে ঈশ্বরের হাত রয়েছে। আবার ঝাপটা দিল ঝড়ো বাতাস, এত জোরে বাতাস বইতে আগে কখনও দেখেনি ডাকাতেরা। সান্তা মারিয়ার নাক ঘুরে গেল সাঁই করে, হালকা একটা শোলা যেন এতবড় জাহাজটা! পাহাড় সমান ঢেউ ফুঁসে উঠল, আছড়ে পড়ল জাহাজের ওপর, প্রধান মাস্তুলের প্রায় অর্ধেকটাই ডুবে গেল সে ঢেউয়ে, অনেক কষ্টে যেন নাকানি-চোবানি খাওয়া ইঁদুরের মত ভেসে উঠল আবার জাহাজ।

সাত দিন সাত রাত ধরে বইল ভয়াবহ ঝড়, নয়জন ডাকাত মরল, বাকি যারা রইল জাহাজের পানি সেচা তো দূরের কথা, তাদের দাঁড়ানোরও ক্ষমতা নেই আর। টলতে টলতে ক্যাপ্টেনের কাছে এসে বলল কোয়ার্টার মাস্টারঃ সমস্ত মোহর ফেলে দিন, নইলে বাঁচব না একজনও।

রাজি হলো না ডেকেইনি।

চেঁচিয়ে শাসাতে শুরু করল ব্ল্যাক জিউস, পেছনে অন্যেরা এসে দাঁড়াল, তারাও কণ্ঠ মেলাল কোয়ার্টার মাস্টারের সঙ্গে। জিউসকে গুলি করে মারলেন ডেকেইনি।

আট দিনের দিন বাতাস পড়ে গেল, কাচের মত স্থির শান্ত পানিতে চুপচাপ ভেসে রইল জাহাজ। অবস্থা কাহিল। খাবার আর পানির সমস্যা দেখা দিল। পানিতে নোনা পানি মিশে গেছে, মাংস আর রুটি পচে ফুলে উঠেছে, পোকা কিলবিল করছে তাতে, খাওয়ার অযোগ্য। বিড় বিড় করে কার উদ্দেশ্যে গাল দিল ডাকাতেরা, কে জানে।

সন্ধে নাগাদ দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা। একদল চায়, সমস্ত মোহর পানিতে ফেলে দেয়া হোক, তাতে জীবন বাঁচলেও বাঁচতে পারে; আরেক দল অত ভয় পেল না, তারা ডেকেইনিকে সমর্থন করল। তর্ক-বিতর্ক থেকে মারাত্মক লড়াই, তারপর খুনজখম, খতম করে দেয়া হলো বিদ্রোহীদের। জলদস্যুর নিয়ম অনুযায়ী সাগরে ফেলা হলো লাশগুলো। স্থির সাগর আর স্থির রইল না, জাহাজের আশপাশে কিলবিল করতে লাগল শ'য়ে শ'য়ে হাঙর।

পরের ছয় দিনে আরও অনেক দল পাল্টাল, বিদ্রোহী হয়ে উঠল, আগের সঙ্গীদের পরিণতি হলো এদেরও। যারা মরল, তারা বরং বেঁচে গেল। যারা বেঁচে রইল, তাদের খাবার নেই, পানি নেই, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে ফাটে। অগত্যা রামের বোতল খুলে গলায় ঢালল কড়া মদ, কণ্ঠনালী জ্বালিয়ে দিল যেন তরল আগুন, ডেকে গড়াগড়ি খেতে লাগল সবাই। নেশার ঘোরে অন্তত খিদের কষ্ট আর তৃষ্ণা ভুলে রইল। দুর্বল কণ্ঠে বিখ্যাত জলদস্যু মরগানের গান ধরলঃ

'ইফ দেয়ার বি ফিউ অ্যামাংস্ট আস
আওয়ার হার্টস আর ভেরি গ্রেট;
অ্যাণ্ড ইচ উইল হ্যাভ মোর প্লাণ্ডার,
অ্যাণ্ড ইচ উইল হ্যাভ মোর প্লেট।'

কিন্তু পরের দিনই আর 'হার্ট' ততবড় থাকল না, নেশা ছুটে গেছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা পাগল করে তুলল যেন ওদের। শিস দিয়ে সঙ্গীদের চাঙা করে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল লুই ডেকেইনি। কাচের মতই সমতল রয়েছে এখনও সাগর। শিস দিয়েই বাতাসকেও আমন্ত্রণ জানাল ডেকেইনি, কিন্তু বাতাসও সাড়া দিল না তার ডাকে।

সাগরকে রক্তাক্ত করে দিয়ে যেন মস্ত একটা রক্তলাল সূর্য অস্ত গেল সেদিন, মাথায় লাল একটা বড় রুমাল বেঁধে একজন সহকারীকে ডাকল সর্দার। সারাদিন রাম গিলেছে, গলা শুকিয়ে সিরিশ কাগজের মত খসখসে হয়ে আছে, জানাল সঙ্গীদেরকে। আরও এক বোতল এনে দেয়ার অনুরোধ করল। বোতল এনে দিল লোকটা। কিন্তু মুখে তুলল না সর্দার, রেলিঙে হাত রেখে শান্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে সাগরের দিকে। হাতটার দিকে ভালভাবে নজর পড়তেই চমকে উঠল লোকটা, চোখ বড় বড় হয়ে গেল, সর্দারের হাতের উল্টো পিঠে শাদা ধুলো লেগে রয়েছে যেন, একটা গোল দাগ!

ডেকেইনির এই সহকারী পোড়খাওয়া নাবিক, অনেক দেখেছে অনেক শুনেছে, জাতে ফরাসী। ছুটে গেল সে সহকারীদের কাছে। মুখ ছাই, চোখ ঠিকরে বেরোবে যেন, বলল, 'ওকে···প্লেগে ধরেছে!' এটুকু বলেই চুপ হয়ে গেল।

ডয়েল, এক-হাত-ওয়ালা এক কামানবাজ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, গাল দিয়ে উঠল অস্ফুট স্বরে, অনেক সাগর ঘুরেছে সে, অভিজ্ঞতা আছে অনেক, জানে এখন কি করা দরকার। টান মেরে খাপ থেকে ছুরি বের করল, কিন্তু খপ করে তার হাত চেপে ধরল ফরাসী ডাকাত, কাঁধের ওপর দিয়ে একবার চট করে তাকিয়ে দেখল ডেকেইনি দেখছে কিনা।

সে-রাতে, নেশায় বিভোর হয়ে আছে ডেকেইনি, এই সময় চুপি চুপি নৌকা নামাল তার অবশিষ্ট নাবিকরা—এই একটি মাত্র নৌকাই ঝড়ের কবল থেকে রেহাই পেয়েছে, জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল সাগরে ধীরে ধীরে দাঁড় বেয়ে পালাল ওরা, জানে না, কড়া রোদ নৌকার কাঠের সর্বনাশ করে দিয়েছে, প্রতিটি জোড়া প্রায় আলগা। তবে সেটা জানল শিগগিরই। পুরো তিনটি দিন অমানুষিক পরিশ্রম করল ওরা, পালা করে কেউ দাঁড় বাইল, কেউ পানি সিঁচল, তারপর তাদেরকে তুলে নিল একটা স্প্যানিশ জাহাজ। কয়েকটা প্রশ্ন করেই জেনে নিল ক্যাপ্টেন, ওরা কারা। আর একটি কথা না বলে দস্যুদেরকে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দিল ফাঁসিতে।

জেগে উঠে দেখল ডেকেইনি, সবাই চলে গেছে তাকে ফেলে, একটা রামের বোতলও রেখে যায়নি। সারাটা দিন অদ্ভুত এক তন্দ্রার ঘোরে কেটে গেল তার, রাতে আবার ঝড় এল, তুমুল ঝড়। খানিকক্ষণ একাই জাহাজটাকে সামলানোর চেষ্টা করল, কিন্তু হাল ছেড়ে দিতে হলো শিগগিরই। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, হাঁপাতে হাঁপাতে কেবিনে এসে ঢুকল সে।

ঘুম ভাঙলে খেয়াল করল ডেকেইনি, ঢেউয়ের দোলা থেমে গেছে, জাহাজ প্রায় স্থির। অবাকই লাগল তার। ডেকে বেরিয়ে হাঁ হয়ে গেল। একটা দ্বীপের ধারে চলে এসেছে জাহাজ, অনেক বড় দ্বীপ, এমাথা-ওমাথা দেখা যায় না। একটা প্রাকৃতিক বন্দরে ঢুকেছে জাহাজ, চারদিকে পাহাড়, কি করে ঢুকল এখানে? ভাল করে দেখল···না না, চারদিকে পাহাড় নয়, একদিকে খোলা আছে, পথটা এত সরু, কোনমতে ঢুকতে পেরেছে জাহাজ।

তিনদিক থেকে ঘিরে রাখা ধূসর পাথুরে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল, জাহাজটা যতখানি উঁচু ঠিক ততখানি, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় দেয়াল, ইচ্ছে করলে জাহাজ থেকে লাফিয়ে নামা যায় ওখানে, অবশেষে নামলও ডেকেইনি। সরু একটা গিরিপথমত রয়েছে সাগরেরে দিকে···সাগর দেখতে পাচ্ছে না, তবে ঢেউয়ের শব্দ কানে আসছে, ওই পথেই ঝড়ের সময় ঢুকেছে জাহাজ, এসে পড়েছে পাহাড়ঘেরা ছোট্ট খাঁড়িতে। জায়গা ভালই, কিন্তু প্রথমে দেখা দরকার; ঘন জঙ্গলে মানুষখেকো আদিবাসীরা লুকিয়ে আছে কিনা। পানির ধার ঘেঁষে থাকা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ডেকেইনি, দেখে শুনে নিশ্চিত হলো, আর কোন মানুষ নেই। পাহাড়ের বেশ ওপরে একটা পাথরে আরাম করে বসে চারপাশটা দেখল সে, খুশি হলো, চমৎকার জায়গা। মরগানের গানটা মনে পড়তে হাসল মনে মনে। এখন সে ছাড়া আর কেউ

নেই মোহরের ভাগ নেয়ার, যা আছে সব তার একার। আর হ্যাঁ, জাহাজটা খাঁড়িতে ঢুকতে যখন পেরেছে, এখান থেকে বেরোতেও পারবে। সে একাই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে জাহাজ, তবে তার আগে শরীরের শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। নিশ্চয় খাবার আর পানি আছে দ্বীপে। প্রচুর খাবার নিয়ে তুলতে পারবে জাহাজে, পিপেগুলোতে পানি, তারপর কোন এক সুদিন দেখে পাল তুলে দিয়ে খোলা সাগরে ভেসে পড়লেই হলো। দেখিয়ে ছাড়বে সে তার সঙ্গীদেরকে, যদি কেউ বেঁচে থাকে তখনও, সে একাই একশো, তাদের মত কাপুরুষ নয়।

কোন জায়গায় রয়েছে, ম্যাপ দেখে অনুমান করল ডেকেইনি। খাবার আর পানি পাওয়া গেছে, পেট ঠাণ্ডা, ফলে মাথাও ঠাণ্ডা। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা ভয়ের একটা স্রোত নেমে গেল তার। আশ্চর্য! এতক্ষণ মনে পড়েনি কেন? সেই অভিশপ্ত মোহর! ওটা রয়েছে মোহরের স্তূপে! ব্যাপারটাকে কুসংস্কার বলে আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারছে না এখন। ওরকম সাংঘাতিক একটা জিনিস নিয়ে আবার সাগরে ভাসতে সাহস হলো না তার। উপায়? সহজ একটা উপায় আছে। সব মোহরগুলো দ্বীপেরই কোথাও লুকিয়ে রেখে যাবে। তারপর ভাল মজবুত আরেকটা জাহাজ আর দুঃসাহসী একদল নাবিক নিয়ে আবার ফিরে আসবে, এবার এমন লোক আনবে, যারা আগের নাবিকদের মত কাপুরুষ নয়।

গর্ত খুঁড়ে তাতে মোহর লুকিয়ে রাখত তখন লোকে, কিন্তু ডেকেইনি অত খাটুনির দরকার মনে করল না। পাহাড়ের গায়ে একটা গর্ত খুঁজে বের করল, গোটা তিনেক পিপে একটার ওপর আরেকটা রাখা যাবে গর্তে। মোহরের স্পর্শ উত্তেজনা জাগায় তার, কিন্তু এখন লাগছে ভয়, অস্বস্তি, প্রায় প্রতি খাবলা মোহর থেকেই একটি মোহর তুলে নিয়ে সাবধানে দেখছে, মনে হচ্ছে এটাই বুঝি সেই অভিশপ্ত মোহর! ক্যানভাসের ওপর মোহর রেখে; চারটে কোনা এক করে বেঁধে পোঁটলা বানাল সে। একটা খালি পিপে রেখে এল গর্তে, তারপর পোঁটলা কাঁধে করে নিয়ে চলল। পোঁটলার সমস্ত মোহর পিপেয় ঢেলে আরও নিতে এল। নিয়ে গেল আরেক পোঁটলা। জাহাজে মোহরের স্তূপ যতই ছোট হয়ে আসছে, মন ভারমুক্ত হয়ে যাচ্ছে তার, হারামী মোহরটা বোধহয় চলে গেল জাহাজ থেকে, আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আগুন ঢালছে যেন সূর্য। কাজ করতে করতে ঘেমে নেয়ে গেল ডেকেইনি। কিন্তু অবশেষে শেষ হলো মোহর স্থানান্তর। কাজ শেষ করে, পাহাড়ে উঠে আরেকবার ভালমত দেখল চারপাশটা, দিক চিহ্ন গেঁথে নিচ্ছে মনে। ফিরে এলে সহজেই যাতে গর্তটা খুঁজে পায়।

জাহাজে এসে কেবিনে ঢুকে কাগজ-কলম বের করল। নিখুঁত একটা ম্যাপ এঁকে নেবে, শুধু চোখের আন্দাজের ওপর ভরসা রাখতে চায় না। প্রায়ই ঝড় বয় এদিকে, সে যখন ফিরে আসবে, দ্বীপের এখনকার চেহারা তখন না-ও থাকতে পারে, তাই যেসব জিনিস সহজে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই, ওগুলোকেই প্রধান চিহ্ন ধরে এঁকে ফেলল ম্যাপ।

হঠাৎই খেয়াল করল যেন সে বড় বেশি নীরব অঞ্চলটা! উত্তাপ নেমে যাচ্ছে

দ্রুত, বাইরে প্রখর রোদ অথচ শীত লাগছে তার, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আবার অস্বস্তি ফিরে এল মনে। হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ল। জোর করে মন থেকে ভয় তাড়াল সে, খুনী লুই আর যাই হোক, কাপুরুষ, একথা যেন কেউ কখনও বলতে না পারে।

ডেকে বেরিয়ে দেখল, চারদিক নির্জন, সেই আগের মতই। যতদূর চোখ যায়, সন্দেহজনক কিছু দেখা যাচ্ছে না, পাথরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মৃদু গুমরানি ছাড়া আর কোন শব্দও নেই। আপন মনেই মাথা ঝাঁকিয়ে আবার কেবিনে ঢুকতে যাবে, চমকে উঠল একটা তীক্ষ্ণ শব্দে।

ঠিক জাহাজের ওপরেই ভেসে রয়েছে মস্ত একটা অ্যালবেট্রস! অতি পরিচিত মনে হলো পাখিটাকে। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ডেকেইনির। সত্যি দেখছে তো, নাকি কল্পনা? ওই পাখিটাকেই দেখেছিল না 'সাউথ আটলান্টিক' দখল করার সময়? আরে দূর, যত্তসব কুসংস্কার!—মনকে বোঝাল সে। কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিয়ে তুলল পাখিটাকে গুলি করার জন্যে।

ডেকেইনির মনের কথা পরিষ্কার পড়তে পারছে যেন পাখিটা, ছায়ার মত নিঃশব্দে দ্রুত ভেসে সরে গেল সীমার বাইরে।

পাখিটার আসার অপেক্ষায় রইল ডেকেইনি।

সীমার বাইরে খানিকক্ষণ ভেসে বেড়াল অ্যালবেট্রস, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল আবার। মাঝে মাঝে বিষণ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠছে, মাথা নাড়ছে জ্ঞানী মানুষের ভঙ্গিতে।

জোরে থুথু ফেলল ডেকেইনি, ভয় তাড়াচ্ছে আসলে মন থেকে। জীবনে এই প্রথমবার সত্যি ভয় পেয়েছে সে। দুই লাফে কেবিনে এসে ঢুকল আবার, মোটা একটা মোমের গায়ে পিস্তলটা কক-করা অবস্থায়ই ঠেস দিয়ে রেখে পালকের কলম তুলে নিল, দু'তিন টানে এঁকে শেষ করল ম্যাপটা। কালি বাড়াতে গিয়েই ঘটল ঘটনাটা। তার জামার আস্তিনের একটা খাঁজ থেকে ঠুনন্ করে টেবিলে পড়ল একটা জিনিস। ধড়াস্ করে বুকের খাঁচায় বাড়ি মারল ডেকেইনির হৃৎপিণ্ড, দম বন্ধ করে ফেলেছে, ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন চোখ। একটা সোনার মোহর!

কয়েক মুহূর্ত মোহরটার দিকে চেয়ে রইল ডেকেইনি, বিশ্বাস করতে পারছে না। অস্ফুট একটা শব্দ করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, মোহরটার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে যেন তাকে জিনিসটা। সে জানে, ওটা কি! কোনভাবে এই সাংঘাতিক জিনিসটা তার আস্তিনের খাঁজে আটকে গিয়েছিল, যেন ইচ্ছে করেই, মোহরটা যেন জীবন্ত, জানে-বোঝে সব কিছুই। অনুমান করল ডেকেইনি, এটাই সেই অভিশপ্ত মোহর, যার গায়ে তিনবার থুথু ছিটিয়েছিল বাউন। কিন্তু কেন তার হাতায় আটকাল? কেন পিপেতে পড়ল না?

মোহরটার দিকে কাঁপা কাঁপা হাত বাড়াল ডেকেইনি, খেয়ালই করল না, টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে সে, তার শরীরের কাঁপুনিতে টেবিল কাঁপছে, মোমের গায়ে ঠেশ দিয়ে রাখা পিস্তলটা ধীরে ধীরে নড়ছে, ঘুরে যাচ্ছে নলের মুখ। ভারসাম্য হারিয়ে একসময় খটাশ করে পড়ল পিস্তল, গর্জে উঠল। রক্তলাল একটা আগুনের শিখা ছিটকে বেরোল কালো নলের মুখ থেকে, সোজা ছুটে এল ডেকেইনির বুক

লক্ষ্য করে। পোড়া বারুদের গন্ধ বাতাসে।

পুরো তিন সেকেণ্ড যেন কিছুই টের পেল না ডেকেইনি, বুকের কাছে তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা শুরু হলো, বাড়ানো ডান হাতটা বাড়ানোই থেকে গেল, চোখ মোহরের দিকে স্থির, কোনরকম প্রতিক্রিয়া নেই তার মাঝে। ব্যথা শুরু হতেই বাঁ হাত চেপে ধরল বুকে, ধীরে ধীরে হাতটা তুলে আনল চোখের কাছে। রক্ত! এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল সে, গুলি খেয়েছে! রক্ত সরে গেল মুখ থেকে, ঝড়ো-বাতাসে-লতার-মত কেঁপে উঠল তার শরীর, ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। দুই হাত চেপে ধরেছে ক্ষতস্থানে, দেখতে পাচ্ছে, গল গল করে বেরিয়ে যাচ্ছে তাজা রক্ত, জীবনীশক্তি নিঙড়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। কোন উপায় নেই···ঠেকানোর কোন উপায় নেই···

ধীরে, অতি ধীরে সামনের দিকে ঝুলে পড়তে শুরু করল তার মাথা, চোখে রাজ্যের ঘুম, দু'হাত টেবিলে বিছিয়ে তাতে কাত করে মাথা রেখে নীরবে যেন ঘুমিয়ে পড়ল দস্যু-সর্দার। হাতের রক্ত গালে লেগেছে, তাতে একটা মাছি বসল। নড়ল না ডেকেইনি, তাড়ানোর কোন চেষ্টা নেই। আরামে বসে রক্ত চুষতে থাকল মাছিটা। ওটার দেখাদেখি আরেকটা এসে বসল, আরেকটা, আরও একটা···দেখতে দেখতে মাছির জটলা জমে গেল, তবুও নড়ল না এককালের মহাপরাক্রমশালী দস্যু, খুনী লুই।

কেবিনের খোলা জানালায় চকিতের জন্যে একটা শাদা ছায়া দেখা গেল, জানালার একেবারে ধার ঘেঁষে উড়ে গেল অ্যালবেট্রসটা, তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল। এসবের কিছুই দেখল না, শুনল লুই ডেকেইনি। গাঢ় নীল আকাশে ধবধবে শাদা ডানা মেলে দিয়ে উড়ে চলল পাখিটা, দূর হতে দূরে, মিলিয়ে গেল একসময় দিগন্তে।

ইংরেজ ক্যাপ্টেন রিচার্ড হ্যারিসনের মৃত্যুর পর ডেকেইনির জাহাজে যত অঘটন ঘটেছে, সেগুলোর অভিশপ্ত মোহরের জন্যে না-ও হতে পারে। অভিশাপের ফলেই ঝড় এসেছে, এটা মনে করারও তেমন কোন কারণ নেই, ঝড়টা হয়তো এমনিতেই আসত, কারণ হঠাৎ করে বাতাস পড়ে গিয়েছিল—ঝড়ের পূর্বাভাস, যার ফলে পালাতে পারেনি ব্রিটিশ জাহাজটা, বারক জাতীয় জাহাজ ওটা, বাতাস ঠিক থাকলে সান্তা মারিয়ার চেয়ে গতিবেগ অনেক বেশি হত, ধরতে পারত না হয়তো ডেকেইনি। এমনও হতে পারে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ডাকাতদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে ক্যাপটেন হ্যারিসন, আর তাতেই একের পর এক অঘটন ঘটিয়েছে তারা। তবে প্রত্যক্ষভাবে যদিও বা না হয়, পরোক্ষভাবে ওসব অঘটনের জন্যে মোহরটা যে দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাই হোক, বছরের পর বছর পেরোল, প্রকৃতিতে নানারকম পরিবর্তন এল, গেল। কত সূর্য উঠল, ডুবল, বৃষ্টি এল, বাতাস বইল, এত কিছুই হলো, কিন্তু লুই ডেকেইনির পর আর দীর্ঘ দিন কোন মানুষ এল না সেই দ্বীপে। জাহাজটা আর দেখা যায় না এখন, তার ওপর লতাগুল্ম জন্মেছে, ডাল পাতা পড়েছে, ঢাকা পড়ে গেছে গ্যালিয়ন।

রাজা দ্বিতীয় জেমস যখন ইংল্যাণ্ডে রাজত্ব করছেন, তখন একদিন ভীষণ ঝড় বইল, ছোট্ট খাঁড়ির যে একটা দিক খোলা ছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল পাথর ধসে পড়ে, সাগরের পানি ঢোকার আর কোন পথই রইল না। অদ্ভুত একটা কবরে যেন গোর হয়ে গেল জলদস্যুর জাহাজের।

আরও বছর গেল। আরও অনেক জঞ্জালের নিচে চাপা পড়ল ডেকেইনির জাহাজ। রানী অ্যানের যেদিন অভিষেক হলো, তিনি মাথায় মুকুট পরলেন, সেদিন ভেঙে পড়ল জাহাজের সমস্ত মাস্তুল, লতাপাতা ছিঁড়ে একাকার করল, তারপর ওগুলোও আবার ঢাকা পড়তে শুরু করল নতুন লতা পাতায়। রাজা প্রথম জর্জের আমলে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল জাহাজ, ওটার আর কোন চিহ্নই দেখা যায় না বাইরে থেকে।

রাজা দ্বিতীয় জর্জের আমলে একটা জাহাজ এসে ভিড়ল দ্বীপে, পানি ফুরিয়ে গেছে, পানি দরকার নাবিকদের। পানি নিয়ে চলে গেল তারা, দ্বীপের গোপন রহস্য গোপনই রয়ে গেল।

রাজা তৃতীয় জর্জের আমলে কয়েকটা জাহাজ এসে ভিড়ল এক সঙ্গে—ইতিমধ্যে একশো বছর পেরিয়ে গেছে, তারাও জানল না দ্বীপের রহস্য। পানি আর খাবার দরকার, জোগাড় করে নিয়ে চলে গেল।

বছর গেল। রাজা চতুর্থ জর্জের সময় জাহাজডুবি হয়ে এক নাবিক এসে আশ্রয় নিল ডেকেইনির দ্বীপে। পুরো একটা বছর নিঃসঙ্গ জীবন কাটাল সে ওখানে। কিন্তু এতদিনেও দ্বীপের গোপনীয়তা গোপনই রইল তার কাছে। একদিন একটা জাহাজ এল, সেই জাহাজে করে দেশে ফিরে এল নাবিক ভিখিরির মত মরার জন্যে। কোনদিনই জানল না, সাত রাজার ধন হাতের কাছেই ছিল তার একটি বছর।

বছর পেরোল। রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের রাজত্ব শেষ হলো, এলেন রানী ভিক্টোরিয়া, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডও গেলেন, পঞ্চম জর্জ গেলেন, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসলেন রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড, তখনও দ্বীপ তার গোপনীয়তা ফাঁস করল না। রাজকোষের মোহরের একটা মস্ত স্তূপ লুকিয়েই রেখে দিল খাঁড়ির কবর!

একদিন রাজা ষষ্ঠ জর্জ বসলেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে। তারও অনেক পরে দ্বীপে নামল কয়েকজন মানুষ।

অবশেষে, প্রায় তিনশো বছর পর গোপনীয়তা ফাঁস না করে আর পারল না জলদস্যুর দ্বীপ।

দুই

চিলেকোঠার জানালার কাচে নাক ঠেকিয়ে বন্দরের কালো পানির দিকে শূন্য চোখে চেয়ে আছে বব কলিনস। নভেম্বরের সন্ধ্যা নামছে, তার জীবনে আরেকটা বিষণ্ন সন্ধ্যা। বাইরে মন খারাপ-করে-দেয়া-ঝিরঝিরে বৃষ্টি। মাত্র পনেরোটা শীতকাল পেছনে ফেলে এসেছে বব, সামনে আরও কত শীত পড়ে রয়েছে কে জানে। ভাবতেই কালো হয়ে গেল তার অপুষ্ট রক্তশূন্য ফেকাসে মুখ।

সুখ কাকে বলে জানে না বব, সোনালি স্মৃতি হয়ে রয়েছে শুধু হাতে গোণা কয়েকটা ঘণ্টা, সেই যে, দূর সাগর থেকে অনেক দিন পর যখন দেখা করতে এসেছিল তার নাবিক বাবা, তখনকার স্মৃতি। বাবার পথ চেয়ে আর কখনও দিন গোণার প্রয়োজন হবে না, রোজ সকালে খবরের কাগজের পাতা উল্টে 'সী-ওয়েভ' জাহাজটার টাইম-টেবল দেখারও কোন কারণ নেই আর। পানি জমল চোখের কোণে, ফোঁটা বড় হয়ে গাল বেয়ে নামল, চিবুক থেকে ঝরে পড়ল টপটপ, কিন্তু মুছল না বব, পাথর হয়ে গেছে যেন।

এই চিলেকোঠায়ই ববের জন্ম। তার মা যখন মারা গেল তখন তার বয়েস তেরো, বাবা দূর সাগরে, কোন খোঁজখবর নেই, সেই থেকেই জীবনযুদ্ধে বব একা, খবরের কাগজ বিক্রি করে পেট চালায়। তার ছোট করে ছাঁটা সোনালি চুলে সন্ধ্যার ছায়া, ঘন নীল মায়াময় চোখের তারা নিষ্প্রভ।

খবরের কাগজে জাহাজ দুর্ঘটনার কথা জানল যে-রাতে বব, দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি, বিছানায় শুধু এপাশ ওপাশ করেছে সারা রাত। বাবার মঙ্গল কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে। কয়েক হপ্তা পর এল সুসংবাদ, সী-ওয়েভের দু'তিন জন ভাগ্যবানের মাঝে তার বাবা একজন, সুস্থ হয়ে উঠছে বোসটনের এক হাসপাতালে। তখুনি ছুটে যেতে ইচ্ছে করেছিল তার, কিন্তু গাড়ি ভাড়া জোগাড় করতে পারেনি।

এটা কয়েক হপ্তা আগের ঘটনা। তারপর, এই ঘণ্টাখানেক আগে এসেছে দুঃসংবাদ, খবর নিয়ে এসেছে এক নাবিক, অনেক খুঁজেপেতে বের করেছে ববের চিলেকোঠা। একটা চিঠি নিয়ে এসেছে ববের বাবার কাছ থেকে, ওই তো, ঘরের কোণে পুরানো নড়বড়ে টেবিলটায় পড়ে আছে খামে ভরা চিঠিটা। মুমূর্ষু এক নাবিকের শেষ অনুরোধ ফেলতে পারেনি আরেক নাবিক, পৌঁছে দিয়েছে চিঠিটা। লোকটা দেরি করেনি, দু'চারটা কথা বলেই বিদায় নিয়েছে, তার নামও জিজ্ঞেস করা হয়নি।

নাবিক বলে গেছে, হাসপাতালে মারা যায়নি ববের বাবা, মারা গেছে সাগরতীরের ছোট্ট এক সরাইখানায়। ভাল হয়ে উঠেছে তখন কলিনস, বন্ধুত্ব হয়েছে নাবিকের সঙ্গে, দু'জনে মিলে আবার জাহাজে চাকরি খুঁজেছে, পেয়েও গিয়েছিল চাকরি। পরদিনই চলে যেত সরাইখানা ছেড়ে, কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল ঘটনা। গভীর রাতে পাশের ঘরে গোঙানি শুনে ঘুম ভেঙে যায় নাবিকের, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখে বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে কলিনস, রক্তে মাখামাখি, পিঠে বিঁধে আছে একটা বড় ছুরি। নাবিককে দেখে কাছে ডাকল, একটা চিঠি হাতে তুলে দিয়ে অনুরোধ করল, ওটা যাতে তার ছেলের কাছে পৌঁছে দেয়, ববের চিলেকোঠার ঠিকানাও দিল বিড়বিড় করে কোনমতে।

নাবিক কি মিছে কথা বলেছে? কিন্তু কেন বলবে? না, তেমন কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না বব।

ভয়ে চিঠিটা খুলছে না সে, এখনও ক্ষীণ আশা রয়েছে, তার বাবা মারা যায়নি। কিন্তু চিঠি খুলে পড়লেই হয়তো ওই আশাটুকুও থাকবে না। গত এক ঘণ্টায় বার

বার চিঠিটা হাতে নিয়েছে সে খোলার জন্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি, আবার রেখে দিয়েছে। ভারি বেশ পুরু চিঠি, খামের ওপর পেনসিলে অস্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে ববের নাম-ঠিকানা। বাবার হাতের লেখা চেনে বব, খামের ওপরে লেখার সঙ্গে ঠিক যেন মেলে না। না মেলারই কথা। আহত অসুস্থ একজন লোক লিখতে যে পেরেছে, এই যথেষ্ট, হাত কেঁপেছে, গুটি গুটি করে সুন্দর অক্ষরে লিখবে কি করে?

জাহাজে ভেঁপুর তীক্ষ্ণ শব্দে চমক ভাঙল ববের, জানালা থেকে নাক সরাল। দেখল, গভীর সাগরে চলাচলকারী একটা ট্র্যাম্প স্টীমার ধীরে ধীরে এসে লাগছে বন্দরে, ধূসর অন্ধকারে মস্ত এক জলদানব যেন উঠে এসেছে সাগরের তল থেকে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ববের, দৃশ্যটা মোটেই সুখকর নয়, এই মুহূর্তে আরও খারাপ লাগছে, বিষণ্নতর করে তুলেছে পরিবেশ। বাইরে বৃষ্টিপাত আরও হীম হয়েছে, ধোঁয়াটে একটা ভেজা চাদর যেন ঝুলে রয়েছে বাতাসে। রাস্তাঘাটে প্যাচপ্যাচে কাদা, হুসহুস করে পানি ছিটিয়ে কদাচিত চলে যাচ্ছে একআধটা গাড়ি। বাড়িঘরে আলো জ্বলে উঠছে, ঘোলাটে হলুদ মিটমিটে আলো।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। বিরক্তিকর দৃশ্য থেকে চোখ ফেরানোর সুযোগ পেয়ে যেন বেঁচে গেল বব, মনে পড়ল, এমনি এক সন্ধ্যায়ই সিঁড়িতে ভারি বুটের শব্দ উঠেছিল মচমচ করে, দরজা খুলে গিয়েছিল ঘরে ঢুকেছিল তার বাবা। মনে আশার দোলা, আহা, এখনও যদি তাই হত!

চিলেকোঠার দরজার কাছে এসে থামল পায়ের শব্দ। কে? নাবিক কি আবার ফিরে এসেছে? ভুলে গিয়েছিল কোন কথা বলার জন্যে এসেছে? কি জানি কেন, প্রথমেই চিঠিটার ওপর চোখ পড়ল ববের, এক লাফে গিয়ে খামটা তুলে নিয়ে ফেলে দিল পুরানো কাগজপত্রের স্তূপে। ঠিক এ সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা।

লোকটাকে দেখে পিছিয়ে গেল বব। হিমশীতল চোখে তাকিয়ে রইল আগন্তুক এক মুহূর্ত, তারপর ঘরে ঢুকল। মানুষ না, যেন এক গরিলা। চওড়া কাঁধ, লম্বা রোমশ হাত হাঁটু ছুঁয়েছে প্রায়, মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে। আধুনিক মানুষের সঙ্গে চেহারার মিল খুবই কম, সভ্য মানুষের পোশাক পরে গুহা থেকে জ্যান্ত হয়ে উঠে এসেছে যেন এক প্রাগৈতিহাসিক গুহামানব। বাঁ কানের নিচ থেকে কাস্তের মত বাঁকা হয়ে এসে ঠোঁটের কোণে মিশেছে গভীর কাটা দাগ। ঘন ভুরু, চুল আর গায়ের রোমের মতই লালচে। ময়লা নীল জারসি দেখেই অনুমান করা যায়, লোকটা নাবিক।

স্থির দৃষ্টিতে একে অন্যকে দেখল দু'জনে।

'নাম কি?' খসখসে গলা লোকটার।

'বব…বব কলিন্স,' দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর, গলা কাঁপছে তার।

'রিক কলিন্সের ছানা?'

মাথা ঝাঁকাল বব।

'সী-ওয়েভে চাকরি করত।'

'হ্যাঁ।'

'রলি বার্ট দেখা করতে এসেছিল, না?'
'কি নাম বললেন?'
'বার্ট, রলি বার্ট, নাবিক। একটু আগে এসেছিল?'
'হ্যাঁ, একজন নাবিক এসেছিল।'
'তোমার বাবার কাছ থেকে কোন চিঠি এনেছে?'
'হ্যাঁ।'
'কোথায় ওটা?' কণ্ঠস্বর বদলে গেছে লোকটার হঠাৎ, পিস্তলের গুলি ফাটাল যেন।
'কে...কেন...'
'প্রশ্ন কোরো না!' ধমকে উঠল লোকটা। 'কোথায়?'
'কি করবেন?' সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেলল বব।
'কোথায়!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।
জ্বলে উঠল ববের নীল চোখ, কঠিন হলো চোয়াল। 'বলব না।'
পকেট থেকে ছুরি বের করল লোকটা, বোতাম টিপতেই ক্লিক করে খুলে গেল লম্বা বাঁকানো ফলা। 'বলবে না, না?'
ঝকঝকে মারাত্মক ফলাটার দিকে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রয়েছে বব, সরাতে পারছে না দৃষ্টি।
সামনে বাড়তে শুরু করল নাবিক, সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে শরীর, হিংস্র জানোয়ারের মত ঠোঁট ছড়িয়ে গেছে দু'পাশে, বেরিয়ে পড়েছে দুই সারি ক্ষয়ে যাওয়া হলদেটে দাঁত। এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে।
পিছিয়ে এল বব, হাত ঠেকল পেছনের দেয়ালে। ভয়ংকর একটা মুহূর্ত দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, পরক্ষণেই ঘরের একমাত্র চেয়ারটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। চোখের পলকে মাথা নিচু করে ফেলল নাবিক, চেয়ারটা গিয়ে লাগল উল্টোদিকের জানালায়।
ঝনঝন শব্দে কাচ ভাঙল, শব্দের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ছুটে জানালার কাছে এসে বাইরে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল বব, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' নিচের অন্ধকারে কেউ তার চিৎকার শুনল কিনা বোঝা গেল না।
লাফিয়ে ববের পেছনে এসে দাঁড়াল নাবিক।
শেষ মুহূর্তে পেছনে ফিরে তাকাল বব। ছুরি চালিয়েছে লোকটা। ঝট করে বসে পড়ল সে, কোনমতে ছুরি খাওয়ার হাত থেকে বাঁচল। ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে গেছে নাবিক, সুযোগটা কাজে লাগাল বব। নাবিকের বগলের তলা দিয়ে ছুটে গেল দরজার দিকে, তাড়া খাওয়া খরগোশের মত দিকবিদিক হুঁশ হারিয়ে লাফিয়ে পড়ল সিঁড়িতে, একেক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে চলল নিচে, অন্ধকারে পা ফসকে পড়লে যে ঘাড় ভেঙে মরবে, সে খেয়াল নেই।
পেছনে ফিরে তাকানোর সাহস বা সময় কোনটাই নেই ববের, সিঁড়ির একেবারে শেষ মাথায় এসে পড়ল। শূন্য হলঘর, ওপাশে দরজা। এক ছুটে হল পেরোল সে, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল ভেজানো দরজা, লাফিয়ে এসে নামল পথে।

কোন দিকে তাকানোর ফুরসত নেই, সোজা সামনে ছুটল, মোড়ের লাইট পোস্টের কাছে প্রায় সময় একজন পুলিশকে পাহারায় থাকতে দেখেছে, তাকেই এখন দরকার।

দশ গজও যেতে পারল না বব, তার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল কার গায়ে। আবছা অন্ধকারে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন মানুষ, একজন বড়, অন্য দুজন তারই মত কিশোর। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল বব, খপ করে তার হাত চেপে ধরে আটকাল লোকটা। লোহার সাঁড়াশি দিয়ে যেন কেউ কব্জি জেপে ধরেছে ববের।

'হোকে!' বাজখাঁই গলা বিশালদেহী দানবটার। 'কি হয়েছে, খোকা? ভূতে তাড়া করেছে?'

গলা শুনেই বুঝল বব, চোরডাকাত নয়, ভদ্রলোকের হাতেই পড়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওখানে...ওখানে, আমার ঘরে একটা লোক...'

'লোক?' হাসল লোকটা। 'লোক তো আর ভূত না, ঘাড় মটকে...'

'আরেকটু হলেই খুন করত আমাকে!' তিক্ত কণ্ঠে বলল বব।

'খুন!'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে?'

'ছুরি মেরে।'

'কেন?'

'ওর কথায় রাজি হইনি, তাই।'

'কি করতে বলেছিল?' জিজ্ঞেস করল এক কিশোর।

'একটা চিঠি। আমার বাবার চিঠি। প্লীজ, তোমরা আমার সঙ্গে চলো। চিঠিটা নিতে দিও না ওকে!' অনুনয় করল বব।

'চিঠি!' লোকটার দিকে ফিরল কিশোর। 'বোরিস, চলুন তো দেখি, কি ব্যাপার? আসুন, জলদি!' ববের দিকে ফিরে বলল, 'চলো, তোমার ঘর দেখাও।'

দ্বিধা করল বব, তারপর বোরিসের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠার দরজায় এসে দাঁড়াল চারজনে। দরজা বন্ধ। নিচের ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো আসছে। 'এই ঘর!' বলল বব। 'কিন্তু আমি যখন বেরিয়েছিলাম, খোলা ছিল দরজা!'

'দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চয় জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালিয়েছে!' বলল আরেক কিশোর।

'না, সম্ভব না!' মাথা নাড়ল বব। 'চল্লিশ ফুট...লাফিয়ে নামতে পারবে না।'

'ভেতরেই আছে তাহলে।' চেঁচিয়ে ডাকল বোরিস, 'এই যে, ভেতরের মানুষ! দরজা খোলো!'

সাড়া নেই।

'এটাই তোমার ঘর তো, খোকা?' সন্দেহ বোরিসের কণ্ঠে।

'নিশ্চয়ই।'
'ভাড়া দাও?'
'নইলে থাকতে দেবে কেন?'
'সত্যি বলছ?'
'খোদার কসম!'
'হোকে! এই, তোমরা সরে দাঁড়াও।' দু'পা পিছিয়ে এসে ছুটে গিয়ে দরজার ওপর পড়ল যেন হাতি, মড়মড় করে ভেঙে পড়ল পাল্লা।
টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে গরিলাটা, হাতে একটা চিঠি, মাত্র পেয়েছে বোধহয়। বোরিসকে দেখে কুঁচকে গেছে ঘন ভুরু। হাত বাড়িয়ে তুলতে গেল টেবিলে পড়ে থাকা ছুরিটা।
'খবরদার!' ধমকে উঠল বোরিস। 'ঘাড় মটকে দেব ধরে! এখানে কি করছ?'
'সেটা তোমার ব্যাপার না!' শুয়োরের মত ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল গরিলা।
'এই হারামজাদা!' হঠাৎ করেই রেগে গেল সদাশান্ত বোরিস। 'আমার ব্যাপার না তো কি তোর? হারামির বাচ্চা হারামি, এখানে ঢুকেছিস কেন? রাখ্, চিঠিটা রাখ্!'
'যদি না রাখি!' গলায় জোর নেই গরিলার, বুঝতে পারছে, ওই ভালুকের সঙ্গে লাগতে যাওয়া উচিত হবে না।
'হাত দুটো ভাঙব আগে, পা খোঁড়া করব, এরপর নিয়ে যাব পুলিশের কাছে।'
ছুরির দিকে হাত আরেকটু বাড়ল গরিলার।
দুই লাফে কাছে চলে এল বোরিস, চেপে ধরল কব্জি, একটানে সরিয়ে আনল টেবিলের কাছ থেকে। কব্জিতে বেকায়দা এক মোচড় দিতেই চিঠিটা খসে পড়ল নাবিকের হাত থেকে, ব্যথায় উহ্ করে উঠল। লোকটাকে মাথার ওপর তুলে নিল বোরিস, তারপর আলগোছে ছেড়ে দিল। দড়াম করে মেঝেতে পড়ল গরিলা, কেঁপে উঠল সারা বাড়ি।
কোমরে হাত দিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে কোনমতে বাঁকা হয়ে উঠে দাঁড়াল নাবিক, জানোয়ারের মত দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'আ-আমি দেখে নেব তোকে...'
ধরার জন্যে আবার হাত বাড়াল বোরিস।
এক লাফে পিছিয়ে গেল নাবিক। একে একে নজর বোলাল তিন কিশোরের ওপর, বোরিসের দিকে তাকাল আবার। ফিরে চাইল টেবিলে রাখা ছুরির দিকে, মেঝেতে পড়া চিঠির দিকে। দ্বিধা করল। তারপর হেঁটে গেল দরজার দিকে, বারান্দায় বেরিয়ে ফিরে তাকাল। শাসাল, 'আমি ভুলব না! মনে রাখিস, দৈত্য...!'
ঘুসি বাগিয়ে এক পা বাড়ল বোরিস।
সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে সিঁড়িতে নামল নাবিক। দুপদাপ শব্দ তুলে নেমে চলে গেল।
'কি ব্যাপার?' ভুরু নাচাল প্রথম কিশোর ববের দিকে চেয়ে। 'বাড়িতে কেউ নেই নাকি?'
'না,' মাথা নাড়ল বব। ভালমত দেখল কিশোরকে। এক বোঝা কোঁকড়ানো

চুল মাথায়, অপূর্ব সুন্দর দুটো কালো চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক। 'বেড়াতে গেছে। বাড়ি পাহাড়ায় রেখে গেছে আমাকে।'

'এই সুযোগে ডাকাতি করতে এসেছিল ডাকাতটা!' হাসল অন্য কিশোর—কুচকুচে কালো মুখে নিষ্পাপ হাসি, ম্লান আলোয় ঝকঝক করে উঠল শাদা দাঁত। 'খাইছে, বোরিস, আপনার সিনেমায় নামা উচিত। যা একখান আছাড় দিয়েছেন না ব্যাটাকে, জনি ওয়াইজমুলার ফেল। সিনেমায় টারজানের অভিনয় দারুণ করতে পারবেন!'

মুসার কথায় কান নেই কিশোর পাশার, নিচু হয়ে তুলে নিল চিঠিটা। ববের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার বাবার চিঠি! নিশ্চয় মূল্যবান কোন খবর আছে?'

'মূল্যবান! হ্যাঁ, তা বলতে পারো,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল বব। 'দুনিয়ায় একটি মাত্র লোক যে আমাকে ভালবাসত, তার হাতের ছোঁয়া তো আছে!'

'মানে?'

'বাবা মারা গেছে!' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বব। 'তার···শেষ চিঠি!'

ববের কাঁধে হাত রাখল মুসা আমান। কথা জোগাল না মুখে।

বব একটু শান্ত হলে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'চিঠিটা এখনও খোলনি কেন? সময় পাওনি?'

'পেয়েছি,' ঘাড় নাড়ল বব। 'খুলিনি। খুললেই তো সব আশা শেষ।'

ববের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছে কিশোর। গলায় সহানুভূতি ঢেলে বলল, 'যা ঘটে গেছে, গেছে, তাকে তো মেনে নিতেই হবে। এই দেখো না, আমিও তো তোমারই মত, আমার তো মা-বাবা এক সঙ্গে গেছে! গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে।'

কিশোরের দিকে চেয়ে কি ভাবল বব কে জানে, কিন্তু আর কাঁদল না। চোখ মুছল।

'এখন কি করবে? থাকবে এখানেই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি জানি! ভয় লাগছে! আবার যদি সে ফিরে আসে?'

'তোমার কোন আত্মীয়স্বজন নেই? বন্ধু-বান্ধব?'

'না।'

'টাকা? হোটেলে থাকার মত?'

'না।'

'এক রাতও না?'

'না।'

'হুঁ!' বিড়বিড় করল কিশোর, 'শোচনীয়···হ্যাঁ, তো কোথায় থাকবে আজ রাতে?'

'শুয়ে থাকব গিয়ে বাগানের কোন একটা কুঁড়েতে, যদি খোলা পাই।'

'কোথায়?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।

'বাগানে! জিরোনোর জন্যে কুঁড়ে থাকে না, ওগুলোরই কোন একটাতে···'

'ইয়াল্লা! মাথা খারাপ! এই শীতের মধ্যে···'

'ঠেকায় পড়ে আগেও থেকেছি···'

'এক কাজ করো না,' প্রস্তাব রাখল কিশোর, 'চলো, কোন হোটেলে গিয়ে খেয়ে নিই আগে। খিদে পেয়েছে আমার। তোমারও নিশ্চয়। তারপর ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে, কোথায় থাকবে। কি বলো?'

'কিন্তু আমার কাছে তো পয়সাকড়ি…'

'সেটা তোমার ভাবতে হবে না,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'আমাকে বন্ধু ভাবতে আপত্তি আছে?'

চুপ হয়ে গেল বব। ধীরে ধীরে আলো ফুটল নীল চোখের তারায়, হাসল, খুব মিষ্টি হাসিটা। 'না, কোন আপত্তি নেই।' হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি রব কলিনস।'

'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু, মুসা আমান। আর ও বোরিস চেকোমাসকি, ব্যাভারিয়ায় বাড়ি।'

হেসে মস্ত ধক থাবা বাড়িয়ে দিল বোরিস, ববের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল। বোরিসের ধারণা আলতো ঝাঁকুনি দিয়েছে, কিন্তু ববের মনে হলো কাঁধের কাছ থেকে তার হাতটা খসে চলে আসবে।

'আচ্ছা,' কিশোর বলল, 'এদিকে কোন ভাল হোটেল আছে, মানে, ভাল খাবার পাওয়া যায়? আমি ভাই মুসলমান, মুসাও। কিছু মনে কোরো না, শুয়োর-টুয়োর খেতে পারব না। আছে?'

গাল চুলকাল বব। একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল, 'আছে, বন্দরের ধারে। নানা দেশের নানা জাহাজ আসে, অনেক রকম লোক, একেক জন একেক রকম খায়…কিন্তু, দাম অনেক বেশি।'

'কুছ পরোয়া নেই,' হাত নাড়ল কিশোর। 'টাকা আছে আমার কাছে। চলো, খিদেয় নাড়ি জ্বলছে।'

তিন

খুশি মনে নতুন বন্ধুদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল বব, অন্যের পয়সায় ভাল খাওয়া তার ভাগ্যে কমই জুটেছে। কয়েক মিনিট পরেই টেবিল ঘিরে বসল ওরা, পায়ের তলায় নরম কার্পেট, মার্বেল পাথরের তৈরি পুরানো ধাঁচের টেবিল, হালকা আলোয় চকচক করছে। প্রায় প্রতিটি টেবিলে লোক আছে, বেশির ভাগই নাবিক। কড়া তামাকের নীলচে ধোঁয়ায় ভারি হয়ে উঠেছে ঘরের বাতাস, খুব ভাল লাগছে ববের এই কোমল উষ্ণতা। কোণের দিকে মোটামুটি নির্জন একটা জায়গায় বসেছে ওরা।

ফেকাসে চেহারার ওয়েইটার এগিয়ে এল।

'গরুর গোশত ভুনা, ভেরার কাবাব, পনির, মাখন,' অর্ডার দিল কিশোর, 'আর, মোটা রুটি। গরম গরম।'

লোকটা চলে যেতেই কিশোর বলল, 'খাবার আসতে সময় লাগবে, এই সুযোগে তোমার বাবার চিঠিটা খুলে ফেলি, কি বলো?'

'কিন্তু…ওটাতো ঘরে…'

হেসে পকেট থেকে মোটা খামটা বের করল কিশোর, 'এই যে। নিশ্চয় মূল্যবান

কিছু রয়েছে এতে, নইলে গরিলাটা খুন করতে আসত না তোমাকে। খুলব?'

'খোলো,' মাথা কাত করল বব। 'কিন্তু কিচ্ছু পাবে না। বাবার ধন-দৌলত নেই যে লুকিয়ে রেখে নকশা পাঠাবে।'

ববের কথা কিশোরের কানে ঢুকল বলে মনে হলো না, হাতের তালুতে নিয়ে খামের ওজন আন্দাজ করছে সে, আপনমনেই মাথা নাড়ল। 'বেশ ভারি! কাগজ ছাড়াও ভেতরে···,' খামের মুখ ছিঁড়তে শুরু করল সে। ছেঁড়া দিকটা কাত করতেই সোনালি ঝিলিক তুলে ঠন করে টেবিলে পড়ল একটা গোল ধাতব জিনিস।

বিদ্যুতের মত ছুটে এল কিশোরের হাত, চাপা দিল জিনিসটা, ঠিক এই সময় এল ওয়েইটার। ধীরেসুস্থে প্লেটগুলো সাজিয়ে রেখে শূন্য ট্রে নিয়ে বিদেয় হলো। সাবধানে এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে করে হাত সরাল কিশোর। শিস দিয়ে উঠল। চাপা গলায় বলল, 'মিস্টার বব, জলদি এটা পকেটে ঢোকাও!' গোল জিনিসটা ঠেলে দিল। 'জলদি! কেউ দেখে ফেলবে!'

'কী!' হাঁ হয়ে গেছে বব, চোখ বড় বড়। 'কি জিনিস!' তোলার কোন চেষ্টা করল না।

'সোনা,' তালুর নিচে আবার ঢাকল জিনিসটা কিশোর।

'সোনা!' চেঁচিয়ে উঠল বব।

'চুপ! আস্তে! শুনছে!'

'ঠাট্টা করছ!' বিশ্বাস করতে পারছে না বব।

'ঠাট্টা নয়, সত্যি।'

'কি তাহলে? টাকা? ডলারখানেক হবে?'

'টাকাই, তবে এক ডলার নয়, অনেক। আর নিউমিজ্‌ম্যাটিস্‌ট্‌রা পেলে তো লুফে নেবে, চাইলে কয়েকশো ডলারও দিয়ে দিতে পারে, যদি তেমন পুরানো হয়।'

'নিউ···নিউ···'

'নিউমিজ্‌ম্যাটিস্‌ট্‌।'

'হ্যাঁ, নিউমিজ্‌···তা, ওরা আবার কারা?'

'মুদ্রা বেচাকেনা করে যারা, তাদেরকে নিউমিজ্‌ম্যাটিস্‌ট্‌ বলে।'

'কোন আমলের জিনিস এটা?' এতক্ষণে কথা বলল মুসা। 'মোহর?'

'কোন আমলের, ভাল করে না দেখলে বলা যাবে না। মোহরই, সম্ভবত ডাবলুন, পুরানো, স্পেনের স্বর্ণমুদ্রা।'

'হুঁম,' খেতে খেতে বলল বোরিস, 'তা-ই হবে। মিউজিয়মে দেখেছি এই জিনিস। তা, খাবে, নাকি খালি গল্প করবে? জুড়িয়ে গেল তো সব।'

'ঠিক!' মোহরটা দেখে এতই অবাক হয়েছে, সামনে খাবার রেখেও ভুলে গেছে স্বয়ং মুসা আমান। ভুলটা শোধরাতেই যেন তাড়াতাড়ি খাবারের প্লেট টেনে নিয়ে ডবল ডবল করে মুখে পুরতে শুরু করল। আধসের মত গরুর মাংস শেষ করে থামল, ধীরে সুস্থে রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে বলল, 'ভাল জিনিস পাওয়া গেছে! জলদস্যুরা এসব লুট করে লুকিয়ে রাখত, না?'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'সে-সময় স্প্যানিশ ডাবলুনের দাম ছিল প্রচুর, যে

কোন বন্দরে ভাঙানো যেত। বব, মোহরটা নিয়ে পকেটে ভরো, হাত বন্ধ, খেতে পারছি না। আর চিঠিটাও লুকাও।'

লজ্জিত হলো বব। তাড়াতাড়ি মোহর আর খামসুদ্ধ চিঠিটা নিয়ে পকেটে ভরল।

প্লেট টেনে নিতে নিতে বলল কিশোর, 'বব, তোমার বাবাকে যতখানি সাধারণ মানুষ ভাবো, নিশ্চয় ততটা সাধারণ ছিলেন না তিনি। নইলে এই দুর্লভ জিনিস কি করে তিনি জোগাড় করলেন? চিঠিটা পড়তে দেবে আমাকে?'

'নাও না, এখুনি পড়ো,' পকেটে হাত ঢোকাতে গেল বব।

'আরে না না, এখন না,' ববের হাত চেপে ধরল কিশোর। 'এত লোকের সামনে না। কার মনে কি আছে কে জানে!' একটুকরো মাংস চিবিয়ে গিলে নিল। 'আরেক কাজ তো করতে পারি, তুমি আজ রাতে আমার বাড়িতে মেহমান হলে। সেখানেই পড়ব চিঠিটা।'

'দারুণ প্রস্তাব! আমার জন্যে এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে, অন্তত আজ রাতে? কিন্তু তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না-তো?'

'বিন্দুমাত্র না। বাড়িতে শুধু চাচা আর চাচী, অনেক জায়গা। রবিন আর মুসা তো প্রায়ই থাকে আমার সঙ্গে।'

'রবিন?'

'আমাদের আরেক বন্ধু, গেলেই দেখবে,' জবাবটা দিল মুসা।

খেতে খেতেই কথা চলল, বব বলল, 'ইস যদি এক ব্যাগ ডাবলূন পেয়ে যেতাম! আমার কি আর সেই কপাল হবে!'

'হয়েও যেতে পারে,' পনিরের বড় একটা টুকরো নিয়ে কামড় বসাল মুসা। 'কার কপালে কি আছে, কে জানে!'

'তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক,' হাসল বব।

'ফুলচন্দনের দরকার নেই,' হাত নাড়ল মুসা। 'আপাতত বড়সাইজের একখানা চকলেট আইসক্রীম দরকার। এই মিয়া, এই, এদিকে,' ওয়েইটারকে ডাকল সে আইসক্রীমের অর্ডার দেয়ার জন্যে।

'এই ঠাণ্ডার মধ্যে আইসক্রীম?' বব অবাক।

'ঠাণ্ডা কোথায়?' দু'হাত নাড়ল মুসা। 'আর হলেই বা কি? গরমের মধ্যে চা-কফি খায় না লোকে, ঠাণ্ডার মধ্যে আইসক্রীম খেলে দোষ কি?'

অকাট্য যুক্তি, এরপরে আর কথা চলে না।

'তুমি নাও, আমার লাগবে না,' কিশোর বলল।

'আমারও না,' বলল বব।

বোরিসের দিকে তাকাল মুসা, 'নেবেন?'

'বেশি না, দুটো,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল বোরিস।

হেসে ফেলল মুসা, 'আমি একটার বেশি পারব না।' ওয়েইটারের দিকে ফিরল। 'এই মিয়া, তিনটা। বড় দেখে এনো।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' আগের কথায় ফিরে এল বব, 'এই মোহরটা কি

জলদস্যুদের কাছে পাওয়া গেছে?'

'তোমার বাবার চিঠি পড়লেই জানা যাবে,' কিশোর বলল। 'বাক্যানিয়ারদেরও হতে পারে।'

'বাক্যানিয়ার!'

'ওরাও জলদস্যু, তবে সাধারণ জলদস্যুর সঙ্গে একটু তফাৎ আছে,' ন্যাপকিনে হাত মুছল কিশোর। 'চা খাবে?'

'তা খেতে পারি।'

আইসক্রীম নিয়ে এসেছে ওয়েইটার। তার দিকে চেয়ে বলল কিশোর, 'দু'কাপ চা, দুধ বেশি।'

'হ্যাঁ,' চেয়ারে আরাম করে হেলান দিয়ে বসল কিশোর, 'বাক্যানিয়াররা আগে জলদস্যু ছিল না। একটা সময় ছিল, যখন জাহাজের চেয়ে নাবিক বেশি হয়ে গিয়েছিল, ফলে জাহাজে চাকরি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেশি দিন বেকার বসে থাকল না। বেশ কিছু ইংরেজ আর ফরাসী নাবিক, অন্য পেশা নিয়ে মেকসিকো উপকূলে চলে গেল তারা। তার আশেপাশে তখন স্প্যানিয়ার্ডদের রাজত্ব। মেকসিকো আর পেরুতে সোনার খনি আবিষ্কার হয়েছিল তারও আগে, ওই সময় হিসপ্যানিওলা—আজকের হাইতি দ্বীপে ছিল স্প্যানিয়ার্ডদের আখড়া। সোনার নাম শুনে লাফিয়ে উঠল তারা। ভাবল, খামোকা বসে থেকে লাভ কি, অনেক দেশের লোক তো যাচ্ছে সোনা খুঁজতে, তারাই বা ভাগ্যটা একটু যাচাই করে দেখে না কেন? বেরিয়ে পড়ল তারা, তাদের পোষা গরু-ছাগল আর শুয়োরের দল দ্বীপেই ফেলে রেখে যেতে হলো যানবাহনের অভাবে। মানুষ নেই, ধীরে ধীরে বুনো হয়ে উঠল জানোয়ারগুলো, বংশ বিস্তার করে চলল দ্রুত, আর কিছু দিন থাকলে খাওয়ার অভাবে হয়তো নিজেদের মাংসই খেতে শুরু করত ওরা, এত বেশি হয়ে গিয়েছিল, ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা। এই সময় গিয়ে হাজির হলো বেকার নাবিকেরা। ওসব জানোয়ার মেরে গোশত শুকিয়ে জাহাজীদের কাছে বিক্রি শুরু করল। খাবার আর পানির অভাব হলেই ওপথে চলাচলকারী জাহাজ হিসপ্যানিওলায় নোঙর করে, তাদের কাছে মাংস বিক্রি করে বেশ দু'পয়সা কামাই হতে লাগল বেকারদের। শুকনো গরুর মাংসকে ফরাসীরা বলে 'বুকাঁ', বেকারদের নাম রাখা হলো 'বুকাঁইয়া', এটা থেকেই এসেছে ইংরেজি 'বাক্যানিয়ার' শব্দটা।

যা-ই হোক, বেশ আরামেই আছে বাক্যানিয়াররা, ওরকমই থাকত, যদি স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের না ঘাঁটাত। মাথায় ভূত চেপেছিল ব্যাটাদের, তাই নিরীহ নাবিকগুলোকে খোঁচাতে গিয়েছিল। ওটা তখন স্প্যানিয়ার্ডদের এলাকা, তারা মনে করল, তাদের রাজত্বে অন্য দেশের লোক থাকবে কেন? উচ্ছেদ করো হিসপ্যানিওলায় উড়ে এসে জুড়ে বসা বিদেশীগুলোকে। ব্যস, এসে খুনজখম শুরু করে দিল। শুরুতে কিছুদিন সহ্য করল বাক্যানিয়াররা, কিন্তু পরে রুখে দাঁড়াল, সে এক প্রচণ্ড রক্তারক্তি কাণ্ড। স্প্যানিয়ার্ডরাই জিতল, প্রথমে তাই মনে হয়েছিল অবশ্য। বাক্যানিয়াররা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল কাছের আরেকটা দ্বীপে, একটা পাথুরে দ্বীপে, টিলাটক্কর আর লুকানোর জায়গা আছে প্রচুর। দ্বীপটার নাম টরটুগা।

প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে তাদের মনে। শুধু ভেবেই ক্ষান্ত রইল না, নৌকা বানানো শুরু করল। শিগগিরই দল বেঁধে চড়াও হতে শুরু করল স্প্যানিয়ার্ডদের সদাগরী জাহাজের ওপর, লুটপাট তো করলই, যে জাহাজকে আক্রমণ করল, তার একটা লোকও জ্যান্ত রাখল না, সুযোগই দিল না কোনরকম, কচুকাটা করল। জাহাজ জোগাড় হতে লাগল, সেই সঙ্গে অস্ত্র, রসদ, খাবার-দাবার। খুব শিগগিরই টরটুগায় দুর্ভেদ্য এক দুর্গ বানিয়ে ফেলল ওরা। তারপর আশপাশের কয়েকটা দ্বীপে দুর্গ বানাল, খুবই জোরদার করে ফেলল প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

'তারপরে যা ঘটার তা-ই ঘটল,' চায়ে চুমুক দিয়ে কাপটা পিরিচে নামিয়ে রাখল কিশোর। 'দেশে দেশে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, বাক্যানিয়াররা স্প্যানিশ জাহাজ লুট করে সোনার পাহাড় জমিয়ে ফেলছে। ব্যস, বাঘা বাঘা সব চোর-ডাকাতের টনক নড়ে গেল, দলে দলে ছুটে আসতে শুরু করল তারা সোনার পাহাড়ের ভাগ নিতে। বাক্যানিয়াররা স্বাগত জানিয়ে দলে টেনে নিল তাদের, দল ভারি করল, শক্তিশালী করল। মাংস বেচে সংসার চালানোর ধারেকাছেও গেল না আর, ডাকাত হওয়ার মজা বুঝে গেছে, ডাকাতই থেকে গেল। প্রায় রাতারাতি গজিয়ে উঠল জলদস্যুদের আরেকটা রাজধানী, জ্যামাইকার পোর্ট রয়্যালে। জান খারাপ করে ছাড়ল স্প্যানিয়ার্ডদের—তাদের তখন ছেড়েদে-মা-কেঁদে-বাঁচি অবস্থা। কিন্তু বাক্যানিয়াররা ছাড়ল না, দিনকে দিন আরও দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। জানে, স্প্যানিশরা ধরতে পারলে পুড়িয়ে মারবে, আর ইংরেজরা ধরলে ফাঁসিতে লটকে দেবে। তাই ধরা পড়ার মত কাজই করল না ওরা। যে জাহাজকেই ধরল, তার লোকজনকে একেবারে শেষ করে দিল। তাদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারল না স্প্যানিশ সরকার, দমন করা তো দূরের কথা। ইংরেজরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, কিন্তু কিছু করতে পারল না। এতই শক্তিশালী হয়ে উঠল বাক্যানিয়াররা, জাহাজ আক্রমণ ছেড়ে শেষে স্প্যানিশ মেইনের উপকূলে গিয়ে আক্রমণ চালাল। তাদের দলপতি কুখ্যাত মরগান, আঠারোশো খুনে ডাকাত নিয়ে একবার পানামাতক ধাওয়া করে এল।' থামল কিশোর।

'তারপর?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এল বোরিস, গল্প শোনার আগ্রহ যার একদম নেই, সে-ও আইসক্রীম খাওয়া ভুলে গেছে।

'শেষে ইংরেজ সরকার এক বুদ্ধি করল,' আবার শুরু করল কিশোর, 'সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিল। যারা দস্যুতা ছেড়ে দিয়ে ইংরেজদের দলে যোগ দেবে, তাদেরকে মাপ করে দেবে ইংরেজ সরকার। লোভনীয় প্রস্তাব, অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করল ইংরেজদের কাছে, কেউ কেউ গ্রামে বিয়ে-থা করে চাষাবাদ শুরু করল, দু'একজন ব্যবসাও ফাঁদল, তবে বেশিরভাই যোগ দিল ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে। সবচেয়ে বড় খুনেটাকে, মরগানকে নাইট উপাধি দিয়ে জ্যামাইকার গভর্নর বানিয়ে দেয়া হলো। এরপর কি করা উচিত, ভালমতই জানে মরগান, যারা দস্যুতা ছেড়ে তার দলে যোগ দিল না, তাদের সবাইকেই ধরে নির্বিচারে ফাঁসিতে লটকে দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওই অঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজীরা। কমে এল জলদস্যুতা।

একেবারে বন্ধ হলো স্টীম ইঞ্জিন আসার পর, পালের জাহাজ নিয়ে ওগুলোর সঙ্গে দৌড়ে পারত না ডাকাতেরা, বাধ্য হয়ে ডাকাতি ছাড়তে হলো।'

'ইস্, কি আরামেই না ছিল!' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল বব। 'গেল ব্যাটারা ভেড়া বনে!'

'আরে!' হেসে বলল কিশোর, 'তুমি তো লোক সুবিধের নও।'ডাকাতদের জন্যে দুঃখ করছ। সুযোগ পেলে হয়ে যেতে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। খবরের কাগজ ফেরি করার চেয়ে অনেক ভাল।'

ববের জন্যে দুঃখ হলো কিশোরের। 'তা ঠিকই বলেছ, কিন্তু ধরা পড়লে যে ফাঁসিতে ঝোলাত? কিংবা পুড়িয়ে মারত?'

'না খেয়ে তিলে তিলে মরার চেয়ে একবারে মরে যাওয়া ভাল না?'

জবাব দিতে পারল না কিশোর। বিল এল, প্লেটে কয়েকটা নোট রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। অন্যেরাও উঠল।

বাইরে বেরিয়ে রাস্তা পেরোতে গিয়েই বাধল বিপত্তি। ববের প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ল একটা লরি, হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে সরিয়ে আনল মুসা, আরেকটু হলেই চাকার নিচে চলে যেত বব।

'আরে! কি ব্যাপার!' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কিশোর। 'এতবড় একটা লরি আসছে, দেখলে না! গেছিলে তো!'

'কি জানি!' বেশ নাড়া খেয়েছে ব্যাপারটায় বব। 'পথেই তো আমার কাজ, সারাদিন পথে পথে ঘুরি, এমন তো কোনদিন হয়নি! আজ হঠাৎ...' কি করে কি ঘটল, বুঝতে পারছে না যেন সে-ও।

'অ্যাকসিডেন্ট রোজ হয় না, হঠাৎ করেই একদিন হয়,' সাবধান করল কিশোর। 'দেখে শুনে পথ চলো এখন থেকে, নইলে মোহর খরচ করার সুযোগ পাবে না।'

হাত তুলে একটা খালি ট্যাক্সি ডাকল কিশোর। বোরিস আর মুসাকে নিয়ে এদিকে এসেছিল সে কিছু পুরানো জিনিস দেখতে। ইয়ার্ডের দুটো ট্রাকের একটা খারাপ হয়ে গেছে, আরেকটা নিয়ে বেরিয়েছেন রাশেদ চাচা। আসার সময় বাসে এসেছে। তিনজনে।

ট্যাক্সিতে উঠল ওরা, বোরিস বসল ড্রাইভারের পাশে, তিন কিশোর পিছনের সীটে।

গাড়ি ছাড়ল ড্রাইভার, বোধহয় অনেক দূর যেতে হবে বলে শুরুতেই গতি অনেক বাড়িয়ে দিল। প্রথম থেকেই ড্রাইভারের আচরণ ভাল লাগেনি কিশোরের, এখন তার এই গতি বাড়ানো আরও অপছন্দ করল। নিচু গলায় সঙ্গীদেরকে বলল, 'ব্যাটা নিশ্চয় মাতাল! এই রাস্তায় এত জোরে গাড়ি চালায় কেউ! দেবে গুঁতো লাগিয়ে কোন গাড়ির সঙ্গে!'

'খুব খারাপ কথা,' ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিল বব। 'মাত্র টাকা পয়সা আসতে শুরু করেছে, এই সময় যদি মরি...হি-হিহ্!' অযাচিত ভাবে কয়েকজন সত্যিকারের বন্ধুকে পেয়ে সব দুঃখ যেন ভুলেই গেছে সে।

'খরচ করার সুযোগ দেবে না তোমাকে ব্যাটা!' রেগে উঠছে কিশোর, বোরিস কিছু বলছে না কেন? বোধহয় এই জোরে ছোটা ভালই লাগছে তার। একটা মোড়ে এসে পড়ল গাড়ি, তবুও গতি কমাল না ড্রাইভার, চাকার কর্কশ শব্দ তুলে পিছলে ঘুরে গেল গাড়ির নাক, একে অন্যের ওপর কাত হয়ে পড়ল তিন কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'বোরিস! আস্তে চালাতে বলুন! মেরে ফেলবে নাকি!'

হেসে উঠল ড্রাইভার, যেন মজার একটা কৌতুক শুনছে, গতি তো কমালই না, বরং আরও বাড়াল।

আশ্চর্য! বোরিস এখনও কিছু বলছে না কেন? কিশোরের মনে হলো, সে নিজেও অযথাই বেশি রেগে যাচ্ছে, কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে।

অবশেষে দুর্ঘটনা ঘটেই গেল। একটা ট্রাফিক পোস্টের কাছে লাল বাতি অমান্য করল ড্রাইভার, বাঁদিক থেকে আসা একটা প্রাইভেট কারের পেছনে লাগিয়ে দিল গুঁতো। চাকার তীক্ষ্ণ শব্দ, আঁতকে ওঠা মহিলার ভয়ার্তচিৎকার, দু'চারজন পথচারীর 'গেল! গেল!' রব শোনা গেল কয়েক মুহূর্ত। ভাগ্য ভাল, প্রাইভেট কারটা উল্টাল না, গুঁতো খেয়ে ওটার পেছন দিক সরে গেল আধ পাক।

রাগে অন্ধ হয়ে গেছে কিশোর। এক ঝটকায় দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে, ড্রাইভারের দরজা খুলে তাকে প্রায় চড়ই মেরে বসে, এই অবস্থা। জীবনে যা কখনও করেনি, তাই করে বসল, মুখ খারাপ করে গাল দিয়ে উঠল ড্রাইভারকে।

ট্রাফিক পুলিশ ছুটে এল। প্রথমেই দেখে নিল, দুটো গাড়ির কেউ আঘাত পেয়েছে কিনা। অন্য কারোই তেমন কোন চোট লাগেনি, ট্যাক্সি ড্রাইভারের ছাড়া। তার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। চেহারা ফেকাসে মনে হলো, খুব লজ্জা পেয়েছে।

পকেট থেকে নোটবুক বের করতে করতে বলল পুলিশ, 'কি ব্যাপার? মদ খেয়ে চালাচ্ছিলে নাকি? দেখি, লাইসেন্স দেখি।'

কিশোর বলল, 'মদই খেয়েছে! কত মানা করলাম, 'আস্তে চালাও, আস্তে চালাও, শুনল না!'

লাইসেন্স বের করে দিয়ে বলল ড্রাইভার, 'না, স্যার, মদ খাইনি! বিশ্বাস করুন! আজ সারাদিন এক ফোঁটাও না! কি জানি হয়ে গিয়েছিল! জীবনে কখনও এরকম হয়নি! কি যে হয়ে গেল হঠাৎ।'

ভুরু কুঁচকে ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত পুলিশ। না, মিছে কথা বলছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কি ভাবল, তারপর লাইসেন্সটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'যাও, ছেড়ে দিলাম। এখন থেকে সাবধানে গাড়ি চালাবে। অসুখ-টসুখ করেনি তো?'

'না, স্যার!' কপালের রক্ত মুছছে ড্রাইভার। 'সারাদিন গাড়ি চালিয়েছি, বৃষ্টি তো, খেপও পেয়েছি অনেক। এই একটা খেপেই…আসলে!'

'যাও, ওনাদেরকে নামিয়ে দিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে যাও,' পরামর্শ দিল পুলিশ। 'বেশি পরিশ্রম করে ফেলেছ, ঘুম পাচ্ছে বোধহয়। যাও,' হাত নাড়ল সে।

গাড়ি ছাড়ল আবার ড্রাইভার। গতিবেগ সীমিত রাখল এবার। বলল, 'স্যার, কিছু মনে করবেন না। সত্যি বলছি, মদ খাইনি। আমার মুখ শুঁকে দেখুন।'

কিশোরও বিশ্বাস করল তার কথা, গাল দিয়েছিল বলে লজ্জা পাচ্ছে। চিমটি কাটতে শুরু করেছে নিজের ঠোঁটে, গভীর ভাবনায় ডুবে যাচ্ছে। আনমনেই বলল, 'না, শোঁকার দরকার নেই। কিন্তু…হোটেল থেকে বেরোনোর পর পরই দু'দুটো অঘটন!'

'ভূতের আসর হয়েছে।' অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বলল মুসা। 'ড্রাইভারদের ওপর। লরিটা কি করল, দেখলে না?'

'লরিটা ঠিকই আসছিল,' মনে করিয়ে দিল কিশোর, 'ববই আনমনা হয়ে গিয়েছিল।'

'হুঁ!'

এত কাণ্ড ঘটে গেল, বোরিস হাঁ-না কিচ্ছু বলল না, স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে যেন সে। একেবারে চুপ। তার এই ভাবসাব ভাল লাগল না মুসার। সত্যিই কি ভূতের আসর।

চার

তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন কিশোর। বাকি পথটা নিরাপদেই ফিরেছে ওরা। ফিরেই রবিনের বাড়িতে টেলিফোন করেছে কিশোর। তাকে পায়নি, বাবা-মার সঙ্গে খালার বাড়ি গেছে রবিন, পার্টিতে।

থ হয়ে গেছে বব। অল্প কথায় তাকে বলেছে সব মুসা, লেখা-পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে শখের গোয়েন্দাগিরি করে তারা। দুই সুড়ঙ্গ আর হেডকোয়ার্টার দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে বব। রা সরছে না মুখে।

ডেস্কের ওপাশে নিজের চেয়ারে বসেছে কিশোর, উল্টো দিকে বসেছে মুসা আর বব।

'আর দেরি করে কি হবে?' কিশোর বলল। 'রবিন কখন আসে, ঠিক নেই। এলেও এত রাতে তার মা তাকে এখানে আসতে দেবেন কিনা, সন্দেহ। আমরা পড়ে ফেলি চিঠিটা। সকালে খবর দেব রবিনকে।'

'ঠিক আছে,' সায় জানাল মুসা আর বব।

'বের করো,' ববকে বলল কিশোর।

পকেট থেকে খামটা বের করল বব। ভেতর থেকে বেরোল কয়েক পাতা আধময়লা কাগজ, ঠিক মত ভাঁজ করার সময় পায়নি লেখক, বোঝাই যাচ্ছে। টেবিলে বিছিয়ে হাত দিয়ে ডলে সেগুলোকে সমান করল সে।

'পড়ো,' বলল কিশোর।

'তুমিই পড়ো,' কাগজগুলো ঠেলে দিল বব।

'আমি…আচ্ছা,' কাগজগুলো টেনে নিয়ে আরেক দফা সমান করল কিশোর। জোরে জোরে পড়তে শুরু করলঃ

ডিয়ার বব,

হাসপাতালে বসে লিখছি এ-চিঠি, এখানে আমি মোটামুটি নিরাপদ।

মনে হয় না এটা তোমার হাতে পৌঁছবে, কিন্তু যদি পৌঁছায়ই, পড়ো ভালমত, আমার পরামর্শ মত কাজ করো, হয়তো কোনদিন প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হতে পারবে। আবার বলছি, প্রচুর ধনসম্পদ। সাবধান, কাউকে কিছু বলবে না। চিঠিটা তো দেখাবেই না, তাহলে ধনসম্পদ পাওয়া তো দূরের কথা, প্রাণে বাঁচবে কিনা সন্দেহ। স্রেফ খুন হয়ে যাবে।

খুলেই বলি সব। খুব সুন্দর একটা জাহাজ 'সী-ওয়েভ,' ছোট, কিন্তু ভাল। এখন ওটা সাগরের তলায়, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তার বেশিরভাগ নাবিককে। আহা, কি ভাল লোকই না ছিল তারা! সব দোষ ওই শয়তান, মাতাল বিগ হ্যামারের। গরিলার মত শরীর, তেমনি কুৎসিত চেহারা, গালে কাস্তের মত বাঁকা একটা কাটা দাগ আরও বীভৎস, ভয়াবহ করে দিয়েছে মুখটাকে। ভীষণ খারাপ লোক, কতখানি খারাপ, তা তার সংস্পর্শে যারা এসেছে তারা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

সী-ওয়েভে করে সে-ই আমাদের শেষ যাত্রা। গরিলাটাকে সেদিন জাহাজে উঠতে দেখেই কেন জানি মনে হলো, অঘটন ঘটবে সে-যাত্রায়। আমাদের ফার্স্ট মেট অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার জায়গায় হ্যামারকে নেয়া হয়েছে। টার্নার খুব ভাল লোক ছিল, নাবিকদের ভালবাসত, অথচ তার জায়গায় এ-কাকে নেয়া হলো! দেখেই অপছন্দ করলাম আমরা, সী-ওয়েভের নাবিকেরা। কিন্তু ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্ত, আমরা আর কি বলব।

জাহাজ ছাড়ল। যাত্রার শুরুতেই যখন ন্যাব লাইটের দেখা পেলাম না, বুঝলাম, কপালে খারাপী আছে। যাব রিও-তে। এমনিতেই ওদিককার সাগরের বদনাম আছে, যখন তখন ঝড় ওঠে, সেটা প্রমাণ করার জন্যেই যেন উত্তর-পশ্চিম থেকে ধেয়ে এল পাগলা হাওয়া, বড় বড় ঢেউ উঠল, মোচার খোলার মত দোলাতে শুরু করল জাহাজটাকে। নিচে, নাবিকদের কেবিনে গিয়ে আশ্রয় নিলাম আমরা। গরিলা নামল না, ব্রিজে রয়ে গেল। মাতাল অবস্থায় হাল ধরেছে, ঘষা লাগিয়ে দিল একটা স্টীমারের সঙ্গে। ভাগ্য ভাল, সামনাসামনি গুঁতো লাগায়নি, তাহলে ওখানেই হয়তো মরতাম আমরা। ক্যাপ্টেনের শরীর বিশেষ ভাল না, ঘুমের বড়ি খেয়ে নিজের কেবিনে শুয়ে আছেন, তাই বোধহয় ঘষা লাগার শব্দ শুনলেন না। আর ভীষণ ঝড়ের মাঝে কেবিন থেকে ওই শব্দ শোনাও যায়নি বোধহয়।

হ্যামারকে টার্নারের মত বিশ্বাস করা উচিত হয়নি ক্যাপ্টেনের। এই যে একটা দুর্ঘটনা ঘটাল, তারপরও হুঁশ হলো না হ্যামারের, মদ গিলেই চলল। আপন খেয়ালে যেদিকে খুশি ভেসে চলল জাহাজ, গরিলাটার কোন খবরই নেই। সে রাতে সারাটা রাত আতঙ্কে অস্থির হয়ে রইলাম আমরা, যে কোন মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে। আমরা ঠিক করলাম,

সকালে ক্যাপ্টেনকে জানাব হ্যামারের গাফিলতির কথা। তার মাতলামির জন্যে জাহাজসুদ্ধ সবাই তো আর মরতে পারি না।

কোনমতে রাতটা কাটল। সকালে একজন নাবিক গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জানাল। হ্যামারকে ডেকে খুব একচোট ধমকালেন তিনি, হুঁশিয়ার করে দিলেন, এরপর এ-রকম হলে আর সহ্য করবেন না।

মুখ কালো করে ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে বেরোল গরিলা, তারপর শুরু হলো তার অত্যাচার। সে কী অত্যাচার! পরের পনেরোটা দিন যে কী যন্ত্রণায় কাটল! জাহাজের পরিবেশকে নরক বানিয়ে ছাড়ল শয়তানটা। শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, বিনা রক্তপাতে বুঝি আর রিওতে পৌঁছানো সম্ভব হলো না। সে যা শুরু করেছে, যে-কোনো মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে। পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে উঠল, যখন রহস্যজনক ভাবে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। ধরাধরি করে তাঁকে কেবিনে নিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো। জাহাজের দায়িত্ব পুরোপুরি এখন গরিলার হাতে। আরও মরলাম আমরা। জাহাজ আর জাহাজ রইল না, দোজখ হয়ে উঠল।

আসল কাহিনী শুরু হলো এরপর। পথ হারাল জাহাজ। জাহাজের গতিপথ ঠিক করার কোন চেষ্টাই করল না হ্যামার, সারাক্ষণ মদ নিয়ে রইল। গত ক'দিন থেকেই আবহাওয়া খারাপ। অবশেষে আঘাত হানল হারিকেন। সে-কী ঝড়! আমার এত দিনের নাবিক-জীবনে এমন ঝড় আর দেখিনি। দক্ষিণ-পুব থেকে বইল প্রচণ্ড ঝড়, সাগরের ঢেউ তো না, যেন একেকটা হিমালয় পর্বত। ভাল জাহাজ বলেই টিকে রইল সী-ওয়েভ কোনোমতে, নইলে পয়লা ধাক্কাতে তলিয়ে যাওয়ার কথা। গল গল করে পানি ঢুকছে জাহাজে, হাত-পাম্প দিয়ে সেচে কুলিয়ে উঠতে পারছি না আমরা। পানি ঢুকে বয়লারের আগুন গেল নিভে, ইঞ্জিন বন্ধ। ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রধান মাস্তুল ভেঙে ভেসে চলে গেল, সঙ্গে করে নিয়ে গেল অ্যান্টেনা আর কিছু মূল্যবান জিনিস, বিকল হয়ে গেল বেতার যন্ত্র! বিপদ সংকেত যে পাঠাব, সে উপায়ও থাকল না। অসহায় ভাবে ভেসে রইলাম আমরা।

পরের চারটে দিন যেন এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, কোন জাহাজ চোখে পড়ল না। সী-ওয়েভের খোলের জায়গায় জায়গায় ছিদ্র আর ফাটল দেখা দিয়েছে, পানি ঢুকছে, সেচব আর কত? ধীরে ধীরে ডুবছে জাহাজ, বুঝতে পারছি। কিন্তু ঠেকাব কি করে? আমাদের সবার অবস্থা এত কাহিল, কুটোটি সরানোর শক্তি নেই। চারদিন চার রাত শুধু পানি সেচেছি, ঝড়ের সঙ্গে ঝুঝেছি, শরীর আর চলছে না, আর পাম্প চালাতে পারছি না, ফলে দ্রুত ডুবছে জাহাজ। আর বেশিক্ষণ ভাসিয়ে রাখতে পারব না ওকে।

যখন বুঝলাম, সী-ওয়েভের আয়ু শেষ, পানি আর না সেচে নৌকা

নামালাম। প্রথম নৌকাটায় নামিয়ে দিলাম ক্যাপ্টেনকে। বাতাসের গতিবেগ কমেছে অনেকখানি, কিন্তু ঢেউ বেশ বড় বড়ই রয়েছে। ক্যাপ্টেনের ভাগ্য মন্দ, বিশাল এক ঢেউ এসে নৌকাটাকে তুলে নিয়ে আছাড় মারল জাহাজের গায়ে, এক আছাড়েই চুরমার, চোখের পলকে ফেনা আর ঢেউয়ের তলায় হারিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইলাম। দড়ি ধরে নৌকায় উঠতে যাচ্ছিল হ্যামার, ঝুলে রইল ওভাবেই, গাল দিতে দিতে ডেকে উঠে এল আবার দড়ি বেয়ে। নৌকায় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যারা উঠেছিল, তাদের একজনকেও দেখা গেল না আর, সবাই তলিয়ে গেছে ঢেউয়ের তলায়।

ডেকে আমার সঙ্গে আর মাত্র চারজন নাবিক বেঁচে আছে। বিগ হ্যামার, পম্পেইয়ের জিম কারনি, বাবুর্চি হ্যারি লুই, আর কিম কারপেনটার, ওই যে, তোমার কিমচাচা, যে আমার সঙ্গে আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল, চিনেছ তো? ছোট্টখাট্টো লোকটা, পাকানো মস্ত গোঁফ ছিল, গিলিংহ্যামে বাড়ি, জানো বোধহয়।

আরেকটা নৌকা আছে জাহাজে, সাবধানে নামালাম ওটা। প্রাণ হাতে করে ভয়ে ভয়ে নামলাম ওতে। আগেরটার অবস্থা দেখেছি, তাই হুঁশিয়ার রইলাম, তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনলাম ডুবন্ত জাহাজের কাছ থেকে।

পনেরো পনেরোটা দিন ছোট্ট সেই ডিঙিতে যে কি করে কাটল পাঁচজন লোকের, কী যে কষ্ট, বোঝাতে পারব না। হাতে ধরে ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন, তাই বেঁচে আছি! পনেরো দিনের দিন দূরে ডাঙা চোখে পড়ল। ক্যারিবিয়ান সাগরের একটা দ্বীপ, নাম প্রভিডেন্স, দ্বীপটা আমার চেনা। এর আগেও ওখানে নেমেছি একবার, জাহাজে পানি নেয়ার জন্যে। জানা গেল, হ্যামারও চেনে। লম্বাটে একটা দ্বীপ, দুই প্রান্তে বিচিত্র চেহারার পাহাড়। গায়ে শক্তি নেই, তবু ডাঙা দেখে শুধু মনের জোরে দাঁড় তুলে নিয়ে বেয়ে চললাম। কিন্তু তখনও ভাগ্য আমাদের ওপর বিরূপ, তীর ঘেঁষে বয়ে চলা তীব্র স্রোত দ্বীপের গায়ে নৌকা ভিড়তে দিল না, টেনে নিয়ে চলল আবার খোলা সাগরে। দাঁড় ফেলে দিয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়লাম, যেদিকে খুশি যাক ডিঙি, আর কেয়ার করি না। দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে নৌকা। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাহিল আমরা, চোখের সামনে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখছি খাবার আর পানির উৎস, তখন আমাদের মনের অবস্থা যে কী, কি করে বোঝাই! ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, জিম কারনি মারা গেছে আগেই, সে-রাতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল বেচারা হ্যারি। আমরাও মৃত্যুকে মেনে নিয়ে অপেক্ষা করে আছি, এবার কার পালা আসে!

কিন্তু মরলাম না। স্রোত আমাদেরকে এনে ঠেকাল আরেকটা দ্বীপের গায়ে, আধমরা অবস্থায় নামলাম তীরে। বুঝলাম, আপাতত বেঁচে গেছি।

দ্বীপে প্রচুর নারকেল গাছ আছে, গাছের নিচেই পড়ে আছে অনেক নারকেল। তাড়াতাড়ি নারকেল ভেঙে পানি খেলাম, তারপর খেলাম মিষ্টি শাঁস। অচেনা দ্বীপ, নাম জানি না, তবে জানলে ভাল হত; কেন, একটু পরেই বুঝবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তীরের নরম বালিতেই হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা।

খুব একটা খারাপ থাকতাম না দ্বীপটাতে, যদি গরিলাটা আমাদের সঙ্গে না থাকত। খাবার আর পানি তো পেয়েই গিয়েছিলাম, চুপচাপ এরপর শুধু অপেক্ষা করতাম, ওপথে কোন জাহাজ গেলে কোনভাবে ওটার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশে ফিরে আসতে পারতাম আবার। কিন্তু আমাদের জান খারাপ করে ছাড়ল বিগ হারামজাদা। নারকেলের পানি পিপাসা মেটাতে পারে, কিন্তু হ্যামারের মদের নেশা আর তো পারে না। মদের জন্যে পাগল হয়ে উঠল সে, এম নিতেই বদমেজাজী, আরও খারাপ হয়ে গেল। তার মেজাজের জ্বালায় তটস্থ করে রাখল আমাদের সারাক্ষণ।

যা-ই হোক, খাই-দাই, হ্যামারের অত্যাচার সহ্য করি, আর দ্বীপটা ঘুরে ঘুরে দেখি আমি। অদ্ভুত একটা দ্বীপ। মাইল দশেক লম্বা একটা সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ যেন, চাঁদের পেটটা বেশিই মোটা, পাঁচ মাইল মত হবে।

এক মাস কাটিয়ে দিয়েছি দ্বীপে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মেজাজ দেখানো শুরু করল হ্যামার, গালাগাল করতে লাগল খাবার পানি এনে রাখিনি বলে। কত আর সওয়া যায়? রেগে গিয়ে বললাম, আমি তার বাপের চাকর নই, দরকার পড়লে নিজে এনে খাকগে। ব্যস, চোখের পলকে ছুরি বের করে তাড়া করল আমাকে। আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই, থাকলেও ওর সঙ্গে পারতাম না, ঝেড়ে দৌড় দিলাম। পেছনে তাড়া করে এলো সে। ছুটতে ছুটতে উঠে এলাম ছোট একটা পাহাড়ে। পেছনে ফিরে তাকানোর সাহস নেই। আমার ধারণা, ঠিক পেছনেই রয়েছে সে, ধরে ফেলল বলে। সামনে ঘাস-লতার জঙ্গল। সোজা ছুটে গেলাম, কয় পা' এগিয়েছি বলতে পারব না, হড়াৎ করে পড়ে গেলাম নিচে। হঠাৎ যেন দু'ফাঁক হয়ে গেল মাটি, গিলে নিয়ে ঠাঁই দিল আমাকে তার জঠরে। পৌঁছে গেছি বোধহয় পাতাল রাজ্যে!

চোখ মেলে তাকালাম ভয়ে ভয়ে। আবছা আলো। এ-কি! এ কোথায় এসেছি! স্বপ্ন দেখছি না-তো? অনেক পুরানো একটা কাঠের জাহাজের স্যালুনে পড়েছি, এই জিনিস তো এখন মিউজিয়মের সামগ্রী। আমি এর ভেতরেই রয়েছি, সত্যি তো? চিমটি কাটলাম হাতে, চুল টেনে দেখলাম। না, জেগেই তো আছি।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই আবার বাস্তবে ফিরে এলাম। এই জাহাজটা এখানে এল কি করে? তীরের এত ভেতরে? শুকনোয় কখনও

জাহাজ চলেছে বলে শুনিনি। তার মানে কি? আবার সব উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা আসতে শুরু করল মনে। আমি বোধহয় মরে গেছি। পরলোকে তো যা খুশি ঘটতে পারে, এই যেমন, জাহাজ হয়তো চলে শুকনো দিয়ে। যমদূতের অপেক্ষায় চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম।

খানিক পরে কিছুই ঘটল না দেখে আবার চোখ মেললাম। দূর, কি সব বাজে কথা ভাবছি!—ধমক লাগালাম নিজেকে। কোথায় এসেছি, ভাল করে দেখিই না কেন। ওপর দিকে তাকালাম। ছাতে একটা গর্ত। বুঝলাম, ওই গর্ত দিয়েই পড়েছি। সাহস ফিরে এল মনে, কিন্তু পরক্ষণেই একটা জিনিস দেখে আত্মা চমকে গেল আমার।

একজন মানুষ! না না, মানুষের কংকাল। পুরানো আমলের নাবিকের পোশাক পরনে, পচে বিবর্ণ হয়ে গেছে কাপড়ের রঙ। একটা ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসে বিকট ভঙ্গিতে দাঁত খিঁচিয়ে রেখেছে যেন মাংস-চামড়া শূন্য মুণ্ডুটা, কালো চক্ষুকোটর দুটো যেন আমার দিকে চেয়েই শাসাচ্ছে।

নিজেকে বোঝালাম, ওটা সাধারণ একটা কঙ্কাল মাত্র, ওটাকে এতো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সাহস সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালাম, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম কাছে। কয়েকটা জিনিস পড়ে আছে টেবিলে, কোনটাই ছুঁলাম না, শুধু··· নিশ্চয় অনুমান করতে পারছ? দাঁড়াও, খুলেই বলি সব। বিশাল এক মোমবাতি দাঁড়িয়ে আছে রূপোর মোমদানিতে, তিন-চারশো বছর আগের জিনিস বলে মনে হলো। ওটার পাশে পড়ে আছে একটা পিস্তল, পুরানো আমলের। মিউজিয়মে দেখতে পাবে ওই জিনিস। এক টুকরো কাগজ পড়ে আছে, পুরানো হতে হতে হলদে হয়ে গেছে, তার পাশে পালকের কলম। মৃত্যুর আগে বোধহয় ওই কাগজে কিছু লিখছিল লোকটা, কাগজটা দিলাম এই চিঠির সঙ্গে। আরেকটা যে জিনিস দিলাম, সেটাও ছিল টেবিলে। প্রথমে মনে হয়েছিল, একটা মেডাল। হাতে নিয়ে ভাল মত দেখতেই বুঝে গেলাম, সোনার মোহর, স্প্যানিশ ডাবলূন। মিউজিয়মে দেখেছি এর আগে, তাই চিনতে পারলাম। মোহরটা রেখে দিলাম পকেটে। তারপর মন দিয়ে দেখলাম হলদে কাগজের লেখা। একটা নকশা। মাথামুণ্ডু বুঝলাম না কিছু। আরও অনেক সোনার মোহর কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো লোকটা? পরে ভালমত দেখব ভেবে, নকশাটা যত্ন করে রেখে দিলাম পকেটে। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম, আর কি কি আছে জাহাজে।

পুরানো, জীর্ণ জাহাজটাতে আরও কি কি ছিল, বলার সময় এখন নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, দেখলে হাঁ হয়ে যাবে, যেমন আমি হয়েছি। কি নেই জাহাজটায়? আলমারি আর সিন্দুক ভর্তি রয়েছে কাপড়ের স্তূপ, সে-কালের নানারকম মূল্যবান কাপড়, সিল্ক, সার্টিন, ইত্যাদি। এসবও হয়তো লুকিয়ে ফেলত, হয়তো লুকানোর জন্যেই এই দ্বীপে এসেছিল

লোকটা, কিন্তু সময় পায়নি, তার আগেই মারা গেছে।

অনেক কিছুই দেখেছি, ভাবলাম, এবার বেরোনো দরকার। কিন্তু বেরোতে গিয়ে দেখলাম, যেখান দিয়ে পড়েছি, সেখান দিয়ে বেরোনো সম্ভব নয় কিছুতেই। আবার ভয় পেয়ে গেলাম। তবে কি এই অদ্ভুত জাহাজে ওই কংকালটার সঙ্গেই জ্যান্ত কবর হয়ে গেল আমার? না না, এভাবে মরতে চাই না আমি। বেরোনোর আপ্রাণ চেষ্টা চালালাম। আর কোন উপায় না দেখে ভাঁড়ার থেকে একটা শাবল এনে খুঁচিয়ে ছিদ্র করলাম জাহাজের খোল। হেসো না, হেসো না—জাহাজের কাঠ দীর্ঘদিন স্যাঁতসেঁতে মাটিতে থাকতে থাকতে পচে গিয়েছে, তাই এত নরম। বড় একটা ফোকর করে, লতার দঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে বেরিয়ে এলাম। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম আশপাশটা, আবার এলে যেন চিনতে পারি। এলে তুমিও চিনতে পারবে, হলুদ কাগজটায় চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দিয়েছি।

আগে কোন সময় নিশ্চয় একটা সরু খাল ছিল ওখানে, সাগর থেকে শ'খানেক গজ ভেতরে একটা খাঁড়িতে, গিয়ে পড়েছিল। ওই খাল বেয়ে জাহাজটা গিয়ে পড়েছিল খাঁড়িতে, তবে সেটা অনেক আগে, এখন হলে পারত না। এখন একেবারে খটখটে শুকনো। বাইরে থেকে দেখতে পাবে না জাহাজটা, পাহাড়ে ঘিরে রেখেছে, তার ওপর ঘন হয়ে জন্মেছে লতাপাতা। এতোবড় একটা জাহাজকে যেন বেমালুম গিলে নিয়েছে, কেউ ভাবতেই পারবে না আছে ওটা ভেতরে। ঠিক করলাম, যা-ই পাওয়া যায়, আমি আর কিম ভাগ করে নেব। যেদিক দিয়ে বেরিয়েছি, সে পথটা আবার লতাপাতা আর নারকেলের ডাল দিয়ে বন্ধ করে দিলাম এমনভাবে, যেন বোঝা না যায় কিছু। অনেক সময় পেরিয়েছে, এতক্ষণে হয়তো শান্ত হয়েছে হ্যামার, ভেবে ফিরে এলাম ল্যাগুনের ধারে, যেখানে আস্তানা গেড়েছি আমরা। বলতে ভুলে গেছি, একটা ছোট সুন্দর ল্যাগুন আছে দ্বীপের এক ধারে। পাহাড়ের গা থেকে ওখানে উঁচু একটা পাথর ঠেলে বেরিয়ে ছাতের মত হয়ে আছে, তার নিচেই আমাদের বাসা।

চুপচাপ বসে আছে হ্যামার। আমার দিকে কড়া চোখে তাকাল। সাবধান করে দিয়ে বলল, ভবিষ্যতে পানি আনতে ভুল করলে আর ছাড়বে না, খুন করে ফেলবে। বললাম, আর কখনও এমন ভুল হবে না। ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমার পকেটে একটা ফুটো ছিল, সেই ফুটো দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল মোহরটা, হ্যামারের একেবারে চোখের সামনে।

বালিতে পড়ে থাকা চকচকে জিনিসটার দিকে চেয়ে রইল হ্যামার দীর্ঘ এক মুহূর্ত, কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন ওর চোখ। 'কোথায় পেয়েছ ওটা?'

'বলব কেন?' মুখ ফসকে বলে ফেললাম।

ধ্বক করে জ্বলে উঠল হ্যামারের চোখ, কিন্তু সামলে নিল। একেবারে বদলে গেল তার চেহারা, কণ্ঠস্বর। গলায় মধু ঢেলে বলল, 'ভাই আমার, দোস্ত আমার, তুমি না আমার প্রাণের বন্ধু! একই জাহাজে চাকরি করেছি আমরা, সমস্ত বিপদ ভাগ করে নিয়েছি, আমার জিনিস তোমার, তোমার জিনিস আমার। তাই না? সকালের কথা ভুলে যাও, মাথার ঠিক ছিল না, কি করতে কি করে ফেলেছি। তা ভাই, কোথায় পেয়েছ এটা?'

'না, মিস্টার হ্যামার,' মাথা নাড়লাম, 'মিষ্টি কথায় ভুলছি না। তোমার সঙ্গে আমার দোস্তি নেই, কোনদিন ছিল না। কিছুতেই বলছি না আমি।'

'বলবি না!' চেঁচিয়ে উঠল হ্যামার। 'হারামজাদা!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, হাতে ছুরি।

এক লাফে আমাদের মাঝে এসে পড়ল কিম, ঠেকাতে। ততক্ষণে ছুরি চালিয়েছে হ্যামার, সেটা আমার গায়ে না লেগে লাগল কিমের গলায়। আমি আর হ্যামার যখন কথা বলছিলাম, মোহরটা তুলে নিয়ে দেখছিল কিম, সেটা হাতেই রয়েছে। জবাই করা ছাগল যেন, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে, শিথিল হাত থেকে খসে পড়ল সোনার মোহর, ওটার পাশেই গড়িয়ে পড়ল বেচারা। রক্তে ভিজে যাচ্ছে শাদা বালি। কয়েক মুহূর্ত হাত-পা নাচিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা।

বোকা বনে গেলাম। হ্যামারের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে, ফেকাসে হয়ে গেছে চেহারা। ছোঁ মেরে মাটি থেকে মোহরটা তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'খুন করেছিস ওকে তুই, গরিলার বাচ্চা গরিলা! পার পাবি না। জাহাজে উঠেই ক্যাপ্টেনকে বলে দেব।'

ঝট করে মুখ তুলল হ্যামার, ছুরিটা আবার শক্ত হাতে চেপে ধরে ছুটে এল আমার দিকে। গাল দিয়ে উঠল। আমার মরহুম ক্যাপ্টেন বলতেনঃ গাল দিতে পারে সবাই, কিন্তু ভয় পাওয়াতে পারে ক'জন? তার জন্যে তেমন বিষাক্ত জিভ থাকা চাই। এই মুহূর্তে আমার সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল, হ্যামারের মত বিষাক্ত জিভ ক'জনের আছে। একটা খুন করেছে, এরপর আর হাত কাঁপবে না তার, এক সেকেণ্ডও দেরি করলাম না। ঘুরেই দৌড় দিলাম সোজা বনের দিকে। দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম বনে, এরপর যতদিন ওই দ্বীপে ছিলাম, বন থেকে বেরোইনি। মাঝে মাঝেই দেখেছি, আমাকে খুঁজছে হ্যামার, সোনার মোহর কোথায় পেয়েছি, সেই জায়গা খুঁজছে। কোনটাই পায়নি। অবশেষে একদিন একটা জাহাজের দেখা পেলাম, আমিই প্রথম দেখেছি, ওটার দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে পারলাম। দ্বীপে ভিড়ল জাহাজটা। একটা স্কুনার, নাম আটলান্টিক সিটি। সৈকতে ছুটে গেলাম, হ্যামার এল পরে, দ্বীপের উল্টো

প্রান্তে ছিল, হাঁকডাক শুনে ছুটে এসেছে। না, হ্যামারের কুকাণ্ডের কথা বলিনি ক্যাপ্টেনকে। আর বলবই বা কখন। আমরা জাহাজে ওঠার পর থেকেই একটা না একটা অঘটন ঘটেই চলল। প্রথমেই রাডার খারাপ হয়ে গেল, তারপর মাস্তুল ভেঙে পড়ে মারা গেল দু'জন লোক। আরও কত কাণ্ড যে ঘটল। যা-ই হোক, অবশেষে যেন ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন এসে বোসটনে ভিড়ল আটলান্টিক সিটি। বন্দর থেকে বেরিয়েই পড়লাম গাড়ির তলায়। জ্ঞান ফিরতেই দেখি শুয়ে আছি হাসপাতালের বেডে। এখানে বসেই এই চিঠি লিখছি। সারাক্ষণ হ্যামারের ভয়ে অস্থির হয়ে আছি। জাহাজে থাকতেই শাসিয়েছে, সোনার সন্ধান না দিলে আমার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেবে।

শরীর খারাপ, ভাবছি, ভাল হলেই তোমাকে দেখতে আসব। চাকরিও দরকার। সী-ওয়েভ তো গেছে, আরেকটা ভাল জাহাজ আর ভাল ক্যাপ্টেন খুঁজে নেয়া যে কী কঠিন। যদি কোন কারণে আমি আসতে না পারি এ-চিঠি আমার একজন নতুন নাবিক-বন্ধুকে দিয়ে দেব, সে পৌঁছে দেবে তোমার কাছে।

যদি আমার কিছু ঘটে যায়, তুমি যেও সেই দ্বীপে, যখন পারো। প্রচুর ধনরত্ন লুকানো আছে ওখানে, আমার বিশ্বাস। আর যদি মোহর খুঁজে না-ই পাও, জাহাজে যা সম্পদ আছে, সেগুলো এনে বিক্রি করলেও বড়লোক হয়ে যাবে। প্রথমে প্রভিডেন্সে যাবে, সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল গেলেই পেয়ে যাবে দ্বীপটা। দেখলেই চিনবে, সপ্তমী চাঁদের আকৃতি, পুবধারে পাহাড়। জাহাজটা পাবে উত্তর প্রান্তে, ওদিকে আরেকটা খুদে দ্বীপ প্রায় গা ঘেঁষে রয়েছে মূল দ্বীপের। ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিলাম।

এ-মুহূর্তে তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে, বব। প্রথম সুযোগেই তোমাকে দেখতে আসব। আবার বলছি, যদি আমার কিছু হয়ে যায়, বড় হয়ে তুমি কিন্তু যেও সেই দ্বীপে, যেভাবে পারো।

ভাল থেকো, বব, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই জানাই।

ইতি—
তোমার বাবা।

পাঁচ

চিঠি পড়া শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। এমনকি মুসা আমান পর্যন্ত চুপ করে আছে। ববের চোখে জল, নীরবে কাঁদছে সে, গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে অশ্রুধারা।

চিঠিটা আবার ভাঁজ করে রাখছে কিশোর, শুধু তার মৃদু খসখস শব্দ, এছাড়া একেবারে নীরব হেডকোয়ার্টার। চিঠি ভাঁজ করে রেখে খামের ভেতর হাত ঢুকিয়ে

আরেকটা ছোট ভাঁজ করা কাগজ বের করে আনল সে, হলদেটে কাগজ। মেলল। 'হ্যাঁ, এই যে সেই নকশা,' নীরবতা ভাঙল সে।

'বোঝা গেল...,' চোখ মুছতে মুছতে বলল বব, কেন চিঠিটা নিতে এসেছিল গরিলা হারামজাদা।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর।

'সোনার মোহরটার জন্যে,' বলল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না। এসেছিল চিঠিটার জন্যে, পড়ে দেখতে চেয়েছিল, কি লেখা আছে। গুপ্তধন কোথায় আছে, লেখা আছে কি-না।'

'গিয়ে তাহলে খুঁজে বের করে নেবে,' বলল বব।

'পারুক না পারুক, চেষ্টা তো অবশ্যই করবে।'

একটু চুপ করে থেকে বব বলল, 'তো, কি মনে হয় তোমার? বাবা কি সত্যিই গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছিল?'

'আমার কোন সন্দেহ নেই। তোমার বাবাকে তুমি চেনো, তুমি ভাল বলতে পারবে তিনি কেমন লোক ছিলেন। চিঠি পড়ে আমার যা মনে হলো, মিথ্যে বলার লোক তিনি নন। একটা বর্ণও মিথ্যে লেখেননি।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল বব। 'ফালতু কথা বলত না কখনও বাবা।'

'আমারও তাই ধারণা। আর সত্যি যে তিনি বলছেন, এই নকশা আর মোহরটাই তার প্রমাণ।'

'সবই তো জানলাম,' মুসা বলল, 'এখন আমরা কি করব?'

'কিছু তো একটা করবই,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'বব, আমার মনে হয়, জলদস্যুর জাহাজ আবিষ্কার করে বসেছেন তোমার বাবা। এক সময় ওসব সাগরে জলদস্যুদের আনাগোনা ছিল খুব বেশি। কাছাকাছি কোন ব্যাংক ছিল না, আর থাকলেও তাতে মোহর রাখতে যেত না ডাকাতেরা। অসৎপথে অর্জিত টাকা রাখতে যাবেই বা কোন সাহসে? নিয়ে গিয়ে তাই লুকিয়ে রাখত কোথাও, নির্জন জায়গায়ই বেশি রাখত। আর কোনদিনই হয়তো গিয়ে ওই ধন তুলে আনার সুযোগ হত না অনেকের। কিন্তু এটা অন্য কেস। কোনভাবে জাহাজটা ঢুকে গিয়েছিল খাড়িতে, আটকে গিয়েছিল, যে লোকটা ওতে ছিল, বেরোতে পারেনি আর। যেভাবেই হোক, মারা গেছে সে। বছরের পর বছর পড়ে থেকে পচেছে জাহাজটা, শেওলা আর লতাপাতা আগাছায় ছেয়ে ফেলেছে এক সময়। জানোই তো, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় জঙ্গল কি হারে বাড়ে। আর বাইরে থেকে দেখা যায় না কেন, দেখাচ্ছি,' উঠে গিয়ে ছোট বুকশেলফ থেকে মোটা একটা এনসাইক্লোপিডিয়া বের করে আনল কিশোর, খুলে একটা ছবি বের করল। ববের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এই হলো জাহাজের চেহারা, আজকের লোহার জাহাজ তো না। পাহাড়ের ভেতরে লতাপাতায় ঢাকা থাকলে বের করা খুব মুশকিল। এই জন্যেই হ্যামার এত খুঁজেও পায়নি। তোমার বাবা হঠাৎ করেই তার ভেতরে পড়ে গিয়েছিলেন, নইলে তিনিও কোনদিনই দেখতে পেতেন না জাহাজটা। কিন্তু হ্যামার ব্যাটা সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।'

'কি করে এত শিওর হচ্ছ, হ্যামারই গিয়েছিল আমার ঘরে?'

'খুব সহজ ব্যাপার। তোমার বাবা তো খুব ভালমতই বর্ণনা দিয়েছেন তার চেহারার। বার বার উল্লেখ করেছেন গরিলা বলে, তোমার ঘরে যে এসেছিল, সে দেখতে গরিলার মত নয়? গালে কাস্তের মত বাঁকা কাটা দাগ ছিল না? চেহারা না হয় দু'জনের মানুষের প্রায় একরকম হতে পারে, কিন্তু কাটা দাগ?'

আবার খানিকক্ষণ নীরবতা।

'তোমার কি মনে হয়?' বলল বব। 'হ্যামারই বাবাকে খুন করেছে?'

'মনে হওয়া খুব সঙ্গত। কথায় কথায় ছুরি বের করে সে, কিমকে খুন করেছে, তোমার বাবাকেও খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছে বার বার। আর গুপ্তধনের জন্যে মানুষ খুন, এটা নতুন কিছু নয়।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। চিঠি নিয়ে এসেছিল যে নাবিক, সে বলেছে, সরাইখানায় নাকি পিঠে ছুরি বেঁধা অবস্থায় দেখেছে বাবাকে...,' কথা রুদ্ধ হয়ে এল আবার ববের।

'হ্যামার নিশ্চয় অনুমান করেছে,' হাতের তালু নাড়ল কিশোর, 'তোমার চিঠিতে নকশা-টকশা কিছু একটা এঁকে পাঠাবেন তোমার বাবা। প্রথমে গিয়েছিল তোমার বাবার ঘরে, সরাইখানায়, কিন্তু তার আগেই ওগুলো হাতবদল করে ফেলেছেন তিনি। রাগের মাথায় তাঁকে খুন করেছে। তারপর এসেছে তোমার কাছে,' কি মনে হতেই তাড়াতাড়ি আবার চিঠি খুলল কিশোর। দেখে নিয়ে বলল, 'চিঠিটা কবে নিয়ে এসেছে বলেছিলে তখন?'

'আজ বিকেলে।'

'হুঁ। আরও অনেক আগেই আসার কথা ছিল। অনেক দেরি করে এনেছে নাবিক। এই যে তারিখ,' দেখাল কিশোর, 'তিন মাস আগের। এত দেরি করল কেন?'

'শুনেছি,' সঙ্গে সঙ্গেই বলল বব, 'কেন এত দেরি হয়েছে। তিন মাস আগেই নাকি চিঠি দিয়েছিল তাকে বাবা, কিন্তু আসতে দেরি হয়ে গেছে তার নানা কারণে। চিঠিটা সে হাতে নেয়ার পর থেকে নাকি একের পর এক অঘটন ঘটেছে। নানারকম ঝামেলায় জাহাজে চড়তেই দেরি হয়ে গেছে নাবিকের, তারপর যখন রওনা হলো শুরু হলো, দুর্ঘটনা। ঝড়ে পড়ল জাহাজ, প্রপেলারের ব্লেড গেল ভেঙে, এক বন্দর থেকে সেটা সারিয়ে নিয়ে আবার ছাড়ল জাহাজ। কয়েক মাইলও যায়নি, কুয়াশার মধ্যে নাকি একটা ট্রলারের সঙ্গে ধাক্কা লাগাল। ডুবতে ডুবতে কোনমত বন্দরে ফিরে গেল আবার মেরামত করাতে।'

মোলায়েম শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'পুরো ব্যাপারটাই জানি কেমন গোলমেলে, খালি প্যাঁচ আর প্যাঁচ।' মুসার দিকে তাকিয়ে নিল একবার কিশোর, কি জানি হয়েছে আজ গোয়েন্দাসহকারীর, কথা বলাই যেন ভুলে গেছে। বড় বেশি চুপচাপ। ববের দিকে ফিরল আবার গোয়েন্দাপ্রধান। 'চিঠি তো পেলে, জানলেও সব কিছু। কি করবে, ঠিক করেছ?'

'পুলিশের কাছে যাওয়াই তো উচিত।'

'কি বলবে?'

'বলব, বিগ হ্যামার আমার বাবাকে খুন করেছে।'

'কি প্রমাণ আছে তোমার হাতে?'

'অ্যাঁ!...তাই তো!...কি করব তাহলে?'

কিছুক্ষণ সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল, তারপর ববের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যামারের কাছ থেকে দূরে থাকবে। গুপ্তধনের খোঁজে রয়েছে, কাজেই মরিয়া এখন সে। কয়েকটা প্রশ্ন খোঁচাচ্ছে আমাকে। ও তোমার কথা জানল কি করে? তোমার বাবার কাছে শুনেছে? কি করে জানল, তোমাকে চিঠি দিয়েছে তোমার বাবা, তাতে গোপন কথা লেখা আছে?' টেবিলে কনুই রেখে দু'হাতের আঙুলের মাথা এক করছে, আবার সরিয়ে আনছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'এবার দেখা যাক, কি কি জেনেছি আমরা। এক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোন নির্জন দ্বীপে পুরানো একটা জাহাজ লুকিয়ে আছে, যাতে রয়েছে মূল্যবান বস্তু, ওটার আশেপাশেই হয়তো রয়েছে গুপ্তধন। দুই, ব্যাপারটা আমরা যেমন জানি, বিগ হ্যামারও জানে, গুপ্তধন পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। তিন, তোমার কাছে একটা চিঠি আছে, তাতে গুপ্তধনের ঠিকানা লেখা আছে...কোনভাবে এটা জেনেছে হ্যামার। সুতরাং, তোমার এখন উচিত কোথাও লুকিয়ে থাকা। ডকের ধারে ওই চিলেকোঠার ছায়া মাড়ানো ঠিক হবে না। মারা পড়বে।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল বব। 'কি করব তাহলে?' আবার একই প্রশ্ন। ফাটা বাঁশে লেজ আটকেছে, করি কি এখন! চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলি? হ্যামার ধরলে বলব, পুড়িয়ে ফেলেছি।'

'বিশ্বাস করবে?' ভুরু নাচাল মুসা।

অসহায় ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিল বব, টান টান করে দিয়ে এক পায়ের ওপর আরেক পা রাখল। 'না, তা করবে না। মিছে কথা বলছি ভেবে পিটিয়ে হাড়গোড় ভাঙবে। কি করব?'

'গুপ্তধন খুঁজে আনার কথা বলছ না কেন একবারও?' কিশোর বলল।

'চাঁদ পেড়ে আনব বললেই কি আর পাড়া যায়?' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল বব। 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন! পকেটে নাই কানাকড়ি, খরচ পাব কোথায়?'

মুসার দিকে ফিরল কিশোর। 'সেকেণ্ড, তোমার কি মনে হয়? ওকে সাহায্য করতে পারব আমরা?'

তালুতে তালু ডলল মুসা, ঠাণ্ডা হাত ডলে গরম করছে যেন। 'আমরা!... কিছু একটা ভাবছ তুমি কিশোর, বলে ফেলো না।'

'গুপ্তধন শিকারে যদি যাই আমরা?'

ফেকাসে হয়ে গেল মুসার চেহারা পলকের জন্যে। 'খাইছে!' তোতলাতে শুরু করল, 'কি-কি-কিভাবে...'

হাসল কিশোর। 'সহজ হবে না যাওয়া। তবে ইচ্ছে করলে যেতে পারি আমরা। তার জন্যে প্রথমেই দরকার, টাকা। অনেক টাকা।'

'কোথায় পাব এত টাকা?'

'চেষ্টা করলে পাব,' ববের দিকে ফিরল কিশোর। 'বব। একটা প্রস্তাব রাখছি। ধরো, টাকা আমি জোগাড় করতে পারলাম, যাওয়াও হলো, ডাবলূনগুলো পেলামও আমরা, ভাগাভাগিটা কিভাবে হবে? তোমার অর্ধেক আমাদের অর্ধেক? খরচাপাতি গিয়ে যা থাকবে সেটাই ভাগ হবে। রাজি?'

'আমাকে নিয়ে তামাশা করছ?' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল বব, শার্টের একটা ছেঁড়া জায়গা ডলে সমান করার চেষ্টা করল।

'ছি, কি বলছ! তামাশা করব কেন? সত্যিই বলছি।'

'তোমার যা ইচ্ছে করো, সব কিছুতেই আমি রাজি,' অনুনয় ঝরল ববের কণ্ঠে। 'শুধু এই বিপদ থেকে বাঁচাও। হ্যামারের ছুরি খেয়ে মরতে চাই না আমি।'

'তাহলে অর্ধেক ভাগে তুমি রাজি,' আগের কথার খেই ধরল কিশোর। 'তো কাজ শুরু করে দেয়া যায়। এখন প্রথম কাজ, দ্বীপটার অবস্থান জানা...'

'চিঠিতেই তো লেখা আছে...' বাধা দিয়ে বলল মুসা।

'লেখা দিয়ে দ্বীপ খুঁজে পাওয়া যায় না, ম্যাপ দরকার,' হাত তুলল কিশোর।

'এত খুদে দ্বীপ ম্যাপে থাকবে?'

'থাকবে না। কিন্তু প্রভিডেন্স দ্বীপটা থাকা উচিত, নামধাম আছে যখন, বোঝা যাচ্ছে, নাবিকেরা চেনে ওটা। আশেপাশে নিশ্চয় আরও দ্বীপ আছে। এমনিতেই ক্যারিবিয়ানে দ্বীপ বেশি। ছোট, বড়, মাঝারি সব রকমের আছে।'

'হলদে কাগজটায় ঠিকানা লেখা নেই? পথ নির্দেশ?'

'না, দেখেছি ভালমত। দ্বীপে নামার পর হয়তো কাজে লাগবে ওটা,' বলল কিশোর, 'অর্থ বের করতে পারি যদি। দেখে তো মনে হচ্ছে, একটা গোলকধাঁধা। মানে না বুঝলে এটা হাতে থাকা না থাকা সমান কথা। আর নকশা ছাড়া গুপ্তধন পাওয়ার আশা প্রায় শূন্য। প্রশান্ত মহাসাগরে কোকোস দ্বীপের নাম শুনেছ? ওখানে গুপ্তধন আছে, ইতিহাস তাই বলে। কথাটা জানাজানি হতেই দলে দলে লোক ছুটল। দ্বীপটা বেশি বড় না, অথচ এত লোকে খুঁজেও একটা মোহর বের করতে পারল না। এক জার্মান থেকেই গেল ওখানে, চষে ফেলল দ্বীপটা। গর্ত যা খুঁড়েছে, মস্ত একটা লড়াইয়ের মাঠেও এত ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয় কিনা সন্দেহ। আঠারো বছর থেকেছে লোকটা, হাতে ফোসকা ফেলেছে শুধু, ম্যালেরিয়া বাধিয়েছে, কাজের কাজ কিচ্ছু হয়নি। কাজেই বোঝো।'

'দিচ্ছ তো হতাশ করে!' হাত নাড়ল মুসা।

'পাবই, এই গ্যারান্টি কে দিল তোমাকে?'

'তাহলে যেতে চাইছ কেন?'

'আশা আছে বলে। ফিফটি ফিফটি চান্স ধরে নেয়াই ভাল। যাকগে, এখন ম্যাপ দেখা দরকার। প্লেন আর পাইলট জোগাড় করতে হবে।'

'কি বললে? প্লেন!' বিস্ময়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ববের।

'হ্যাঁ। কেন, জাহাজে যাব ভাবছিলে নাকি?'

'জাহাজেই তো সুবিধা, নাকি?'

'না, অসুবিধা। নানারকম ঝামেলায় পড়তে হবে। তার চেয়ে প্লেনে যাওয়া

নিরাপদ, সময়ও কম লাগবে, খরচ অবশ্য বেড়ে যাবে অনেক। কিন্তু খরচের কথা মোটেই ভাবছি না।'

এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় করবে কিশোর, বুঝতে পারছে না মুসা, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেসও করল না। কিশোর পাশা যখন বলছে পারবে, নিশ্চয় পারবে।

'টাকা খরচ করলে ভাল প্লেন হয়তো পাওয়া যাবে,' ঘাড় চুলকালো কিশোর, 'কিন্তু ভাল পাইলট পাওয়াই মুশকিল, তাছাড়া বিশ্বস্ত পাইলট। থাক, ওসব নিয়ে পরে ভাবব। আগে ম্যাপে দেখা দরকার, কোথায় যাচ্ছি আমরা।'

'মেরিচাচী রাজি হবেন?' না বলে পারল না মুসা।

'সব চেয়ে কঠিন কাজ ওটাই,' স্বীকার করল কিশোর, 'চাচীকে রাজি করানো,' উঠে দাঁড়াল সে। 'ওঠো, আমার ঘরে যাই। ম্যাপ ওখানে।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ওয়ার্কশপে বেরিয়ে এল ওরা। বাইরে অঝোর বর্ষণ। এরকম জরুরী অবস্থার জন্যেই ওয়ার্কশপে দুটো ছাতা রেখে দিয়েছে কিশোর, কাজে লাগল এখন।

নিজের ঘরে এসে ম্যাপ বের করল কিশোর, টেবিলে এনে রাখল। মুসা আর ববের উল্টোদিকের আরেকটা চেয়ারে বসল সে। ম্যাপ খুলে গভীর মনোযোগে দেখল কিছুক্ষণ, আঙুল রাখল এক জায়গায়, 'এই যে, প্রভিডেন্স।' পেন্সিল দিয়ে হালকা গোল একটা দাগ দিল দ্বীপটাকে ঘিরে। 'এখানে নামতে পারেনি ওরা,' পেন্সিল এগিয়ে নিয়ে চলল সে দক্ষিণ-পশ্চিমে, আঁকাবাঁকা একটা দাগ পড়ল ম্যাপে, 'স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এদিকে, এই যে এই দ্বীপপুঞ্জগুলোর কোন একটাতে।' ছোট ছোট কয়েকটা বিন্দুকে ঘিরে আবার গোল দাগ টানল সে। 'দেখেছ, কত ছোট? কোন কোনটা হয়তো দ্বীপই নয়, নিছক বালির চর, ঝকঝকে শাদা বালি, গাছ নেই, পানি নেই, সামুদ্রিক পাখি আর কচ্ছপ ডিম পাড়ে এসব জায়গায়, মানুষ বাসের অযোগ্য। এখানে, কোন কোনটা আবার বেশ বড়, বিশ-তিরিশ মাইল লম্বা। এসব দ্বীপের কোনটাতেই ঘাঁটি করতে পারব না আমরা। রসদ, বিশেষ করে প্লেনের তেল এর কোনটাতেই পাওয়া যাবে না আমার বিশ্বাস। কিংসটন আর জ্যামাইকা এখান থেকে অনেক দূরে, পোর্ট অভ স্পেনও। তাহলে?, মূল ভূখণ্ডের কোন শহর থেকেই গিয়ে ওসব আনতে হবে আমাদের, প্লেনের জন্যে কয়েকশো মাইল অবশ্য কিছু না। কোন শহরটা?' নিজেকেই প্রশ্ন করল গোয়েন্দাপ্রধান।

'ম্যারাবিনা?' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল মুসা।

'আমিও তাই ভাবছি,' কিশোর মাথা ঝোঁকাল। 'এটাই সব চেয়ে কাছে হবে।'

'কোথায় ওটা?' জিজ্ঞেস করল বব। 'নাম শুনিনি।'

'সেন্ট্রাল আমেরিকায়। এক বিচিত্র শহর,' বলল কিশোর। 'কোস্টারিকা আর হনুরাসের মাঝে যেন আটকে রয়েছে, যেন বিশাল স্যাণ্ডউইচের মাঝে মাংসের বড়া,' ধাপাস করে ম্যাপ-বইটা বন্ধ করল সে। 'দক্ষিণ আমেরিকায় যাওয়ার সময় প্যান-অ্যামেরিকান এয়ার রুটেই পড়ে। আইনকানুনের বালাই নেই, যার যেভাবে খুশি চলছে, ক্ষমতায় আসীন কর্তা ব্যক্তিরা লুটে পুটে খাচ্ছে সব। খাকগে, আমাদের কি? আমাদের পেট্রোল পেলেই হলো। মনে হয়, ওটা ম্যারিন এয়ারপোর্ট, যদি তাই

হয় তাহলে ম্যারিন এয়ারক্র্যাফট দরকার।'

'সী-প্লেন?' ভুরু নাচাল মুসা।

'ফ্লাইং-বোট, উভচর হলে সব চাইতে ভাল হবে, জলে-ডাঙায় যেখানে খুশি নামতে পারব। দামী খুব ভাল কোন প্লেন দরকার নেই, আটলান্টিক পাড়ি দিতে যাচ্ছি না, কাজ চলার মত হলেই হলো।' থামল একটু সে, একে একে দু'জনের মুখের দিকে তাকাল। 'তো, আগামীকাল থেকেই কাজ শুরু করে দিতে পারি আমরা?'

কেউ জবাব দেয়ার আগেই দরজা খুলে উঁকি দিলেন মেরিচাচী, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'এই কিশোর, কতবার না বলেছি, ম্যাটে জুতো মুছে যাবি? কি করেছিস, দেখ্‌তো? এসবের কোনও মানে আছে?'

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। 'কি বলছ, চাচী, মুছেই তো ঢুকেছি!'

'মুছে ঢুকেছিস!' বিস্ময় ফুটল মেরিচাচীর কণ্ঠে, জানেন, কিশোর মিথ্যে কথা বলে না। 'কে করল···চোর-টোর না-তো!'

চোখের পাতা কাছাকাছি হলো কিশোরের. উঠে দাঁড়াল। দরজায় এসে দেখল, ম্যাটটার ওপাশে বেশ কয়েকটা ছাপ, পানি আর কাদা লেগে আছে, বড় বড় জুতো-পায়ে একটু আগে দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে কেউ। 'এখনো বৃষ্টি পড়ছে, না?'

'পড়ছে মানে? মুষলধারে,' বললেন চাচী।

'আশ্চর্য!' গাল চুলকাল কিশোর। 'ঠিক আছে, চাচী, তুমি যাও। আমি মুছে ফেলব। চোর-টোরই হবে!'

'হুঁ!' এদিক-ওদিক তাকালেন মেরিচাচী। 'কিছু নিয়ে যায়নি তো···।' ফিরলেন আবার কিশোরের দিকে। 'খাবি না? রাত তো অনেক হলো।'

'না। খেয়ে এসেছি,' বলল কিশোর। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিছু খাবে?'

'না,' লজ্জিত হাসি হাসল মুসা। 'তখন অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছি।'

'বব, তুমি?'

'না,' মাথা নাড়ল বব।

'কিছুই খাবি না?' আবার বললেন মেরিচাচী।

'নাহ্‌। আর তেমন খিদে পেলে ফ্রিজ থেকে নিয়ে খেতে পারব,' কিশোর বলল।

'ঠিক আছে। রাত বেশি করিস না, শুয়ে পড়,' বলে চলে গেলেন তিনি।

মেরিচাচী চলে যেতেই কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। 'কি মনে হয়? কার কাজ?'

'এখানে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল!' বিড়বিড় করল গোয়েন্দাপ্রধান, 'বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ভেতরে আলোচনা চললে বাইরে আড়ি পেতে কেন দাঁড়িয়ে থাকে লোকে?'

'কি আলোচনা হচ্ছে শোনার জন্যে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বব।

'ঠিক,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'কিন্তু অয়েলস্কিন পরে কে আসতে পারে? সাধারণ কেউ হলে উলের ওভারকোট পরে আসত। উল পানি শুষে নেয়, কিন্তু যে

হারে পড়ে মেঝে ভিজেছে, ওভারকোট হতে পারে না। অয়েলস্কিন। কারা অয়েলস্কিন পরে? পুলিশ আর পোস্টম্যান। তাদের কেউই লোকের বাড়িতে উঁকি মারবে না, এভাবে আড়ি পেতে কথা শোনার চেষ্টা করবে না। তাহলে কে?'

'নাবিক!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'বাহ্, বুদ্ধি খুলছে তোমার,' মৃদু হাসল কিশোর।

লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল বব। 'মানে? হ্যামার অনুসরণ করে এসেছে, এখানেও!'

আলমারি খুলে নিচের তাক থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়া বের করল কিশোর, মোছার জন্যে দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল। 'সেই বোসটন থেকে আসতে পেরেছে, আর এটুকু পথ আসতে বাধা কি?'

ছয়

প্লেনের জানালা দিয়ে পাঁচ হাজার ফুট নিচের তরঙ্গায়িত উজ্জ্বল নীল সাগরের দিকে তাকাল কিশোর। দূরে পাথুরে তীরে ঢেউ ভাঙছে, নীলচে-মাখন ফেনার একটা আঁকাবাঁকা রেখা এগিয়ে গেছে মাইলের পর মাইল, মোড় নিয়ে হারিয়ে গেছে ঘন বেগুনী রঙের আড়ালে। রেখাটার ডানে জঙ্গল, মস্ত এক সবুজ চাদর যেন বিছিয়ে দিয়েছে কেউ।

কিশোরের পাশে পাইলটের সীট, পেছনের দুটো সীটে বব আর মুসা। একঘেয়ে উড়ে চলা আর ভাল লাগছে না ওদের, হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে।

সেই যেদিন প্রথম ববের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিশোর আর মুসার, তারপর পুরো একটি মাস কেটে গেছে। অনেক কাজ, সব কিছু গোছগাছ করতে সময় লেগেছে দুই গোয়েন্দার। তিন গোয়েন্দার একজন, রবিন মিলফোর্ড, এই অভিযানে ওদের সঙ্গে আসতে পারেনি, তার নানীর শরীর নাকি খুব খারাপ, বাঁচেন কি মরেন ঠিক নেই, তাকে দেখতে চেয়েছেন, বাধ্য হয়েই মা-বাবার সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডে যেতে হয়েছে রবিনকে।

খরচের টাকা জোগাড় করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি কিশোরের, জিনাকে বলতেই সে টাকা ধার দিতে রাজি হয়েছে। জিনার এখন অনেক টাকা, দ্বীপে সোনার বার যা পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো বিক্রি করা টাকা সব তার নামে ব্যাংকে জমা করে দিয়েছেন তার বাবা। মোহর পাওয়া গেলে, একটা ভাগ জিনাকে নিতে হবে, এই শর্তে তার কাছ থেকে টাকা নিতে রাজি হয়েছে কিশোর। জিনা ভাগ নিতে রাজি হচ্ছিল না প্রথমে, কিশোরও তাহলে টাকা নেবে না, অবশেষে হার মানতেই হয়েছে জিনাকে। সে-ও আসতে চেয়েছিল এই অভিযানে, অনেক কায়দা করে এড়িয়েছে কিশোর।

টাকা জোগাড় হয়ে যেতেই বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারকে গিয়ে ধরেছে কিশোর। অনেক ব্যাপারে তিনি সাহায্য করেছেন। পাইলট তিনিই জোগাড় করে দিয়েছেন, তাঁর খুব পরিচিত লোক, বিশ্বস্ত। পাইলট এক অদ্ভুত লোক,

বাড়ি মিশরে, নাম ওমর শরীফ। লম্বা, ছিপছিপে, ক্লিন-শেভড্ যুবক, মাথায় ঘন চুল পুরোপুরি কালো নয়, কেমন একটা তামাটে ছোঁয়াচ, গায়ে বেদুইনের রক্ত, তাই বোধহয় বড় বেশি এক রোখা। আমেরিকান নেভিতে ছিল, বসেরা তার কাছ থেকে বোধহয় বিশেষ তোয়াজ পায়নি, তাই প্রমোশন দিতে চায়নি। এতে রেগে গিয়ে চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে ফ্লাইট-লেফটেন্যান্ট ওমর। এখন সিনেমায় স্টান্ট-ম্যানের কাজ করে। পরিচালকের নির্দেশে হাজার হাজার ফুট ওপর থেকে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দেয়, বিপজ্জনক গিরিপথে বিমান নিয়ে উড়ে যায় তীব্র গতিতে, এমনি সব কাজ। খুব কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই, কিন্তু এসবে আনন্দ পায়, রোমাঞ্চ অনুভব করে বেদুইনের ছেলে ওমর।

দুই গোয়েন্দার সঙ্গে ওমরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জনাব ক্রিস্টোফার। অভিযানে যেতে রাজি আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন পাইলটকে। সব শুনে লাফিয়ে উঠেছে ওমর, এক কথায় রাজি। এমন লোককে সঙ্গী পেয়ে কিশোর আর মুসাও খুব খুশি।

ওমর শরীফই বিমানের ব্যবস্থা করেছে। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে নিউ ইর্য়কে এসেছে তিন কিশোরকে নিয়ে। ওখানে প্যান-আমেরিকার এয়ার ওয়েজে একটা বিমান ভাড়া নিয়েছে ওরা। পুরানো আমলের সিকোরস্কি, কিন্তু ওমরের এটাই পছন্দ। যে রকম অভিযানে চলেছে ওরা, এই জিনিসই কাজ দেবে। চার সীটের একটা উভচর, টুইন-ইঞ্জিন, বেশ বড় লাগেজ কম্পার্টমেন্ট—অনেক মালপত্র রাখা গেছে। ঠিকই বলেছে ওমর, নতুন পাইলট-বন্ধুর ওপর ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে কিশোরের। এত পুরানো আমলের প্লেন নিচ্ছে দেখে প্রথমে একটু নাকই সিঁটকেছিল কিশোর, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ভুল। গত চার দিন ওদেরকে নিয়ে উড়ছে প্লেনটা, সামান্যতম গোলযোগ করেনি। এয়ার-ওয়েজ কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করেছিল কিশোর, যদি কোনরকম গোলমাল করে, কি হবে? তারা বলেছে, বিমান ঘটিত যে কোন রকম অসুবিধে দেখবে তারা, তাদের স্থানীয় অফিসে শুধু জানাতে হবে, ব্যস, এরপর যা করার ওখানকার লোকেরাই করবে। একটা কোলাপসিবল রবারের ভেলাও সরবরাহ করেছে এয়ার-ওয়েজ, ওমরের অনুরোধে। তার ধারণা, যেখানে যাচ্ছে, জিনিসটা কাজে লাগবে।

চারদিন ধরে উড়ে উড়ে ববও ক্লান্ত, বিরক্ত হয়ে পড়েছে, অথচ প্রথম দিকে তার আনন্দ-উত্তেজনার সীমা ছিল না, জীবনে এই প্রথম প্লেনে চড়ছে, লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে, যখনই কোন দ্বীপের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, রূপালী সৈকত দেখে হা-হুতাশ করে উঠছে মন, ইস্, এই মুহূর্তে যদি ওখানে হাত-পা ছড়িয়ে বসা যেত! নীল সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাপাদাপি করা যেত! ছোট্ট এই কুঠুরিতে গুটিয়ে বসে থাকতে কত আর ভাল লাগে?

মুসাও নির্বাক। এভাবে বসে থাকতে তারও আর ভাল লাগছে না। গন্তব্যস্থল আসে না কেন? এই আদিম উভচর না হয়ে, জেট হলে কত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারত। কেন যে···তার ভাবনা মাঝপথেই ছিন্ন করে দিয়ে নাক ঝুঁকে গেল

বিমানের। বকের মত গলা বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখল মুসা, পৌছে গেছে ওরা। শাদা রঙ করা এক ঝাঁক বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ববের দিকে তাকাল। চোখে চোখ পড়তেই হাসল মুসা।

'এসেছি?',জিজ্ঞেস করল বব।

'লাগছে তো ম্যারাবিনার মতই। যা শুনেছি, সে-রকমই লাগছে,' মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'এ-কেমন জায়গা!' নিচের দিকে চেয়ে বলল বব।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কিশোর, হেসে বলল, 'কেমন আর? পথে আরও কয়েক জায়গায় থেমেছি না, ওরকমই হবে। তবে বিষুবরেখার কাছে তো, গরম বেশি লাগবে। সভ্য-ভব্য জায়গা বলে মনে হচ্ছে না, কেমন যেন সেকেলে।'

পানি ছুঁলো উভচর। চাকার জায়গায় ছোট নৌকার মত দুটো জিনিস নীল পানি চিরে শাদা লম্বা দুটো দাগ সৃষ্টি করে ছুটল বন্দরের দিকে।

বিমান থামাল ওমর। ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিল কাচের ফোল্ডিং ককপিট। হাত তুলে দেখাল, 'ওই যে, প্যান-আমেরিকান নোঙর করার জায়গা বোধহয় ওটা।' পানির ধারে একটা হ্যাঙার, তাতে একটা ফ্লাইংবোট বেঁধে রাখা হয়েছে। 'নিউ ইয়র্কে ওরা বলেছিল, জরুরী অবস্থার জন্যে ডিপোতে বাড়তি বিমান রাখে। ওটার পাশেই রাখব।'

বসতে গিয়েও বসল না ওমর, ফুট ফুট আওয়াজ তুলে একটা মোটরবোট এগিয়ে আসছে এদিকেই। সরকারী ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার দাঁড়িয়ে আছে গলুইয়ের কাছে, পোশাকটা জমকালোই ছিল এককালে, কিন্তু এখন চাকচিক্য হারিয়ে মলিন হয়ে গেছে।

'আমাদেরকেই ইঙ্গিত করছে, না?' কিশোরও তাকিয়ে আছে বোটটার দিকে।

'তাই তো মনে হয়।...হ্যাঁ, আমাদের কাছেই আসছে। কাগজপত্র চেক করবে বোধহয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন?'

উভচরের পাশে থামল মোটরবোট, ঢেউয়ে দুলে উঠল বিমান। নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুলল সরকারী কর্মচারী, চামড়া ঈষৎ বাদামী, উদ্ধত ভাবভঙ্গি, কথার তুবড়ি ছোটাল উভচরের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে।

'নো কমপ্রেনডো,' ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ বলল ওমর।

'কি বলছে ব্যাটা?' কিশোর বলল। 'আমাদেরকে যেতে বলেছ না তো?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে নড়বড়ে জেটি দেখিয়ে, ইঙ্গিতে অফিসারের কাছে জানতে চাইল ওমর, ওদিকেই যেতে বলছে কিনা।

'সি, সি,' কর্কশ কণ্ঠে বলল অফিসার।

'হ্যাঁ,' কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'ওর সঙ্গেই যেতে বলছে। আশ্চর্য! কিন্তু বলছে যখন, যেতেই হবে। কথা না শুনলে বিপদে ফেলে দেবে।...এইই হয়।' বিড়বিড় করল সে। 'দেশ যত ছোট হয়, লোকগুলো ততই বড় বড় বুলি আউড়ায়—হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা। আরে ব্যাটা, শ্বেতাঙ্গর মত ভাব দেখালেই কি আর শেতাঙ্গ হয়ে গেলি? যত্তোসব।'

'শ্বেতাঙ্গ নয় ওরা?' নিচু কণ্ঠে বলল মুসা।

'চামড়া শাদা-ই,' অফিসারের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো ওমর, বসে পড়ল পাইলটের সীটে, ইঞ্জিন স্টার্ট দিল আবার। 'সেন্ট্রাল আমেরিকার শহরগুলোতে কোন আইন-কানুন নেই, জোর যার মুল্লুক তার। স্প্যানিশরা ঢুকিয়েছে এই বিষ। কলোনি করেছিল এখানে, তারপর একদিন শেষ হলো তাদের দিন। কেউ মরল, কেউ চলে গেল দেশে। যারা রয়ে গেল, মিশে যেতে লাগল তাদের গোলামদের সঙ্গে, বিশেষ করে নিগ্রো গোলাম। তারা আবার মিশতে শুরু করল স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে। ফলে এখন কোন্ রক্তটা যে আসল, বলা মুশকিল। এমন একটা মিশ্র জাতি দুর্নীতিবাজ হবে না-তো, কারা হবে?'

হাত তুলল কিশোর, 'ওই যে ডাকছে। চলুন।'

থ্রটল টানতেই আগে বাড়ল উভচর, বোটটাকে অনুসরণ করে চলল ওমর। জেটির লাউঞ্জে জটলা করছে কিছু দর্শক, আধডজন রাইফেলধারী পুলিশের পেছনে দাঁড়িয়ে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে এদিকে।

'অবস্থা সুবিধের না,' শুকনো কণ্ঠে বলল ওমর, সুইচ টিপে থামিয়ে দিল ইঞ্জিন। দ্রুত আরেকবার তাকাল সশস্ত্র লোকগুলোর দিকে।

জেটিতে নেমে পড়েছে মুসা আর বব, খুঁটির সঙ্গে উভচরকে বাঁধছে। সেদিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'কেন?'

'পুলিশের ভাবভঙ্গি ভাল ঠেকছে না। সাবধান হয়ে যাও, বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।' নাক কুঁচকে শুঁকছে সে, যেন সত্যি সত্যি গন্ধ আছে বাতাসে।

'এটা মরুভূমি নয়, জনাব,' হাসল কিশোর, 'যে...'

'...সে-জন্যেই তো আরও খারাপ লাগছে। পানি পছন্দ করি না আমি।'

'কাগজপত্র ঠিক আছে আমাদের, দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

'আছে। শয়তান লোক জীবনে অনেক দেখেছি, তাদের দেখলেই চিনতে পারি। ব্যাটারা ডাকাতের বংশধর, অপরাধ-প্রবণতা রক্তে মিশে আছে। ওদেরকে বিশ্বাস নেই...চলো, নামি।'

জেটিতে নামল কিশোর আর ওমর।

'এখানে একজন থাকলে হত না?' মুসা বলল। 'প্লেনটার পাহারায়। নিয়ে পালায় যদি?'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বব বলল।

'এতখানি সাহস দেখাবে, মনে হয় না,' বলল ওমর। 'আর চাইলেও থাকা যাচ্ছে না। আমাদের সবাইকে যেতে বলছে। হাত নাড়ছে কিভাবে দেখছ? হারামজাদা! বাপদাদা ছিল চোরের বাচ্চা, ব্যাটা অফিসারি ফলাচ্ছে।' দাঁতে দাঁত চাপল সে।

উষ্ণমণ্ডল। আগুন ঢালছে সূর্য। দরদর করে ঘামতে ঘামতে পুরানো, জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। অযত্নে নষ্ট হওয়া পথ পেরিয়ে একটা টিলার গোড়ায় চলে এল। টিলার গা বেয়ে উঠে গেছে পাথরের সিঁড়ি, মাথায় পাথরে তৈরি একটা পুরানো বাড়ি, বন্দরের দিকে মুখ করা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল অফিসার, পেছনে তাকিয়ে ইশারা করল অভিযাত্রীদের, ওঠার জন্যে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের?' বিড়বিড় করল মুসা। 'আল্লাহ রে! কি যে আছে কপালে…'

'জেলখানা না-তো?' আপনমনেই বলল কিশোর।

'মারছে রে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এই কিশোর, জেলখানা বলছ কেন?'

'সে-রকমই মনে হচ্ছে আমার, তাই।'

'আমারও মনে হচ্ছে,' ওমর সায় দিল। 'অনেক বন্দরেই কাস্টমস অফিসে জেলখানা না হোক, অন্তত হাজতখানা থাকে, আর এটা তো দেশই ডাকাতের।'

যেখানেই নিয়ে যাক, না গিয়ে উপায় নেই, তাই অফিসারের পিছু পিছু চলল ওরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও। মিনিট কয়েক পরেই স্প্যানিশ আমলে খোদাই করা চমৎকার দরজা পেরিয়ে সুন্দর একটা অফিসঘরে ঢুকল। দামী পুরানো ধাঁচের টেবিলের ওপাশে ভারি চেয়ারে বসে আছে ফেকাসে কালো একটা লোক, একটা জিন্দালাশ যেন, দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সশস্ত্র পুলিশ।

হাত তুলে সালাম জানাল ওমর, ভাঙা স্প্যানিশে শুভেচ্ছা জানাল, 'বিয়েনো দিয়াজ, সিনর।'

শীতল কণ্ঠে শুভেচ্ছা ফিরিয়ে দিল লোকটা, কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে কাগজপত্র চাইল। সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে একে একে দেখছে অভিযাত্রীদের । ওমর কাগজ দিতেই সেগুলো নিয়ে টেবিলে বিছাল, কোন তাড়াহুড়ো নেই। পাসপোর্টের একটা করে পাতা উল্টে দেখছে, এত ধীর, অসহ্য লাগছে কিশোরের। ওমরের দিকে চেয়ে দেখল, চোখ জ্বলছে তার।

'ইংরেজি জানেন?' রাগ চেপে খুব ভদ্রভাবে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল ওমর।

শুনলই না যেন লোকটা।

'মেজাজ ঠিক রাখাই কঠিন,' সঙ্গীদের দিকে চেয়ে নিচুকণ্ঠে বলল ওমর। 'এই ব্যাটা জ্বালাবে, বলে রাখলাম, দেখো।'

খুব ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে সময়। হাই তুলল মুসা। অস্বস্তি প্রকাশ করছে বব হাত-পা নেড়ে। কিশোর আর ওমর শান্ত রয়েছে। জানে, অস্থির ভাব দেখালে আরও বেশি দেরি করবে লোকটা, তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে।

অবশেষে মুখ তুলে তাকাল লোকটা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কিছু।

'কি বলল?' জানতে চাইল মুসা।

'পুরোপুরি বুঝিনি,' বলল ওমর, 'কাগজে গোলমাল আছে, এ-রকমই কিছু বলল,' ডেস্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে।

চলল দীর্ঘ কথা কাটাকাটি। ভাঙা স্প্যানিশে থেমে থেমে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে ওমর, আর অমনি মেশিনগান ছোটায় জিন্দালাশ। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ওমর। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, 'ব্যাটা বলছে, আরেকটা কি কাগজ না কি…ব্যাটার মাথা ছিল, আনতে ভুলে গেছি আমরা!'

'কি করতে বলছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জিজ্ঞেস করিনি। করছি,' আবার লোকটার দিকে ফিরল ওমর।

ওমরকে কিছু বলে, কড়া গলায় কি যেন আদেশ দিল লোকটা। মার্চ করে দরজার দিকে চলে গেল পুলিশ দু'জন।

সঙ্গীদের জানাল ওমর, 'বলছে সব ঠিক হয়ে যাবে, তবে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। এখন এই দু'জনের সঙ্গে যেতে হবে। এসো, যাই। কথা না শুনলে আরও খারাপ হবে।'

পুলিশদের পিছু পিছু আরও কিছু সিঁড়ি পেরিয়ে শাদা চুনকাম করা একটা ঘরে এসে ঢুকল, আসবাবপত্র বলতে নেই, গোটা চারেক কাঠের কাঠামো যেন শুধু দেয়াল ঘেঁষে ফেলে রাখা হয়েছে, ওগুলো তক্তপোষ না চৌপায়া, না চৌকি, যারা বানিয়েছে তারাই বলতে পারবে। চার অভিযাত্রীকে ঘরে রেখে বেরিয়ে গেল দুই পুলিশ, দরজায় তালা আটকানোর শব্দ শোনা গেল।

ভুরু কুঁচকে ওমরের দিকে তাকাল মুসা। 'কি ব্যাপার?'

'বুঝতে পারছি না!' আস্তে মাথা নাড়ল ওমর। 'কাগজপত্রে কোন গোলমাল নেই, আমি শিওর। তাহলে আটকাল কেন? নিশ্চয় ঘুষ খাওয়ার জন্যে। চেয়ে ফেললেই পারে। যত তাড়াতাড়ি চায়, ততই আমাদের জন্যে মঙ্গল।'

'ঘুষ!' হাতের আঙুল মুঠো হয়ে গেছে মুসার।

'এটা বাড়তি ইনকাম এখানকার লোকের,' কিশোর বলল। 'কিছু করার নেই, চাইলে দিতে হবে, নইলে ছাড়বে না।'

'হারামির বাচ্চারা!' দাঁত দিয়ে জোরে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সহকারী গোয়েন্দা। 'মড়া হারামিটার নাক ভেঙে দিতে পারতাম।'

বিষণ্ণ হাসি হাসল ওমর। 'আইন-কানুন ছাড়া, এসব ছোট ছোট রাজ্যের এই-ই রীতি। দুনিয়ায় এমন জায়গা আরও অনেক আছে। ঘুষ চাইলে দিয়ে দেয়া ভাল, নইলে গোলমাল পাকিয়ে এমন অবস্থা করে ফেলবে, শেষে কয়েক গুণ খরচ করেও পার পাওয়া মুশকিল। ওরা সব পারে। এই যে, হাজতে এনে ভরে রাখল, কি করতে পারলাম?'

চুপ করে গেল মুসা। কিশোর চুপচাপ। বব মনমরা, সব দোষ যেন তারই, এমনি ভাব।

ঘরটা যেন একটা চুলো। একটি মাত্র জানালা, সাগরের দিকে, তাতে লোহার মোটা গরাদ। জানালায় দাঁড়ালে বন্দরের অনেকখানি চোখে পড়ে, উভচরটাকে দেখা যায় পরিষ্কার, এই বড় জোর পোয়াটাক মাইল দূরে হবে।

দীর্ঘ সময় যেন আর কাটতে চায় না। এক যুগ পর যেন এক ঘণ্টা পেরোল, আরেক ঘণ্টা, আরও এক ঘণ্টা। বনে ঢাকা পাহাড়ের ওপারে অস্ত যেতে শুরু করল লাল টকটকে সূর্য। নতুন বিপদ দেখা দিল, মশা। বিশাল একেক ঝাঁক। জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকছে যেন মশার মেঘ। বিচিত্র গান গেয়ে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল মাথার ওপর। যেন বলছে, 'কি মিয়ারা, আছ কেমন? দাঁড়াও, আলোটা খালি যাক, তারপর শুরু করব। এক ফোঁটা রক্ত রাখব না কারও শরীরে।'

শুয়ে ছিল মুসা, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'আর না!' চেঁচিয়ে উঠল, 'আর

সহ্য করব না! যে কেউ বলবে, আমরা চোরছ্যাচোর নই, ভদ্রলোক! এই, এসো তোমরা, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করি!'

'হ্যাঁ, কিছু একটা করা দরকার,' ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল ওমর, জানালার দিকে এগোল। বন্দরের দিকে চেয়েই চমকে উঠল। 'আরে, হচ্ছেটা, কি!'

ছুটে এসে ওমরের আশেপাশে দাঁড়াল সবাই। উড়চরটাকে ছেঁকে ধরেছে যেন পুলিশ। ঢুকছে, বেরোচ্ছে। বড় একটা প্যাকেট নিয়ে বেরোল এক পুলিশ। হাত নেড়ে কি সব বলছে।

'কাস্টমসের লোক,' বলল ওমর, 'জিনিসপত্র চেক করছে বোধহয়। আমরা নেই, অথচ আমাদের জিনিস চেক করছে। শয়তানের দল! আর চুপ করে থাকব না।'

গটমট করে দরজার দিকে এগোল ওমর, কিন্তু সে হাত দেয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। সেই দুই সরকারী কর্মচারী—একজন যে তাদেরকে আনতে গিয়েছিল বোট নিয়ে, আরেকজন সেই জিন্দালাশটা। পেছনে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে ছয়জন পুলিশ।

'এসবের মানে কি?' কড়া গলায় জানতে চাইল ওমর।

জবাব পাওয়া গেল না। ঘরে ঢুকল দুই অফিসার। মুসা ভয়ানক রেগে গেছে দেখে, তার বাহুতে হাত রাখল একজন। ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল মুসা।

'ওরকম করো না!' তাড়াতাড়ি বলল ওমর। 'লাভ হবে না, আরও খারাপ হবে। শান্ত থাকো।'

ওমরের সামনে এসে দাঁড়াল জিন্দালাশ। কথার মেশিনগান ছোটাল কয়েক মুহূর্ত, তারপর যেমন শুরু করেছিল, তেমনি হঠাৎ করে থেমে গেল।

'কি বলল হারামজাদা!' রাগ দমন করতে পারছে না মুসা।

'চোর।'

'চোর!'

'একটা আমেরিকান প্লেন নাকি চুরি গেছে। আমাদের গতিবিধি সন্দেহজনক! তাই সার্চ করবে।'

'দোজখে জ্বলবে!' হাতের মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে মুসা। এত বড় মিথ্যা! বললেন না, প্যান-আমেরিকানের অফিসে দেখা করতে?'

'বলেছি।'

'কি বলল?'

'ডিপার্টমেন্টাল বস্ ছুটিতে, ম্যালেরিয়া হয়েছে, তাই পাহাড়ের ধারে কোথায় নাকি হাওয়া বদলাতে গেছে। অফিসের অন্য কেউ কিছু বলতে পারল না।'

ঢোক গিলল মুসা। কথা হারিয়েছে।

'হুঁ!' আস্তে করে বলল কিশোর, 'আরেকটা মিথ্যে। ষড়যন্ত্র।'

'বোঝাই যাচ্ছে,' মাথা দোলাল ওমর, 'কিন্তু করার কিছু দেখছি না। সার্চ করতে চাইছে, মানা করতে পারব না। তাহলে সুযোগ পেয়ে যাবে। ওরা খালি ছুঁতো খুঁজছে এখন। জেলে নিয়ে গিয়ে একবার ভরে দিলে, ক'মাস আটকে থাকব কে

জানে।'

'বাহ্, চমৎকার জায়গা খুঁজে বের করেছি,' মুখ বাঁকাল মুসা, 'ঘাঁটি করার জন্যে।'

'ওসব বলে আর লাভ নেই এখন,' বলল কিশোর, 'ওরা যা করতে চায় করুক। বাধা দিতে গেল উল্টো ফল হবে। সার্চ করে পাবে না কিছু। লুট করে নেয়ার মত নগদ টাকাও নেই সঙ্গে, লেটার অভ ক্রেডিট আর ট্রাভেলারস চেক নিয়ে ভাঙাতে পারবে না।'

সার্চ করতে জানে লোকগুলো। অভিযাত্রীদের পকেটে যা যা ছিল সব বের করে নিল, এমনকি ববের বাবার চিঠি, ম্যাপ আর ডাবলুনটাও। সব একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে বেরিয়ে গেল, বাইরে থেকে আবার তালা আটকে দিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ বলল মুসা, 'হারামির বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করলেন না, আমাদের প্লেনে কি করছিল?'

'লাভ কি?' শান্তকণ্ঠে বলল ওমর। 'বড় বেশি রেগে গেছ তুমি, মুসা, মাথা ঠাণ্ডা করো। এমন অবস্থায় উত্তেজিত হয়ে পড়লে বিপদ আরও বাড়বে। ভেব না, এত সহজেই ছেড়ে দেব ব্যাটাদের। আমি বেদুইনের বাচ্চা, এখনও সময় হয়নি কিছু করার।'

'কিন্তু মোহর আর ম্যাপটাও তো নিয়ে গেল!' উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে বব।

'গেছে, গেছে, কি আর করা?' হাত নাড়ল ওমর।

'বাধা দিলেন না?'

'কি হত? রেখে যেত? সন্দেহ আরও বাড়ত ওদের।'

এমনিতে কি সন্দেহ হবে না?'

'কোন কারণ দেখি না। মোহরটা একটা সাধারণ সুভনির। আর ম্যাপ থাকতেই পারে বিমানে, পাইলটের দরকার পড়ে। আমার ম্যাপই তোমার কাছে ছিল, বলতে অসুবিধে কি?'

'কিন্তু ম্যাপটা একটু অন্য ধরনের, এটা বোঝার বুদ্ধি নিশ্চয় ওদের আছে। মোহর আর ম্যাপ মিলিয়ে যদি গুপ্তধন ভেবে বসে?'

জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে চুপচাপ ভাবছে কিশোর, হঠাৎ ডাকল, 'এই, এই দেখে যাও! জলদি!'

'কী?' দুই লাফে কিশোরের পাশে চলে এল মুসা।

'এখন বুঝতে পারছি সব!' কেমন যেন খুশি খুশি শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। 'দেখো, সরকারী লোকের সঙ্গে কে যাচ্ছে। ওই গরিলা-মুখটাকে চিনতে পারছ?'

'খাইছে! হ্যামার!'

হাসল কিশোর। 'বুঝতে পারছ তো এখন, কেন কি ঘটছে? দিনের আলোর মত পরিষ্কার।'

'ব্যাটা তো একটা আস্ত গরিলা,' বলল ওমর। 'কিন্তু এখানে কি করছে?'

'এখান পর্যন্ত ধাওয়া করবে, ভাবিনি,' প্যান্টের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। 'একবারও যদি মনে পড়ত, অন্য ব্যবস্থা করতাম...'

'কিন্তু ও জানল কি করে, আমরা এখানে আসছি?'

'মুসা, বব,' বলল কিশোর, 'মনে পড়ে, রাতে আমরা যখন আলোচনা করছিলাম, ম্যাপ দেখছিলাম, দরজার কাছে পায়ের ছাপ ফেলেছিল কেউ? পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল ম্যাট? সন্দেহ করেছিলাম না, হ্যামার? ঠিকই তাই। আস্ত একটা গাধা আমি, আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সে-রাতের পর লস অ্যাঞ্জেলেসে আর হ্যামারের চেহারা দেখিনি, কেন সন্দেহ করলাম না কিছু? আসলে, ধরেই নিয়েছিলাম, সে মাথামোটা এক খুনে, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ভাবিনি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের আলোচনা শুনে জেনে নিয়েছে আমরা কোথায় আসছি। আগেই এসে বসে আছে এখানে। ভজিয়ে রেখেছে সরকারী দোস্তদের। সে নাবিক, এর আগেও এখানে তার আসাটা বিচিত্র কিছু নয়, হয়তো তখন থেকেই জানা শোনা। নাহ্, সব কিছু ওলট-পালট করে দিল মিস্টার গরিলা।'

'কিন্তু আমার ম্যাপ আর মোহরের কি হবে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বব। 'চিঠিটাও তো নিয়ে গেছে।'

'মোহরটা আর ক'ডলার? নিয়েছে নিক। চিঠি আর ম্যাপ নিয়ে কচুটাও করতে পারবে না।'

'মানে?'

'খামটাই শুধু আসল, ভেতরের চিঠি আমার লেখা, যা মনে এসেছে তাই লিখেছি। আসল চিঠিটা মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের কাছে, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেবেন তিনি। চিঠিটার ওপর হ্যামারের চোখ পড়েছিল, তাই সাবধান হয়েছি।'

'কিন্তু ম্যাপ?'

'হ্যাঁ, ওটা দিয়ে অনেক কাজ করতে পারবে হ্যামার,' মুচকি হাসল কিশোর। 'চুলো থেকে আগুন নিয়ে সিগারেট ধরাতে পারবে···'

'কি বলছ?'

'বললাম না, খামটাই শুধু আসল। ভুল ম্যাপ, ম্যাপ না থাকার চেয়েও খারাপ। নতুন করে চিঠি লিখতে পেরেছি, আর একটা ম্যাপ আঁকতে পারব না? নিজেকে খুব চালাক ভেবেছে হ্যামার, খুশিতে নিশ্চয় লাফাচ্ছে এখন। লাফাক যত খুশি।'

হাহ্ হাহ্ করে হাসল ওমর। 'নাহ্, তুমি একখান জিনিস, কিশোর পাশা। এখন বুঝতে পারছি, ডেভিস ক্রিস্টোফারের মত লোকও তোমাকে এতটা পাত্তা দেয় কেন!'

লজ্জা পেল কিশোর। চুপ করে রইল।

'তাহলে?' মুসা বলল। 'এখন কি করছি আমরা? বুঝলামই তো, ঘুষের জন্যে আটকায়নি।'

'চুপ করে থাকব,' বলল কিশোর। 'দেখি না, কি করে?'

'কী! এখানে? সারারাত?'

'ওরা রাখলে থাকতেই হবে,' শান্ত কিশোরের কণ্ঠ। প্রায়ই অবাক হয় মুসা, সাংঘাতিক বিপদের সময়েও উত্তেজিত হয় না গোয়েন্দাপ্রধান, এত শান্ত রাখে কি

করে নিজেকে? 'হ্যামারের যা দরকার, পেয়েছে, ওগুলো নিয়ে ও এখান থেকে চলে গেলেই হয়তো আমাদের ছেড়ে দেয়া হবে।'

সূর্য অস্ত গেছে। সবুজ জঙ্গলের ওপর আকাশের গাঢ় নীলিমা বেগুনী হতে শুরু করেছে, মাঝে মাঝে লাল ছোপ, শিগগিরই কালো হয়ে যাবে সব রঙ।

রাত নামল, হঠাৎ করেই বড় বেশি নীরব হয়ে গেল চারদিক, উষ্ণমণ্ডলের গভীর নীরবতা। অভিযাত্রীদের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মশার পাল। খিদেয় পেট জ্বলছে, গরম, তার ওপর এই মশার মাঝে কি করে যে রাতটা কাটবে, কে জানে।

সাত

জানালা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল ভোরের নরম আলো। শব্দটা কানে যেতেই তড়াক করে উঠে বসল ওমর। 'আরে! কি ব্যাপার!' তার চিৎকারে অন্যদেরও ঘুম ভেঙে গেল।

স্তব্ধ বাতাসে কাঁপন তুলেছে বিমানের ইঞ্জিন।

'প্যান-আমেরিকানের বিমানটা,' হাই তুলতে তুলতে বলল মুসা, 'চলে যাচ্ছে হয়তো।'

লাফ দিয়ে উঠে জানালার কাছে ছুটে গেল ওমর। 'আমাদেরটা!'

অন্যেরাও ছুটে এল জানালার কাছে। পোতাশ্রয়ের মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সিকোরস্কি।

'কি করছে?' বিড়বিড় করল।

'প্যান-আমেরিকানের কেউ সরিয়ে নিচ্ছে,' বলল মুসা। 'জাহাজটাহাজ ঢুকবে হয়তো, জায়গা করে দিচ্ছে।'

'আমার মনে হয় না,' মাথা নাড়ল ওমর। 'জাহাজ ঢোকার অনেক জায়গা আছে। দেখছ না, খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে?' ঝাপটা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, এগোল দরজার দিকে।

এই সময় খুলে গেল পাল্লা, একজন পুলিশের হাতে খাবারের ট্রে। তাতে একটা জগ, কয়েকটা কাপ-পিরিচ, একটা পাঁউরুটি আর কিছু ফল। পেছনে রয়েছে আরও দু'জন।

সামনের লোকটার পাশ কাটিয়ে অন্য দু'জনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছুটে গেল ওমর। একেক লাফে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে এল পথে, এক ছুটে পথ পেরিয়ে একেবারে পানির ধারে। বিমানটা তখন অনেক দূরে, পোতাশ্রয়ে ঢোকার মুখের বাইরে। থমকে দাঁড়াল সে, বোবা হয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সেদিকে। তার পেছনে এসে দাঁড়াল কিশোর, মুসা আর বব।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে ঘুরে তাকাল ওমর প্যান-আমেরিকান হ্যাঙারের দিকে, শাদা পোশাক পরা কয়েকজন লোক চেয়ে রয়েছে উভচরটার দিকে। তাদের দিকে দৌড়ে গেল সে।

'প্লেনটা কে নিল, জানেন?' হাত তুলে উভচরটাকে দেখিয়ে বলল ওমর।

'নিশ্চয়ই,' বলল হাসিমুখ এক তরুণ, প্যান-আমেরিকানের এক মেকানিক—বুকের কাছে এমব্রয়ডারি করা প্রতীক চিহ্ন আর লেখা দেখেই সেটা বোঝা গেল। 'আপনারা এনেছিলেন, না?'

'হ্যাঁ!'

'ওকে তাই বলছিলাম,' পাশের সহকর্মীকে দেখিয়ে বলল তরুণ। 'গতকাল নামতে দেখেছি আপনাদের, তীরে উঠতে দেখেছি। এখানে তেল ভরে খাঁড়ির বারের ডিপো থেকে নিলেন কেন?'

ভুরু কুঁচকে গেল ওমরের। 'খাঁড়ির ধারে! তেল নিতে! কখন গেলাম?'

'কাল রাতে। কয়েকজন লোক গিয়ে ওখানকার ডিপো থেকে তেল আনল, ওই বিমানটার কথা বলে।'

নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল ওমরের। 'আমাদের সব কাগজপত্র নিয়ে গেছে পুলিশ, চোর সন্দেহে আটকে রেখেছে সারারাত,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে। 'তার মানে প্লেনটা জালিয়াতি করে নিয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে।'

'অ্যাঁ!' আস্তে মাথা ঝোঁকাল তরুণ মেকানিক। 'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। ফাঁদে ফেলেছিল আপনাদের।'

শব্দ করে হাসল তার সহকর্মী, কিন্তু হাসিতে প্রাণ নেই। 'ওই খট্টাসগুলো! ওরা না পারে কি!···চিপিতে ফেলেছে বুঝি?'

'ভালমতই,' বলল ওমর। 'জিনিসপত্র লুটপাট করবে, এটা ধরেই রেখেছিলাম, কিন্তু বিমান নিয়ে ভাগবে···। কারা নিল?'

'হ্যামারকে দেখলাম, গরিলাটা···'

'কিন্তু সে-তো প্লেন চালাতে জানে না···'

'তার দোস্ত নাকি জানে। গত হপ্তায় এসেছিল হ্যামার, সিডনি নামে একজনকে সঙ্গে নিয়ে। একটা প্লেন চাইছিল।'

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল ওমর। 'আর কি কি করেছে?'

'শহরে কি করেছে না করেছে, জানি না। তবে আমার বসকে বলছিল, তাদের একটা প্লেন দরকার, খুব জরুরী। ভাড়া বাকি রাখতে চেয়েছে, বস্ রাজি হয়নি।···শহরে অবশ্য বার দুই অ্যালেন কিনির সঙ্গে দেখেছি ওকে।'

'কিনি?'

'পুলিশের চীফ। এটা সরকারী টাইটেল। আসলে ও এখানকার গ্যাঙ লীডার, ডাকাতদের চীফ।'

'মড়াটা না-তো?'

'ভাল নাম দিয়েছেন। হ্যাঁ, মড়াটাই। ওর কাছ থেকে দূরে থাকবেন, সাহেব, বিপদে পড়বেন নইলে, বলে দিলাম। খুব খারাপ লোক।'

'সেটা বুঝেছি,' মাথা কাত করল ওমর। 'আমাদের প্লেনে ক'জন ঢুকেছে, দেখেছেন?'

'না, আমি দেখিনি,' মাথা নাড়ল তরুণ। সহকর্মীর দিকে চাইল, সে-ও মাথা নাড়ল।

'আমি দেখেছি,' এগিয়ে এল আরেক মেকানিক। 'চারজন। হ্যামার, তার মাতাল দোস্ত সিডনি, ইমেট চাব, আর ম্যাবরি।'

'ইমেট চাব!' ঠোঁট ছড়াল ওমর। ম্যাবরি! এ-কেমন নাম?'

'যেমন নামের বাহার, তেমনি লোক; হারামির একশেষ। ইমেট চাব এসেছে নিউ ইয়র্ক থেকে—পুলিশ খুন করে পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে। এখানে এসে শাস্তি তো দূরে থাক, উলটো পুলিশের সহযোগিতা পাচ্ছে, আছে রাজার হালে। পানির ধারে একটা হোটেল চালায় যতরকম বেআইনী ব্যবসা করে। সঙ্গে পিস্তল রাখে সব সময়। ওর সামনে দাঁড়াতে চাইলে মেশিনগান নিয়ে যেতে হবে আপনাকে।'

'আর ম্যাবরি?'

'ম্যাবরি ভেনাবল। নিগ্রো, ওর মত শয়তান লোক খুব কমই আছে। অ্যালেন কিনির পোষা কসাই, যত রকম কুকাজ আছে, সব করে। দুই পকেটে দুটো ক্ষুর থাকে সব সময়। আমার এক দোস্ত ব্যক্তিগতভাবে চেনে ম্যাবরিকে, সে বলেছে, ক্ষুর দিয়ে মানুষ জবাই করে নাকি দারুণ আনন্দ পায় নিগ্রোটা। এখানে সব্বাই ভয় করে ম্যাবরিকে। ও আপনার বিমানে উঠেছে, তার মানে এসবের পেছনে অ্যালেন কিনির হাত রয়েছে।'

'চমৎকার একটা গ্রুপ,' কঠিন শোনাল ওমরের কণ্ঠ।

'এর চেয়ে চমৎকার আর এদিকে টর্চ নিয়ে খুঁজলেও পাবেন না,' নাক কুঁচকাল মেকানিক।

দ্রুত ভাবছে ওমর। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, টিলা বেয়ে নেমে আসছে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ। 'আপনার বস্ কোথায়?' মেকানিককে জিজ্ঞেস করল সে।

'ওই তো, আসছে,' ওমরের পেছনে দেখিয়ে বলল মেকানিক। 'এখানকার অফিস-সুপার, নাম হোস বার্গ। বোঝাতে পারলে তার কাছে সাহায্য পাবেন।'

ঘুরে দাঁড়াল ওমর। হাসিখুশি একজন লোক এগিয়ে আসছে, চওড়া কাঁধ, গায়ে ধবধবে শাদা হাওয়াইয়ান শার্ট, পরনে শাদা প্যান্ট, পেশীবহুল শরীর। কাছে এসে দাঁড়াল সুপারিনটেনডেন্ট।

'গুড মর্নিং,' হাত বাড়িয়ে দিল ওমর। 'এই মাত্র আমার প্লেন চুরি গেল।'

'তাই নাকি?' হাসল হোস বার্গ। 'এইমাত্র দেখলাম গেল। আপনাকে এখানে দেখে ভাবছিলাম, ব্যাপার কি। বুঝলাম এখন।'

'পালিয়ে যাবে কোথায়?···আপনার এখানে ওয়্যারলেস আছে?'

'আছে।'

'গুড,' এগিয়ে আসা পুলিশদের দিকে চেয়ে দ্রুত বলল ওমর, 'আসছে! শুনুন, আমার নাম ওমর শরীফ। নিউ ইয়র্কে আপনাদের হেড অফিসে চেক করতে পারেন ইচ্ছে করলে। যে বিমানটা নিয়ে গেল, আপনাদেরই, নিশ্চয় জানেন। গত হপ্তায় ভাড়া নিয়েছিলাম। আরেকটা প্লেন এখন দরকার আমাদের। ওই প্লেনটা দেখা যায়? ভাড়া? বিক্রিও করতে পারেন।'

ওমরের চোখে চোখে তাকাল বার্গ। 'এটা কি করে দিই,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'একটাই আছে, রিজার্ভ রেখেছি, জরুরী কাজের জন্যে।'

'আমার কাজটাও খুব জরুরী। কাছাকাছি আরেকটা বেস কোথায় আপনাদের?'

'ম্যারাকিবো।'

'তারমানে খবর পাঠালে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আরেকটা প্লেন আনিয়ে নিতে পারবেন। এটা দিয়ে দিন আমাকে।'

'নিউ ইয়র্ক যদি বলে।'

'তাহলে এখুনি যান, প্লীজ, খবর নিন। আমার কাগজপত্র সব কিনির কাছে, আনতে যাচ্ছি। যদি প্লেনটা আমাকে দেন, তো পেট্রোল ট্যাংক ভরে দেবেন। খুব তাড়াতাড়ি।'

'দেখি, কি করা যায়।'

'আর, চব্বিশ ঘণ্টা খাইনি, কিছু খাবার যদি...'

হাত তুলল সুপারিনটেনডেন্ট, 'ওসব হবে। যান, এসে পড়েছে। সাবধানে থাকবেন!'

'থ্যাংকস,' বলে ঘুরল ওমর। এসে গেছে পুলিশেরা। তাদের সঙ্গে সেই অফিসার, যে মোটরবোটে করে এসেছিল নিতে।

সঙ্গে যেতে ইশারা করল লোকটা। দ্বিতীয়বার বলার আর দরকার হলো না, পা বাড়াল ওমর, কঠিন হয়ে উঠেছে চোয়াল। তার সঙ্গে তিন কিশোর।

অভিযাত্রীদেরকে আবার নিয়ে আসা হলো অ্যালেন কিনির অফিসে। মুখ তুলে তাকাল লোকটা।

'শোনো,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ওমর, রাগে স্প্যানিশ বলতে ভুলে গেছে, ইংরেজি বলছে, 'অনেক জ্বালিয়েছ, অনেক সয়েছি, আর না! কি মনে করেছ? এদেশে আমি একা? বন্ধুবান্ধব আমারও আছে এখানে, তারা ইতিমধ্যেই ওয়্যারলেস করে দিয়েছে নিউ ইয়র্কে, প্যান-আমেরিকান হেড অফিসে। ওখানকার পুলিশের কানেও যাবে কথাটা। সবার সঙ্গেই শয়তানী? জিনিসপত্রগুলো কোথায়, জলদি বের করো।'

ইংরেজি বুঝল কিনা কিনি, বোঝা গেল না, হয়তো ওমরের ভাবভঙ্গিতেই অনুমান করে নিয়েছে, হাত তুলে দেখিয়ে দিল টেবিলের এক ধারে জড়ো করে রাখা জিনিস, যা যা বের করে এনেছে চারজনের পকেট থেকে, সব। নাটকীয় ভঙ্গিতে কঙ্কালসার হাত নেড়ে শান্ত কণ্ঠে কিছু বলল স্প্যানিশে।

'কি বলল শয়তানের বাচ্চা?' জানতে চাইল মুসা।

'যা বলবে ভেবেছি—মাফ চাইছে। আমাদের দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে লজ্জিত। হারামজাদা!'

'প্লেনটা চুরি করল কেন জিজ্ঞেস করেছেন?'

'কি লাভ? বললে কি ফেরত আনবে? কি হয়েছে ভালমতই জানে সে, আমরা জানি এটাও জানে, ওকে বলে কি হবে? চলো, বেরিয়ে যাই। হোস বার্গ বিমানটা দিলে চলে যেতে পারব। ম্যারাবিনাকে আর ঘাঁটি বানানো যাবে না। তাতে কি?

দরকার পড়লে বারমুডায় চলে যাব, যত দূরেই হোক।'

কথা বলতে বলতেই টেবিল থেকে জিনিসগুলো তুলে নিয়ে যার যার হাতে দিল ওমর। 'কারও কিছু বাদ পড়েছে?'

'আমার মোহর,' বব বলল। 'মড়াটা রেখে দিয়েছে।'

'সোনার টুকরো হাতে পেয়েছে, লোভ সামলাতে পারবে ওর মত লোক?' বলল ওমর। 'ম্যাপ, চিঠি আর মোহর বাদে সবই পেয়েছি।...দাঁড়াও,' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে দেখল সে, 'না, নেই। খুচরো টাকা বাদে যা ছিল, সব রেখে দিয়েছে। তোমাদের?'

'আপনারটা নিয়েছে, আমাদেরগুলো কি আর রাখবে?' বলল কিশোর। 'দেখার দরকার নেই, চলুন, জলদি বেরোই। যা পেয়েছি, এতেই চলবে। ছেড়ে যে দিচ্ছে, এই বেশি।'

রওনা হওয়ার জন্যে ঘুরল ওমর, তার বাহু চেপে ধরে ফেরাল বব। 'ওই যে, মোহরটা! ওই যে, মোহরটা! ওই যে, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের তলায়।'

দেখতে পেল ওমর। ওরা আসার আগে বোধহয় মোহরটা পরীক্ষা করেছিল কিনি, সাড়া পেয়েই তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলেছে গ্লাসের তলায়। মনে করেছে, দেখতে পাবে না কেউ।

ধৈর্য হারাল ওমর, চোরটাকে এত সহজে ছেড়ে দেবে না। কিছুটা শিক্ষা অন্তত দেয়া দরকার। হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে গেল মোহর, বাধা দিলেই কষে চড় লাগিয়ে দেবে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিনি। সাপের মত ছোবল হানল যেন তার হাত, ওমরের আগেই তুলে নিল মোহরটা।

'চোরের বাচ্চা চোর!' গাল দিয়ে উঠল ওমর। মুঠো হয়ে গেছে হাত, টেবিলের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে কিনিকে ধরার ইচ্ছে।

ওমরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল কিশোর, চেঁচিয়ে উঠল, 'না না! সরে যান!'

থমকে গেল ওমর, কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে চেয়ে দেখল, রাইফেল তুলেছে এক পুলিশ।

চোখের পলকে সরে গেল ওমর। বদ্ধ ঘরে রাইফেলের আওয়াজই কামানের শব্দের মত মনে হলো।

করডাইটের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। প্রচণ্ড শব্দের রেশ মিলিয়ে যেতেই বড় বেশি নীরব মনে হলো, শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ। কিন্তু এসব খেয়াল করছে না ঘরের কেউ, বোবা হয়ে চেয়ে আছে কিনির দিকে।

স্থির হয়ে আছে কিনি, মোহর ধরা মুঠোবদ্ধ হাত দিয়ে বুক চেপে ধরেছে, শার্টের ওখানটায় রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পুরো দুই সেকেণ্ড একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর ধুড়ুম করে পড়ল টেবিলের ওপর, কেঁপে উঠল ঘর। হাত থেকে ছুটে গেছে মোহরটা। সোনালি একটা ধনুক সৃষ্টি করে উড়ে যাচ্ছিল, মাঝ পথেই ধরে ফেলেছে ওমর। পরক্ষণেই দৌড় দিল দরজার দিকে। 'জলদি এসো!

আমাদের দোষ দেবে ওরা।'

বেরিয়ে গেল ওমর। তার পেছনে মুসা, তাকে আটকানোর চেষ্টা করল সেই অফিসার। কিন্তু ব্যায়ামবীরের বেমক্কা এক ঘুসি পেটে লাগতেই উঁক করে বাঁকা হয়ে গেল সামনের দিকে। পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে একজন পুলিশের গায়ে ফেলেই বেরিয়ে এল মুসা। তার ঠিক পেছনেই কিশোর আর বব।

সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নামছে ওমর, চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি নামো, পেছনে তাকাবে না!'

যেন উড়ে নেমে এল চারজনে, পথে নেমেই দৌড় দিল হ্যাঙারের দিকে। কড়া রোদ, ভয়ানক গরম। রাস্তায় লোকজন তেমন নেই, এক-আধজন ভবঘুরে আছে, তারা পথরোধ করার চেষ্টা করল, কিন্তু থামাতে কি আর পারে? ওমর আর মুসার ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে পড়ল পথের ওপর।

পেছনে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে পুলিশের, কিন্তু দেখার জন্যে একবারও পেছনে ফিরল না অভিযাত্রীরা।

'দেখো!' সামনের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল ওমর।

দেখল ওরা। রোদে চকচকে একটা চক্র তৈরি করে ঘুরতে শুরু করেছে ফ্লাইং-বোটের প্রপেলার, ওদেরকে আসতে দেখেই যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। ইঞ্জিন চেক করছে নাকি?

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছল ওরা। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে সুপারিনটেন্ডেন্টের। 'কী!'

'কিনি গুলি খেয়েছে!' জোরে জোরে দম নিচ্ছে ওমর।

'মরেছে! বড় বেশি বেড়ে গিয়েছিল, আপনি না মারলে আমিই একদিন মেরে বসতাম...'

'...আমি মারিনি! প্লেন রেডি?'

'হ্যাঁ! হেড অফিস বলল, হাজার দশেক দিলেই কিনে নিতে পারেন। কিংবা দৈনিক আড়াইশো ডলার, ভাড়া। পাঁচ হাজার ডিপোজিট রাখতে হবে তাহলে।'

বার্গের কথা শেষ হওয়ার আগেই চেকবুক আর কলম বের করে ফেলল কিশোর, দ্রুত লিখে চলল, এত দ্রুত জীবনে আর লেখেনি। ফড়াত করে এক টানে একটা পাতা ছিঁড়ে গুঁজে দিল সুপারের হাতে।

চেকটা এক নজর দেখেই বলল বার্গ, 'ও, কে! যান!'

বার্গ কথা শেষ করার আগেই দৌড় দিল ওমর, তার পেছনে মুসা আর বব। সবার পেছনে কিশোর।

একে একে উঠে পড়ল তিন কিশোর।

ককপিট থেকে নামল চীফ মেকানিক। তাকে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'কত মাইল চলবে তেলে?'

'এক হাজার...'

আর শোনার দরকার মনে করল না ওমর, উঠে পড়ল ককপিটে। সে সীটে বসতে না বসতেই গুলির শব্দ হলো, বিমানের গা ভেদ করে তার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে

গেল একটা বুলেট। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল সে, মুখে ফুটেছে অদ্ভুত হাসি। থ্রটল টানল, গর্জন বেড়ে গেল ইঞ্জিনের। নির্দেশ পেয়ে নাক ঘুরে গেল বিমানের, পানি কেটে দু'ভাগ করে শাদা ফেনা তুলে ছুটল।

ঝটকা দিয়ে স্টিকটা সামনে ঠেলে দিল ওমর। তীক্ষ্ণ 'হ-ট্-টা-ক' আওয়াজ তুলে পানির আকর্ষণ কাটাল বিমানের নৌকার মত তলা, শূন্যে উঠে পড়ল।

'হউফ্!' করে চেপে রাখা শ্বাসটা ছাড়ল ওমর, হেলান দিল সীটে। 'বাঁচলাম!'

'এখানে আসাটাই ভুল হয়ে গেছে,' বলল পাশে বসা কিশোর।

'যাকগে, যা হওয়ার হয়েছে। শিক্ষা তো হলো!'

আট

নতুন বিমানটা শুধু পানিতে নামতে পারে, আণ্ডারক্যারেজ লাগানো নেই, ডাঙায় নামতে পারবে না উভচরটার মত। ওটার চেয়ে বড়ও, আট সীট। ভাড়াটে যাত্রী বহনের জন্যে তৈরি হয়েছে, ফলে ককপিট আর যাত্রীদের কেবিন আলাদা করে ফেলা হয়েছে মাঝখানে হালকা দেয়াল দিয়ে। ছোট একটা দরজা আছে, পাল্লার ওপর দিকে কাচ লাগানো, ওখান দিয়ে ককপিট দেখা যায়, ইচ্ছে করলে দরজা খুলে যাত্রীরা যোগাযোগ করতে পারে পাইলটের সঙ্গে। খুব পুরানো ডিজাইন, এমনিতে এই জিনিস কিছুতেই নিত না ওমর। কিন্তু এখন এটাই যে পেয়েছে, ভাগ্য নেহায়েত ভাল বলতে হবে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

দ্বীপটা কোথায় হতে পারে, আন্দাজ করে কোর্স ঠিক করল ওমর, প্লেনের নাক ঘোরাল সেদিকে। কিশোরের দিকে ফিরল। 'হাল ধরতে পারবে?'

মাথা কাত করল কিশোর। 'দেখিয়ে দিলে পারব।'

'পারবে। সহজ। উভচরটা দেখা যায় কিনা, চোখ রেখো। হ্যামার খুব ভালমতই চেনে দ্বীপটা, উভচরটাকে কোন দ্বীপের কাছে দেখলে বুঝতে হবে...'

'...ওই দ্বীপটাই খুঁজছি।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'নেমে পড়ব।'

'ওরা দেখে ফেললে?'

'যাতে না দেখে সে-ভাবেই থাকতে হবে। দশ মাইল লম্বা, তারমানে দ্বীপটা খুব ছোট না। ওরা যেদিকে নামবে, তার উল্টোদিকে বা অন্য কোনদিকে অন্য কোথাও নামব আমরা। সঙ্গে রাইফেল বন্দুক কিচ্ছু নেই, খালি হাতে চার চারটে খুনে ডাকাতের সঙ্গে লাগতে গেলে মরব।...আগে থেকে ভেবে লাভ নেই, যখন যা হয়, দেখা যাবে।'

'আকাশে থাকতেই যদি আমাদের দেখে ফেলে?' বিড়বিড় করল কিশোর, নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন।

'দেখলে কি হবে? প্যান-আমেরিকানের ছাপ্পড় মারা ফ্লাইংবোট অনেক আছে,

আমরাই এসেছি জানছে কিভাবে?'

'তা-ও কথা ঠিক। আমাকে প্লেন চালাতে হবে কেন···আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'আরে! খেতে-টেতে হবে না? নাড়ীভুঁড়ি সুদ্ধ হজম হয়ে গেল···যাও, তুমি খেয়ে এসো। তারপর আমি যাব।'

'আপনিই যান,' প্লেন চালানোর কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর। 'শুকনো কিছু থাকলে পাঠিয়ে দেবেন এখানেই।'

কিশোরের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসল ওমর। 'এসো, এখানে এসে বসো,' পাইলটের সীট ছেড়ে দিল সে।

কিভাবে হাল ধরতে হবে কিশোরকে দেখিয়ে দিল ওমর। বলল, 'বলো তো, গতিবেগ কত? কত ওপর দিয়ে যাচ্ছি?'

মিটার দেখে বলল কিশোর, 'একশো চল্লিশ মাইল।···আট হাজার ফুট।'

'হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দ্বীপটা চোখে পড়ার কথা। বড় বেশি স্লো,' নাক কুঁচকালো ওমর। 'এসব গরুর গাড়ি চালিয়ে মজা নেই।···ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। যেভাবে বললাম, ধরে থাকো, অন্য কিছু নাড়াচাড়া করবে না। অসুবিধে দেখলেই ডাক দেবে আমাকে।'

'আচ্ছা,' সামনের দিকে চেয়ে বলল কিশোর, পুরোদস্তুর পাইলটের ঢঙে।

মুচকি হেসে, দরজা খুলে কেবিনে এসে ঢুকল ওমর। তাকে দেখে হাসল বব।

ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। 'আপনি! প্লেন···'

'কিশোর চালাচ্ছে,' হাসছে ওমর।

'কি-শো···,' লাফ দিয়ে উঠল মুসা।

কাঁধ চেপে তাকে বসিয়ে দিল ওমর। 'একবারে খাবার নিয়ে যাও ওর জন্যে।'

এত তাড়াহুড়োর মাঝেও অনেক করেছে হোস বার্গ, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল ওমর। বেশ বড়সড় একটা পাঁউরুটি, আধসেরখানেক পনির, স্লাইস করে ভাজা গরুর মাংস, আর এক কাঁদি কলা রাখা আছে দুই সারি সীটের মাঝখানে। সাংঘাতিক কিছু নয়, কিন্তু তাদের যা অবস্থা, এই-ই রাজার ভোজ এখন।

'গোটা দুই কলা,' বসতে বসতে বলল ওমর, 'দিয়ে এসো কিশোরকে।' ছোট পকেট-ছুরি বের করে এক টুকরো পনির কেটে নিয়ে কামড় বসাল, সেই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে রুটি ছিঁড়ে নিল বড় এক টুকরো। 'খাও···তুমিও খাও,' ববকে বলল।

কিশোর প্লেন চালাচ্ছে, এমন একটা আশ্চর্য খবর শুনে এক মুহূর্ত দেরি করল না মুসা, এক টানে কলা ছিঁড়ে নিয়ে প্রায় ছুটে চলে গেল।

'মোহরটা বাঁচাতে পেরেছেন,' বলল বব, 'সেজন্যে ধন্যবাদ।'

'ওহ্, ভুলেই গিয়েছিলাম,' পকেটে হাত ঢোকাল ওমর। 'এই যে, নাও,' বলে মোহরটা বের করে বাড়িয়ে ধরল।

নিতে গেল বব। ঠিক এই সময় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। সাঁ করে কোণাকোণি অনেকখানি উঠে গেল বিমান, যেন ঊর্ধ্বমুখী বায়ুস্রোতের টানে, তারপরই পাথরের মত সোজা পড়ল নিচে, প্রায় দু'শো ফুট নেমে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি

খেল, এগিয়ে চলল আবার।

সীট থেকে শূন্যে উঠে পড়ল ওমরের শরীর, ধপ করে পড়ল আবার সীটে, হাতের রুটি আলগাভাবে ধরা ছিল, ছুটে উড়ে চলে গেল একদিকে। ববেরও একই অবস্থা। ফিরে আসছিল মুসা, ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালে, মেঝেতে গড়াগড়ি খেল, অবশেষে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল কোনমতে, হাঁটুভাঙা 'দ'-এর অবস্থা। 'খাইছে!...আল্লাহ্‌রে, হলো কি?'

পেট চেপে ধরেছে বব। 'সব্বোনাশ!' জোরে জোরে শ্বাস নিল সে। 'মনে হলো, নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে।...ওরকম আরেকবার হলেই গেছি...'

উঠে পড়েছে ওমর। ছুটে গেল ককপিটের দরজার কাছে। ভেতরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'

বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, 'জানি না।'

'যন্ত্রপাতি কোনটা নাড়াচাড়া করেছ?'

'কিচ্ছু না। খালি একটা কলা ছুলতে যাচ্ছিলাম...অমনি...'

'মেঘের ভেতরে ঢুকেছিল?'

'মেঘ কোথায়? চিহ্নই নেই। আমি তো ভাবছিলাম, কিছু একটা করেছেন কেবিনে, তাতে কোনভাবে কন্ট্রোল অ্যাফেক্ট করেছে।'

'না! খাচ্ছিলাম, আর ববের মোহরটা দিতে যাচ্ছিলাম...'

'...কী!' ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর।

'আরে, ওই ডাবলুনটা। মনে হচ্ছে, সত্যিই জিনের আসর আছে ওটাতে।'

'জিনের আসর?'

'এসব তো বিশ্বাস করি না। কিন্তু তোমাদের মুখেই তো মোহরটার গল্প শুনলাম। যখন যার কাছে যাচ্ছে, তারই ক্ষতি করে বসছে।'

'আমি এখনও বিশ্বাস করি না।'

'আমিও না। কিন্তু যা যা ঘটেছে, সব খতিয়ে দেখো না। প্রথমে, জলদস্যুর জাহাজটার কথাই ধরো। ববের বাবার চিঠি পড়ে বোঝা যায়, কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল ওটায়। ওটার ক্যাপ্টেন মরেছে রহস্যজনক ভাবে। তার সামনে টেবিলে ছিল এই মোহর। কিম এটা হাতে তুলে নিতে না নিতে মরল হ্যামারের ছুরি খেয়ে। ববের বাবা মরল। তারপর দেখো, যে নাবিককে দিয়ে চিঠি আর মোহর পাঠিয়েছিল, সেই নাবিক যে জাহাজে উঠেছিল, তার কি অবস্থা হলো। বার বার দুর্ঘটনায় পড়ল। হ্যামার ওটা ধরেই আছাড় খেল বোরিসের হাতে। বব ওটা পকেটে নিয়ে হোটেল থেকে বেরোতে না বেরোতেই পড়তে যাচ্ছিল ট্রাকের তলায়। তারপর চড়লে তোমরা ট্যাক্সিতে। ড্রাইভার উল্টোপাল্টা ব্যবহার শুরু করল, গুঁতো লাগিয়ে দিল আরেক গাড়ির সঙ্গে। অ্যালেন কিনি মরল গুলি খেয়ে।...তারপর প্লেনটা হঠাৎ এমন করে উঠল।' থামল ওমর। চুপ করে রইল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'কেমন রহস্যময় না? দেখো, কুসংস্কার নেই আমার। কিন্তু এতগুলো ঘটনার কি ব্যাখ্যা? একটা ব্যাপার বোধহয় অস্বীকার করবে না, দুর্ভাগ্য বলে একটা কথা আছে, কোন কোন জিনিসে যেন লেপ্টে থাকে সেই দুর্ভাগ্য, মোহরটার ব্যাপারও হয়তো তাই।'

আবার চুপ করল সে। 'আচ্ছা, ববকে বলি না. মোহরটা ফেলে দিক। কত আর দাম? এমন একটা অলক্ষুণে জিনিস রেখে কি হবে? অযথা ঝুঁকি…আমি খেয়ে আসি।' আবার কেবিনে ফিরে এল ওমর।

টেবিলের ওপর কলার খোসার স্তূপ বানিয়ে ফেলেছে বব আর মুসা।

'কি হয়েছিল?' ওমরকে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'উল্টোপাল্টা টিপ মেরেছে, নাকি?…উহ, কোমর ভেঙে দিয়েছে আমার!' আরেকটা কলা ছিঁড়ে নিল সে।

'কিশোর কিছুই করেনি।' আগের সীটটায় বসে পড়ল ওমর, আরেক টুকরো রুটি ছিঁড়ে নিল।

'কিশোর কিছু করেনি।' কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে হাত থেমে গেল মুসার। 'তাহলে?'

'বুঝতে পারছি না। বোধহয়…'

'…ডাঙা! ডাঙা দেখা যাচ্ছে!' ককপিট থেকে কিশোরের চিৎকার শোনা গেল। 'ওমর ভাই, জলদি আসুন।'

'দেখে এসো তো,' মুসাকে বলল ওমর। খাওয়া ছেড়ে আবার উঠতে রাজি না।

দেখে এল মুসা। চিবাতে চিবাতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ওমর।

'ডাঙা কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না,' বলল মুসা। 'দিগন্তের কাছে কি যেন। ঝড় হতে পারে।'

হাতের রুটি আর পনির দ্রুত শেষ করল ওমর, ছোট হয়ে আসা কাঁদি থেকে একটা কলা ছিঁড়ে নিয়ে উঠল। ককপিটে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

উইণ্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে কিশোর। গম্ভীর। 'ওটা কি?'

এগিয়ে এল ওমর, তীক্ষ্ণ চোখে দেখল দূরের জিনিসটা, কলাটা পকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি না। কিন্তু লক্ষণ বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না।' ঝড়ের এলাকা…যখন-তখন হারিকেন আঘাত হানে। সে এক ভয়ংকর ব্যাপার…যাও, ওঠো, জলদি কিছু মুখে দিয়ে নাও। সবাইকে তৈরি থাকতে বলো। ঝড়ই আসছে বোধহয়।' কিশোরের খালি করে দেয়া পাইলট সীটে বসে পড়ল সে। দিগন্তে দৃষ্টি স্থির।

মাইল বিশেক দূরে চকচকে ইস্পাত-রঙা সমতল সাগর, সেটা থেকে ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠছে যেন সপ্তমীর চাঁদ-আকারের দ্বীপটা, মাঝখান থেকে চোখা হয়ে উঠে গেছে পাহাড়-চূড়া। ওটার আশেপাশে আরও কয়েকটা দ্বীপ, রহস্যময় নীল মহাশূন্যে যেন ভেসে রয়েছে। তারও পরে গাঢ় নীল একটা বেগুনী মেখলা যেন দিগন্ত ঢেকে দিচ্ছে দ্রুত, খুব দ্রুত, যেন একটা অদৃশ্য হাত প্রকাণ্ড এক নীল চাদর নামিয়ে দিচ্ছে মস্ত এক গম্বুজের ওপর থেকে।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে ওমরের। ঝড়ই, সন্দেহ নেই আর। কি করবে এখন? আরও ওপরে উঠে ঝড়ের ওপর দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে, নাকি ঝড় আঘাত হানার আগেই দ্বীপে নামার চেষ্টা করবে? ঝড়টা কত উঁচু, অনুমান করা কঠিন, তার চেয়ে দ্বীপে নেমে নিরাপদ কোন জায়গায় আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করাই ভাল। সিদ্ধান্ত

নিয়ে আর দেরি করল না, থ্রটল খুলে দিল পুরোপুরি, জয় স্টিকটা সামনে ঠেলে দিলে যতখানি যায়, ইঞ্জিনের শক্তি নিংড়ে গতিবেগ যা আছে সব বের করে নিতে চায়।

দরজায় দেখা দিল কিশোর। 'কি হয়েছে?'

'ভয়ানক বিপদ আসছে,' বিড়বিড় করল ওমর। 'ঝড়কে ছাড়িয়ে যেতে পারব না, পেট্রল যা আছে, কুলোবে বলে মনে হয় না। এসে পড়ার আগেই দ্বীপে নামতে হবে। ঝড় যেদিক থেকে আসছে, দ্বীপে তার উল্টোদিকে কোন একটা খাঁড়ি-টাড়ি পেয়ে গেলে সুবিধে।'

উদ্বিগ্ন দেখাল কিশোরকে। মুখ থমথমে। এগিয়ে আসা ঝড়ের দিকে চেয়ে রয়েছে। 'এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি। ভয়ংকর।'

'গতি একশো মাইলের কম না,' ওমরের গলা কাঁপছে। 'পালকের মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে প্লেন। মুসা আর ববকে মেঝেয় শুয়ে পড়তে বলো।'

'দ্বীপে পৌছতে পারব?'

'আশা করছি।'

হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে এখন প্লেন। ইচ্ছে করেই নামিয়ে এনেছে ওমর, সুবিধে হবে ভাবছে। গর্জন শুরু হয়েছে সাগরের, ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে যেন বিশাল দৈত্য।

'ঢেউ তো নেই, ব্যাপার কি?'

'উঠবে,' বলল ওমর, 'পাহাড়ের সমান একেকটা। তার আগেই দ্বীপে…'

'আরে, আরে! গায়ে এসে পড়বে নাকি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

বিমানের নাক সামান্য সরিয়ে দিল ওমর। বড় একটা অ্যালবেট্রস উড়ে আসছে দ্রুত, ছড়ানো ডানা, থিরথির করে কাঁপছে পালক, বাঘের তাড়া খেয়ে ছুটে পালাচ্ছে যেন হরিণশিশু।

'অবাক কাণ্ড তো!' ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। 'প্লেনটা দেখতে পাচ্ছে না নাকি?'

বিমানের নাক আরেকটু সরাল ওমর। কিন্তু জেদ ধরেছে যেন পাখিটা, ধাক্কা লাগবেই। ওটাও ঘুরে গেল খানিকটা, বাতাসের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ঝটকা দিয়ে ওপরে উঠে গেল আরও, সাঁ করে ছুটে এল। চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারল না ওমর। দু'হাতে মুখ ঢাকল কিশোর। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলল, যেন তার গায়েই এসে পড়বে পাখিটা।

কড়মড়-মড়াৎ করে বিচিত্র শব্দ হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ।

ফেকাসে মুখ তুলে চাইল কিশোর। 'হায় হায়! বাঁয়ের প্রপেলারটা গেছে!'

জবাব দিল না ওমর, হাত দিয়ে মুখের রক্ত মুছছে।

উঠে দাঁড়িয়ে কাত হয়ে ভালমত দেখল কিশোর, বাঁয়ের প্রপেলারের পাখাগুলো নেই, শুধু দণ্ডটা দেখা যাচ্ছে, নগ্ন। বাঁ পাশের উইণ্ডস্ক্রীন ভেঙে চুরচুর, গর্তটায় ঠেসে আটকে রয়েছে রক্তাক্ত পালকের একটা বোঝা। 'ইস্‌স্‌!' শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজাল সে।

আবার প্রাণ ফিরে পেল ইঞ্জিন।

'এক ইঞ্জিনে চলবে?' খসখসে হয়ে গেছে কিশোরের গলা।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ওমর। উত্তেজনার মুহূর্তে দুটো ইঞ্জিনই বন্ধ করে দিয়েছিল, একটা চালু হয়েছে। উদ্বিগ্ন চোখে সে তাকিয়ে রয়েছে দ্বীপটার দিকে। কালো একটা চাদর দ্রুত এগিয়ে আসছে, উঠে আসছে মাথার ওপর, তার ওপাশে ঢাকা পড়ে গেছে সূর্য। সাগর যেন চকচকে একটা আয়না। 'হয়তো।'

কাঁপন উঠল হঠাৎ সাগরে, শাদা পানির কণা ছিটিয়ে স্যাৎ করে তীব্র গতিতে ছুটে গেল বাতাস পানি ছুঁয়ে, ভীষণভাবে দুলে উঠল বিমান। 'এসে গেছে!' শক্ত হাতে জয় স্টিক চেপে ধরল ওমর।...দ্বীপের অবস্থা দেখেছ?

সেদিকেই চেয়ে রয়েছে কিশোর, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় একবার এদিক, একবার ওদিকে কাত হচ্ছে দ্বীপের গাছপালা, অজানা এক দানব যেন যন্ত্রণায় দোমড়াচ্ছে-মোচড়াচ্ছে শরীর। নারকেল আর অন্যান্য গাছের ডাল-পাতা ছিঁড়ে পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

জয় স্টিকটাকে ঠেলে ধরে রেখেছে ওমর, চোখ অস্থির, নামার জায়গা খুঁজছে। দ্বীপের ধার ঘেঁষে থাকা প্রবাল-প্রাচীর ডুবে গেছে এখন রাশি রাশি শাদা ফেনার তলায়।

বিমানের ওপর আঘাত হানল হারিকেন।

আহত মুরগীর মত কেঁপে উঠল ফ্লাইং-বোট, সাঁই করে ঘুরে গেল আধপাক, আবার ওটার নাক ঘোরাল ওমর অনেক পরিশ্রম করে, পরক্ষণেই ডাইভ দিল বিমান নিয়ে। প্রায় খাড়া হয়ে নামতে শুরু করল বিমান। কাঁপছে, দুলছে, দোমড়াচ্ছে জীবন্ত প্রাণীর মত, এগিয়ে যাচ্ছে দ্বীপের ছোট্ট ল্যাগুনের দিকে। মিটারে কাঁটা শো করছে একশো-চল্লিশ, অথচ যে হারে এগোচ্ছে, গতিবেগ তিরিশ-চল্লিশের বেশি না, তারমানে বাতাসের গতি একশো'র ওপরে। ভয়ংকর গতিবেগ। এর সঙ্গে লড়াই করে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে ফ্লাইং-বোট প্রবাল-প্রাচীরের দিকে, প্রাচীর চোখে পড়ছে না, তার জায়গায় ফুঁসছে শাদা পানি, ফেনা ছিটাচ্ছে ফোয়ারার মত।

'পারব...,' বলেই থেমে গেল কিশোর, তার অসমাপ্ত কথার জবাব দিতেই যেন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল বাকি ইঞ্জিনটাও।

চোয়াল কঠিন হয়ে গেছে ওমরের, দাঁতে দাঁত চেপে দু'হাতে জয় স্টিকটা ঠেলে ধরে রেখেছে। ল্যাণ্ড করবে কি করে, ভাবছে। সাগরের যা অবস্থা পাঁচ মিনিটও টিকবে না। ডাঙায় নামবে।

'সাঁতরাতে হবে,' ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে বলল ওমর। 'ল্যাণ্ড করাতে পারব না। যেখানেই গুঁতো খাক, গুঁড়ো হয়ে যাবে, ভেতরে থাকলে মরব। লাফ দিতে হবে তার আগেই। ওদের রেডি হতে বলোগে।'

'প্লেনটা বাঁচানো যাচ্ছে না...'

'...আরে দূর, প্লেন! জান বাঁচানোর চেষ্টা এখন। যাও, জলদি যাও।'

কিশোরকে বলল বটে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওমর, শেষ মুহূর্তের আগে সে লাফ দেবে না। একটা উঁচু জায়গা এখন লক্ষ্য তার, ওখানটাতে উঠছে না ঢেউ।

কিন্তু ওখানে কি পৌঁছতে পারবে? মনে হয় না! একশো ফুট ওপরে রয়েছে প্লেন, প্রতি এক গজ এগোতে গিয়ে এক গজ করে নামছে, এ-হারে…নাহ্, অসম্ভব! কিন্তু হাল ছাড়ল না সে।

সবাই এসে ঢুকল ককপিটে, গা ঘেঁযাঘেঁষি করে। সাঁতরানোর জন্য তৈরি। চেঁচিয়ে আদেশ দিল ওমর। 'রেডি!'

'রেডি।' একসঙ্গে জবাব দিল তিন কিশোর।

'বব, যাও!'

দ্বিধা করছে বব। পানি ছুঁই ছুঁই করছে বিমান। আর কয়েক গজ এগোতে পারলেই পৌঁছে যাবে জায়গা মত।

'জলদি!' আবার চেঁচিয়ে উঠল ওমর। 'ডানা ধরে ঝুলে পড়ো! কুইক!'

ওমরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল বব। বাঁ দিকের দরজা খুলে নেমে এল ডানার ওপর, হাত-পা কাঁপছে। ঠিক এই সময় প্রচণ্ড বাতাস এসে ঝাপটা মারল বিমানের গায়ে, সাঁই করে ঘুরে গেল বিমানটা, দুলে উঠল ভীষণভাবে। পিছিয়ে এল অনেকখানি। দরজার ধার থেকে হাত ছুটে গেল ববের, ডানা আঁকড়ে ধরে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল, পারল না, পিছলে চলে এল ডগার কাছে। আবার আঘাত হানল বাতাস, আবার ঝাঁকিয়ে দিল বিমানকে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বাতাসে ঝুলে রইল যেন বব, আবছাভাবে দেখছে, তীব্র গতিতে তার দিকে যেন উঠে আসছে ফেনামেশানো পানির ঘূর্ণিপাক, পরক্ষণেই গাঢ় নীল এক নতুন পৃথিবী গিলে নিল তাকে। অজানা এক ভয়াবহ দানব যেন টেনে নামিয়ে নিয়ে চলল, শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চায়।

গাঢ় নীল রঙ হালকা হতে শুরু করল, তার মাঝে ঝিলমিল করছে শাদা আলোর ফুটকি। বুঝতে পারছে বব, ডুবে মরতে যাচ্ছে সে। বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস, ফেটে যেতে চাইছে। ভেসে উঠুক বা না উঠুক, আর শ্বাস না টেনে পারবে না সে, দম নেয়ার জন্যে হাঁ করল। ঠিক ওই মুহূর্তে নীল রঙ হঠাৎ সরে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল দিনের আলো, বড় বড় টানে বুক ভরে টেনে নিল সে ভেজা বাতাস। কোথায় আছে বোঝার আগে, সাঁতরানোর কথা ভাবার আগেই নিচ থেকে আবার টান মারল তাকে অজানা দানবটা, আবার ডুবে গেল সে গাঢ় নীল জগতে। হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল সে, কিন্তু কোন লাভ হলো না : শক্তি ফুরিয়ে আসছে। লড়াই করার চেয়ে গা ঢেলে দেয়া অনেক সহজ, অনেক আরামদায়ক হবে, মনে হচ্ছে তার কাছে। আবার নিচ থেকে ঠেলতে শুরু করল দানবটা।

আবার বাতাসে ভেসে উঠল ববের মাথা। দম নিল জোরে জোরে। ঘাড় ফিরিয়ে আশেপাশে তাকাল, কঠিন কিছু একটা খুঁজছে, আঁকড়ে ধরার জন্যে। ফেনার মাঝে একটা নারকেলের ডাল চোখে পড়ল। প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে এগোতে গেল ওটার দিকে, কিন্তু তিন হাত যেতে না যেতে আবার টান মারল তাকে অদৃশ্য দানবটা। আবার ফিরে এল সেই নীল দুনিয়ায়। বজ্রের গর্জনের মত ভারি একটানা শব্দ কানে বাজছে। অসহ্য হয়ে উঠছে শব্দটা, আর সইতে পারছে না, ঠিক এই সময় হাতে লাগল কঠিন কিছু, খামচে ধরতে গেল, কিন্তু ধরে রাখতে

পারল না। তারপর হঠাৎ করেই দূর হয়ে গেল নীল রঙ, শব্দও চলে গেছে, তীরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে, ঢেউয়ের টানে হড়হড় করে নেমে যাচ্ছে আলগা বালি আর নুড়ি, সেই সঙ্গে সে-ও নামছে পিছলে। থাবা মেরে একটা পাথর ধরে আটকে থাকতে চাইল। হাঁপাচ্ছে। পলকের জন্যে ফিরে তাকাল একবার, আঁতকে উঠল। আরেকটা আসছে! মাথায় শাদাটে সবুজ ফেনার মুকুট পরে ভীমবেগে ধেয়ে আসছে ঢেউয়ের আরেকটা পাহাড়। দুর্বল পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, কোনমতে, ইস্, কোনভাবে যদি উঠে যাওয়া যেত আরেকটু ওপরে!

জানে পারবে না, তবুও চেষ্টার ত্রুটি করল না বব। কয়েক হাজার অজগরের মত ফুঁসতে ফুঁসতে আসছে ঢেউটা। এল, চলে গেল তার ওপর দিয়ে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বালি আর পাথর খামচে ধরে আটকে থাকতে চাইল সে। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। এক ঝটকায় তার হাত ছুটিয়ে নিল দানবটা, টেনে নিয়ে চলল।

আবার নীল জগতে প্রবেশ করল সে। দ্রুত গাঢ় হচ্ছে রঙ, বেগুনী হয়ে গেল দেখতে দেখতে, কালচে, কালো, তার মাঝে নানা রঙের ফুটকি! কানে বাজছে হাজারো ঢাক আর মন্দিরার শব্দ, অসীম অতলে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে অদৃশ্য দানব।

অনেক ওপরের প্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে যেন বব, পড়ছে তো পড়ছেই, এই পতনের যেন আর শেষ নেই। অনুভূতিটা খুব খারাপ না, বরং কেমন একটা আরাম! কিন্তু এই নামা শেষ হচ্ছে না কেন? আর পারছে না সে। যা খুশি হয়ে যাক, ঘটে যাক যা ঘটার, আর সে তোয়াক্কা করে না।

নীরবতার জগতে নেমে এল সে, শব্দ নেই এখানে। তলার মাটি রকেট গতিতে উঠে আসছে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেল বব। চোখের সামনে জ্বলে উঠল যেন রক্তলাল আগুন, বোম ফাটল বুঝি!

নয়

ববকে ফেনার নিচে হারিয়ে যেতে দেখল ওমর, কিন্তু কোন সাহায্যই করতে পারল না। বিমান সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে। ভাবছে, বব তাদের দু'এক মিনিট আগে গেল, এই যা, ওদেরও একই পরিণতি ঘটবে। পানিতে ডুবে মরবে ববেরই মত। ছাই হয়ে গেছে ওমরের চেহারা। কিশোরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'লাফ দাও!' বলেই সামনের পাথুরে চূড়াটাতে নামার জন্যে ডাইভ দিল বিমান নিয়ে।

পৌঁছতে পারল না অল্পের জন্যে। চূড়ার কয়েক গজ আগে পড়ে গেল বিমান। পানিতে, কিন্তু পানিতে পড়ার ধাক্কা যতটা লাগল, ডাঙায় পড়লেও বোধহয় তার চেয়ে বেশি লাগত না। গোড়া থেকে ছিঁড়ে খসে এল ডানা, নাকটা বাঁকাচোরা হয়ে গেল এমনভাবে, যেন জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ডিমের খোসা।

কিশোরের আগে লাফ দিল মুসা। পড়ল একটা পাথরের ওপর, কিন্তু থাকতে পারল না, পিচ্ছিল শেওলায় ঢাকা পাথর, পিছলে নেমে এল সে পানিতে, পরক্ষণেই

ঢেউ ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল তাকে আবার পাথরের ওপর।

কিশোর লাফ দিল মুসার পর পরই, পাথরটার কাছাকাছি পড়ল, ঢেউ তাকেও ছুঁড়ে দিল। কিভাবে জানি মুসার একটা বাড়ানো হাত ধরে ফেলল সে, বলতে পারবে না। পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করছে মুসা, অন্য হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল কিশোরের হাত। বড় জোর এক কি দুই সেকেণ্ডেই ঘটে গেল এতগুলো ঘটনা।

ককপিট থেকে বেরিয়ে দরজার কাছে পৌছতে পারল না ওমর, তার আগেই ঢেউ টেনে বিশ গজ দূরে নিয়ে এল বিমানটাকে। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙছে, পানির প্রচণ্ড তা-থৈ নাচের মাঝে পড়ে সাংঘাতিকভাবে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে বিমান, এখন বেরোলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। কি করবে? বেশি ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। একটানে জামাকাপড় খুলে ফেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চৌকাঠের ওপরের অংশ খামচে ধরল। সুযোগ এলেই, মানে, বিমানটা আবার তীরের কাছাকাছি গেলেই দেবে লাফ।

কিন্তু ওমরের দুর্ভাগ্য, গেল না বিমান। যেন তাকে নিয়ে খেলা করার জন্যেই হঠাৎ থেমে গেল ঝড়, ঢেউ যে একবার এগোচ্ছিল একবার পিছাচ্ছিল, সেটা অনেক কমে এল। বাতাসের গতি এখনও অনেক, কিন্তু ঢেউয়ের উথাল-পাথাল অবস্থা কমে যাচ্ছে, পানি নেমে যাচ্ছে দ্রুত, সেই সঙ্গে টেনে নামিয়ে তীর থেকে সরিয়ে নিচ্ছে বিমানটাকে, দূর থেকে দূরে। অসহায় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে ওমর, কিছুই করার নেই, নেমে যাচ্ছে বিমান হড়হড় করে, গিয়ে পড়বে নেমে আসা পানিকে যেখানে ভীমবেগে আঘাত হানছে ধেয়ে আসা ঢেউ, সেখানে। চোখের পলকে গুঁড়িয়ে যাবে বিমান ওখানে গিয়ে পড়লে।

নিরাপদেই আছে এখন কিশোর আর মুসা, পাথরটার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছে ফ্লাইং-বোট আর সেই সঙ্গে ওমরের পরিণতি। ধরেই নিয়েছে ওরা, বাঁচতে পারবে না বিমান, ঢেউ যেভাবে ওটাকে নিয়ে লোফালুফি করছে, আর কয় মিনিট টিকবে কে জানে। ভেতরে নিশ্চয় পানি ঢুকেছে, কারণ ডুবতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। দ্রুত সরে যাচ্ছে দূরে।

পাথরের ওপাশ থেকে বেরিয়ে অনুসরণ করে চলল দু'জনে, কিন্তু একটা জায়গায় এসে আর দেখা গেল না বিমানটাকে। পাহাড়ের ওপাশে চলে গেছে, চোখের আড়ালে এখন। পাশে সরে, পিছিয়ে, অনেকভাবে দেখার চেষ্টা করল ওরা। চকিতের জন্যে আরেকবার দেখা গেল বিমানটা, একটুখানি সরে এসেই ঝটকা দিয়ে চলে গেল আড়ালে, ওইটুকু সময়ের মাঝেই দেখা গেল ওমরকে, অসহায় ভঙ্গিতে দরজার ধার আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

'কি-কিছু একটা করা দরকার!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। একেবারে খালি গা, কোমরে ইলাস্টিক লাগানো খাটো পাজামা শুধু পড়নে। ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়া চুল লেপটে রয়েছে মাথার সঙ্গে, যেন খুলিতে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। কাঁধের কাছে কেটে গেছে, বোধহয় চোখা পাথরে খোঁচা লেগে, পানির সঙ্গে রক্ত মিশে হালকা লাল ধারায় গড়িয়ে নামছে গা বেয়ে।

ডান পা সামান্য বাঁকা করে রেখেছে কিশোর, ব্যথা, কিন্তু মানসিক অবস্থা এমন, কেন ব্যথা করছে দেখার কথাও ভাবছে না। 'টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে স্রোত...,' গলা কাঁপছে তার, 'চলো তো, দেখি, দেখা যায় কিনা...'

'কিভাবে...,' বলল মুসা, 'কোন পথই নেই।...ববেরও যে কি হলো...'

'বোধহয় নেই। কিছুই করতে পারলাম না ওর জন্যে।...এসো, দেখি, ওমর ভাইয়ের কি হলো...'

'কিন্তু কিভাবে...'

'ওগুলো পেরোতে হবে,' আঙুল তুলে ডানে দেখাল কিশোর।

'ওই জঙ্গল?' ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের দিকে। প্রায় খাড়া ঢাল, ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা, মাথা নুইয়ে যেন ঝুলে রয়েছে। 'ধার দিয়ে ঘুরে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, জঙ্গলের ভেতর দিয়েও যাওয়া যাবে না।'

'যেতেই হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

কিনার দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ওরা প্রথমে, পারল না। খাড়া পিচ্ছিল পাড়, নিচে পানি। শেষে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়াই স্থির করল। বৃষ্টিতে ভিজে সাংঘাতিক পিচ্ছিল হয়ে আছে মাটি, তার ওপর খাড়া ঢাল। বারবার আছাড় খেল, বেরিয়ে থাকা শেকড়ের চোখা মাথা, কাঁটালতা আর ধারালো নুড়িতে পা কাটল কয়েক জায়গায়, কিন্তু এতই উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, ব্যথা টেরই পেল না। লিয়ানা লতায় বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে পা, বার দুই হোঁচট খেয়ে পড়ল কিশোর, হাত ধরে তাকে টেনে তুলল মুসা।

বলেছে বটে পারবে না, কিন্তু কিশোরের আগে মুসাই চূড়ায় উঠল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাগর। রক্তশূন্য হয়ে গেল তার মুখ সহসা, হাত তুলে বলে উঠল, 'দেখো দেখো!' কণ্ঠ খসখসে, হাত কাঁপছে থরথর করে।

কিশোরও দেখল। কিছু বলার নেই। কি বলবে? মর্মান্তিক দৃশ্য! প্রায় মাইলখানেক দূরে ঢেউয়ে এখনও দুলছে ফ্লাইংবোটের ধ্বংসাবশেষ, পিঠটা একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। ওমরকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

কয়েক মিনিট নীরবে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, চেয়ে রয়েছে ভাঙা বিমানের দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।

নিচের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দিল মুসা। বিড়বিড় করল, 'গেল...,' ধপ করে ওখানেই বসে পড়ে দুহাতে মাথা চেপে ধরল।

আরও দু'তিন মিনিট নীরব রইল দু'জনে। আশা ছাড়তে পারছে না কিশোর, চেয়ে রয়েছে ঢেউয়ের দিকে, শাদা ফেনার দিকে, তীক্ষ্ণ চোখে আতিপাতি করে খুঁজছে ঢেউয়ের প্রতিটি ভাঁজ, ভাঙন, খাঁজ। 'নাহ, দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল সে, 'চলো, খুঁজে দেখি ববকে পাওয়া যায় কিনা।'

'কোনদিকে যাব?'

'চলো, এদিকে,' এক দিক দেখিয়ে বলল কিশোর। 'পেছনে গিয়ে আর লাভ কি? ওদিক থেকে তো এলামই।'

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নামতে শুরু করল ওরা। পথ নেই, ঘন জঙ্গল, বেশি

অসুবিধে করছে লিয়ানা লতা। খালি জড়িয়ে যায়, গায়ে, পায়ে। ওসব সরিয়ে পথ করে নামতে হচ্ছে, কোনদিকে যাচ্ছে, খেয়াল রাখতে পারছে না, কেয়ারও করছে না বিশেষ, নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই। একদিকে বেরোলেই হলো। যেদিকেই যাক, আগে-পরে সৈকতে বেরোতে পারবেই।

বালিতে ঢাকা সৈকতে বেরোল ওরা। প্রায় একই সঙ্গে চোখে পড়ল দু'টো জিনিস। একটা সিঁড়ি, হতভাগ্য ফ্লাইং বোটের ছোট্ট সিঁড়ি। বালিতে পানির ধার ঘেঁষে পড়ে আছে। আরেকটা জিনিস পানি আর বালির মিলনস্থলে, ঢেউয়ের ধাক্কায় ধীরে ধীরে দুলছে। দ্রুত এগোল ওরা ওই দ্বিতীয় জিনিসটার দিকে।

'ববের জ্যাকেট,' বলল কিশোর।

বলার দরকার ছিল না, মুসাও চিনতে পেরেছে। পানিতে ভিজে ফুলে রয়েছে পোশাকটা, ঢেউই কোনভাবে এনে ফেলেছে তীরের কাছে। নিচু হয়ে জ্যাকেকটা তুলল মুসা, চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে, এটা নিয়ে কি করবে যেন বুঝতে পারছে না। ফেলে দিতে মন চাইছে না। হাতে ঝুলিয়ে উঠে এল কয়েক পা। হঠাৎ ওটার পকেট থেকে টুপ করে কিছু একটা পড়ল শাদা বালিতে। সোনার মোহর, ডাবলুন।

জিনিসটা কুড়িয়ে নিল মুসা, তালুতে নিয়ে চেয়ে রইল বিমূঢ়ের মত। 'অভিশপ্ত,' ভারি গলায় বলল, 'যেখানে যার হাতে যাচ্ছে, তারই সর্বনাশ করে ছাড়ছে।'

চুপ করে রইল কিশোর।

'এই অভিশাপ আর সঙ্গে নয়,' তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে মুসার কণ্ঠ, হাত ঘুরিয়ে সাগরে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েই থমকে গেল। একটা শব্দ, রাইফেলের গুলির মত।

'আরে!' শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকাল কিশোর। সৈকতের শেষ মাথা দেখা যাচ্ছে না, আওয়াজটা ওদিক থেকে এসেছে বলেই মনে হলো।

'ওমর ভাই হতে পারে না,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'রাইফেল নেই তার কাছে। বব তো নয়ই। তাহলে? নিশ্চয় জনবসতি আছে দ্বীপে, গ্রাম বা ছোটখাটো শহর আছে···দোকানপাটও নিশ্চয় আছে,' ঝট করে মুসার দিকে ফিরল সে। 'ফেলো না,' হাত নাড়ল, মোহরটা ফেলো না। কাজে লাগবে। বিক্রি করে খাবার কিনতে পারব। কাপড়ও দরকার। চলো, দেখি।'

দ্রুত এগোল ওরা। কিশোরের কষ্ট হচ্ছে, ডান পায়ের গোড়ালি ফুলে উঠেছে, মচকে গেছে বোঝাই যায়। একটা ডাল দিয়ে লাঠির মত বানিয়ে নিয়েছে সে, ওটাতে ভর দিয়ে হাঁটছে খুঁড়িয়ে।

যা ভেবেছিল, তার চেয়ে দূরে সৈকতের শেষ মাথা। দু'মাইল তো হবেই, আধ ঘণ্টা লেগে গেল ওখানে পৌঁছুতে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন।

খুব ধীরে মোড় নিয়েছে এখানে পাহাড়ের ঢাল, গায়ের পাথরের স্তূপ ঢালু দেয়াল তৈরি করে রেখেছে যেন। পাহাড়ের গায়ে বিছিয়ে রয়েছে শুধু পাথর আর পাথর, কোন এক সময় বুঝি এখানে ঢল নেমেছিল পাথরের, নেমে গেছে একেবারে পানিতে। চূড়ার কাছে পাথরের মাঝে যেন হঠাৎ করে গজিয়েছে একগুচ্ছ নারকেল গাছ।

'ওখানে উঠতে পারলে দেখা যাবে কে গুলি করেছে,' হাত তুলে নারকেলের কুঞ্জটা দেখিয়ে বলল কিশোর, 'যদি ও থেকে থাকে এখনও।'

আলগা পাথরও রয়েছে অনেক, নাড়া লাগলেই সড়সড় করে গড়িয়ে নামে, সঙ্গে করে নিয়ে যায় আরও কিছু আলগা সঙ্গী-সাথীকে। পা পিছলে ওগুলোর সঙ্গে পড়লে কোমর ভাঙার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, নিদেন পক্ষে হাত-পা কিছু না কিছু তো ভাঙবেই।

অনেক কষ্টে অবশেষে নিরাপদেই উঠে এল ওরা চূড়ায়। নারকেলের গুচ্ছের ভেতর ঢুকে ফাঁক দিয়ে তাকাল। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। যেন অকস্মাৎ শেকড় গজিয়ে গেছে ওদের পায়ে।

—০—

জলদস্যুর দ্বীপ ২

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৮৭

ছোট্ট একটা ল্যাগুন, প্রবেশমুখের কাছে আড়াআড়িভাবে বাঁধের মত গড়ে উঠেছে প্রবাল-প্রাচীর, ঢেউ আটকাচ্ছে। ল্যাগুনে ভাসছে ছোট একটা বিমান। এক নজর দেখেই বুঝল কিশোর ও মুসা, ওটা ওদের উভচর, ম্যারাবিনা থেকে যেটা ছিনতাই হয়েছে। মস্ত এক জলচর পাখির মত ভাসছে ওটা পানিতে, দোল খাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউয়ে। ওটা থেকে তিরিশ কি চল্লিশ গজ দূরে তীরে পড়ে রয়েছে রবারের ডিঙিটা।

দ্রুত একবার ল্যাগুনের পাড়ের জঙ্গলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল কিশোর, লোকগুলোকে দেখা যায় কিনা দেখছে। নেই। আশ্চর্য! গেল কোথায়? মুসার দিকে ফিরে বলল, 'কি বুঝলে?'

'বিগ হ্যামার আর তার দল।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেকথা বলছি না…'

'তাহলে?'

'বুঝলে না?' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'এটাই সেই দ্বীপ!'

ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরল মুসা, চেয়ে রইল। কথাটা একবারও মনে হয়নি তার। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'তো, এখন কি করব আমরা?'

'কি করব…,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'ওমরভাই থাকলে প্লেনটা আবার দখল করা যেত।'

'নেই যখন, তা আর করতে পারছি না। অন্য কিছু ভাবতে হবে।'

সাগরের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। ঢেউয়ের মাথায় এখনও শাদা শাদা ফুটকি। মাথা নাড়ল সে আনমনে। 'আর কি ভাবব?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল। 'প্লেনটা এখনও দখল করা যায় হয়তো, কিন্তু কি করে বের করে নিয়ে যাব ল্যাগুন থেকে? আমি অন্তত পারব না। জায়গা নেই, ওড়ার গতি সঞ্চয় করার আগেই বাঁধের কাছে পৌঁছে যাবে প্লেন। সৈকতও ওটা খুব ছোট, ডাঙা থেকে যে উড়ব তারও উপায় নেই।'

'কি বলতে চাও আসলে?'

'বলতে চাই,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'প্লেনটা স্টার্ট দিতে পারব, ওমরভাইয়ের সঙ্গে থেকে সেটুকু শিখেছি, আগে বাড়াতেও পারব, কিন্তু অত্তোটুকুন জায়গায় ওটা নিয়ে উড়াল দেয়া আমার সাধ্যের বাইরে, ওমরভাইও পারবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, উড়তে যদিও বা পারি, নামতে পারব না, নামাতে জানি না।

অ্যাকসিডেন্ট করে মরব।'

'হুঁ! কিন্তু এখন করবটা কি?'

'অন্ধকারও হয়ে আসছে। এখন আর কিছুই করার নেই, লুকিয়ে থেকে সুযোগের অপেক্ষা করা ছাড়া।'

'কি সুযোগ?'

'জানি না। তবে কোন না কোন সুযোগ পেয়েও যেতে পারি। চলো, কাটি এখান থেকে। ওরা যে-কোন সময় এসে পড়তে পারে। নিশ্চয় ব্যাটারা গুপ্তধন-শিকারে বেরিয়েছে।'

উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে চলল দু'জনে, উদ্দেশ্য, বনে গিয়ে ঢুকবে। কিন্তু ভাগ্য ওদের নেহায়েত খারাপ। খানিক দূর এগোতে না এগোতেই পড়ল আরেক বিপদে।

ঘন একটা নারকেল কুঞ্জ থেকে বেরিয়েই লোকটার গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। ফেকাসে চেহারার হালকা-পাতলা এক লোক, উল্টোদিক থেকে আসছিল। লোকটাকে চেনে না দুই গোয়েন্দা, কিন্তু তার হাবভাব, চেহারা, আর হাতের রাইফেল দেখে অনুমান করতে কষ্ট হলো না, সে কে।

'আরে, আরে,' টেনে টেনে কথা বলে লোকটা, 'কি অবাক কাণ্ড! তোমরা! এসো এসো, হ্যামার দেখলে খুব খুশি হবে। বলছিল, তোমরা এসেও পড়তে পারো।'

শান্ত চোখে লোকটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। ভয় পাচ্ছে না। ভেতরে ভেতরে জমে উঠছে ঠাণ্ডা রাগ। 'তুমি ইমেট চাব?'

'বা-বাহ, নামও তো জানো দেখছি। এসো, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। আলো থাকতে থাকতেই যাওয়া দরকার, নইলে পাথরে পিছলে পড়ে ঠ্যাং ভাঙবে।'

অসহায় বোধ করল দুই গোয়েন্দা, কিছু করার নেই, নীরবে চলল লোকটার সঙ্গে। ল্যাগুনের এক ধারে ছোট্ট একটা খোলা জায়গায় নিয়ে এল তাদেরকে চাব, পাথরের স্তূপ আড়াল করে রেখেছে, তাই জায়গাটা আগে দেখতে পায়নি মুসা কিংবা কিশোর। তিনজন বসে আছে ওখানে। হ্যামারের পাশে বসেছে লম্বা এক লোক, কোটরে বসা চোখ ঘোলাটে। তাদের উল্টোদিকে বসেছে কুচকুচে কালো বিশাল এক নিগ্রো, বেশভূষা দেখে অন্য সময় হলে হেসে ফেলত মুসা, কিন্তু এখন হাসি আসছে না। চানাচুর কিংবা সাবানের বিজ্ঞাপন করার জন্যে যেন সং সেজেছে লোকটা, মাথায় চূড়াওয়ালা টুপিটা শুধু নেই।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নিগ্রো, কড়া চোখে তাকিয়ে রয়েছে বন্দিদের দিকে। এমনিতে ঝুলে থাকা ঠোঁট আরও ঝুলে পড়েছে। হাতের মোটা মোটা আঙুল মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলছে ধীরে ধীরে। বিস্মিত।

'তো, এসে গেছ,' কিশোরের দিকে চেয়ে বলল হ্যামার।

'তাই তো মনে হয়, নাকি?' বাঁকা জবাব দিল কিশোর।

'যা জিজ্ঞেস করব, সোজা জবাব দেবে, নইলে…,' কি করবে মুঠো পাকিয়ে

দেখাল হ্যামার। ধমকে উঠল, 'আরগুলো কোথায়?'

'কোথায়, আমারও জানতে ইচ্ছে করছে,' বলল কিশোর।

'জানো না বলতে চাও? মিথ্যে বললে বিপদে পড়বে। কোথায় ওরা?'

মিথ্যে বলার দরকার নেই। তাছাড়া, ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছে কিশোর। যা খুশি ঘটে ঘটুক, পরোয়া করে না আর। 'মিছে কথা বলব কেন? বোধহয় ডুবে মরেছে ওরা,' খসখসে কণ্ঠে বলল সে। 'ঝড়ের আঘাতে ভেঙে পড়েছে প্লেন, সাগরে পড়ে চুবমার হয়েছে। আমরা দু'জন বেঁচে গেছি। ব্যস, যা জানি বললাম।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। কিশোরের বলার ধরনে এমন কিছু রয়েছে, তার কথা অবিশ্বাস করতে পারল না শত্রুরা।

'বেশি চালাকির ফল,' অবশেষে বলল হ্যামার। সঙ্গীদের দিকে ফিরল, 'ছেলেদুটোকে কি করব?'

দাঁত বের করে হাসল নিগ্রো ম্যাবরি ডেনাবল। চোখের পলকে হাতে বেরিয়ে এসেছে ক্ষুর। ভয়ংকর ভঙ্গিতে হাতের তালুতে ঘষতে শুরু করল ঝকঝকে ক্ষুরের ফলা।

'সরাও ওটা,' ধমক দিল ঘোলাটে চোখো। 'অহেতুক খুন-জখমের কোন মানে নেই। ওদেরকে ছেড়ে দিলেই কি? ক্ষতি তো আর করতে পারছে না।'

'যদি প্লেনটা নিয়ে পালায়?' বলল ইমেট চাব। 'ছেলেগুলো খুব বেশি চালাক। প্লেন চালাতে জানে কিনা কে জানে। এখুনি ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বলল হ্যামার। 'তাছাড়া আমরা যা খুঁজছি, ওগুলোর ব্যাপারেও হয়তো জানে।'

'নিশ্চই,' জোরে মাথা ঝাঁকাল চাব। 'বেঁধে ফেলে রাখি। সকালে শুনব আমরা কি কি জানে। সারা রাত বাঁধা থাকলে সকালে মন বদলাবে। গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করবে হয়তো। তাড়াহুড়ো করে এখনি কিছু করে ফেলার কি দরকার?'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল হ্যামার। 'বাঁধো, বেঁধে ফেলো। ইচ্ছে করলে যখন খুশি মেরে ফেলে দিতে পারি; কিংবা ছেড়ে দিতে পারি। সেটা পরে ভাবব। ম্যাবরি, দড়ি আনো।'

এক ধারে পড়ে থাকা মালপত্র ঘেঁটে দড়ি বের করল ম্যাবরি। খপ করে মুসার কব্জি চেপে ধরল। চাপের চোটে মুঠো আপনা আপনি আলগা হয়ে গেল গোয়েন্দা-সহকারীর, মোহরটা হাতেই ছিল, আঙুল খুলে যেতেই বালিতে পড়ল।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাবরি, ছোঁ মেরে তুলে নিল মোহরটা। 'কোথায় পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল মুসাকে, দেখাচ্ছে সঙ্গীদেরকে।

জবাব দিল না মুসা।

'কোথায় পেয়েছ?' গর্জে উঠল হ্যামার। 'বলছ না কেন?'

'এটা সেই ডাবলুনটাই,' ঠাণ্ডা গলায় বলল মুসা, 'লস অ্যাঞ্জেলেসে যেটা পেয়েছি।'

'মিছে কথা। ওটা অ্যালেন কিনির কাছে,' বলল ম্যাবরি। 'বস্, ওরা জানে মোহরের সন্ধান।'

'বললাম না, এটা সেই মোহরটাই,' জোর গলায় প্রতিবাদ করল মুসা। 'অ্যালেন কিনির কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছি। আমাদের দেখে কিছু বুঝতে পারছ না? প্লেন ভেঙে মরার দশা, আর এনারা বলছেন মোহর খুঁজে পেয়েছি। আমাদের চেহারা দেখে সেরকম লাগছে?'

'দেখি তো মোহরটা,' ম্যাবরির দিকে হাত বাড়াল হ্যামার।

দ্বিধা করছে ম্যাবরি।

কিশোরের মনে হলো, ঠিক ওভাবেই দ্বিধা করেছিল ববের বাবা, হয়তো ঠিক ওই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে। হয়তো ওভাবেই হাত বাড়িয়েছিল হ্যামার সেদিনও। দিতে অস্বীকার করেছিল মিস্টার কলিনস।

'আমি এটা রাখি, বস,' অনুনয় করল ম্যাবরি।

কি ভাবল হ্যামার। 'ঠিক আছে, রাখো। একটা নিয়ে গোলমাল করে লাভ নেই, অনেক পাব শিগগিরই।'

খুশিতে বাগবাগ হয়ে মোহরটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ম্যাবরি। তারপর দড়ি নিয়ে কাজে লেগে গেল। মুসার দুই কব্জি এক করে বাঁধল, ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে দুই পা বাঁধল। নরম বালি না হলে খুব ব্যথা পেত মুসা। ঠিক একই ভাবে কিশোরকেও বাঁধা হলো।

রাত নামল। চাঁদ উঠল। রূপালী আলোর বন্যায় প্লাবিত করে দিল চারপাশে, ছোট্ট ল্যাগুনের পানিকে মনে হচ্ছে এখন তরল রূপা।

বালিতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ইমেট চাব। অন্য তিনজনও তাই করল।

কিশোর আর মুসাকে শাসাল হ্যামার। 'সকালে তোমাদের ব্যবস্থা করব দাঁড়াও!' বলে শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে।

দুই

পানি থেকে জ্যাকেটটা যখন তুলেছে মুসা, তখন সে কিংবা কিশোর তাদের বাঁয়ে ভালমত তাকালেই দেখতে পেত ববকে। ঝড়ের তোড়ে সাগরের তল থেকে ছিঁড়ে উঠে আসা শেওলা স্তূপ হয়ে আছে একটা জায়গায়। ভেজা, পিচ্ছিল শেওলার স্তূপের তলায় প্রায় অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে আছে ববের শরীর। না, মরেনি বব, খুব সৌভাগ্য, বিশাল একটা ঢেউ ছুঁড়ে ফেলেছে তাকে সৈকতে। বেহুঁশ হয়ে আছে।

মুসা আর কিশোর চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ নড়ল না বব। লাশ হয়ে পড়ে আছে যেন। সূর্য ডুবল। ভাটা শুরু হলো সাগরে! চাঁদ উঠল, ববের ফেকাসে চেহারা আরও ফেকাসে দেখাচ্ছে এখন রূপালী জ্যোৎস্নায়। গর্ত থেকে বেরিয়ে মার্চ করে এগিয়ে এল একটা কাঁকড়া, দাঁড়া দুটো শূন্যে তুলে রেখেছে অদ্ভুত দুটো অ্যান্টেনার মত, চলার তালে তালে দুলছে। দাঁড়ার মাথার ধারাল আঁকশি জোড়া মৃদু কিটকিট শব্দ করে একবার খুলছে, একবার বন্ধ করছে।

দুই গজ মত এগিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল কাঁকড়াটা, কোনরকম বিপদ আছে কিনা আন্দাজ করতে চাইছে হয়তো। আরেক গর্ত থেকে আরেকটা কাঁকড়া এসে যোগ দিল প্রথমটার সাথে। আরেকটা, তারপর আরও একটা, দেখতে দেখতে যেন

কাঁকড়ার হাট জমে গেল ওখানে। একটা অর্ধচন্দ্র সৃষ্টি করে এক সঙ্গে মার্চ করে এগোল দলটা অবশ হয়ে পড়ে থাকা দেহটার দিকে। নীরব রাত ভরে গেল জীবগুলোর দাঁড়ার অদ্ভুত কিটকিট শব্দে। যতই এগোচ্ছে, ধীরে ধীরে গতি কমাচ্ছে কাঁকড়াগুলো, আশ্চর্য শৃঙ্খলা। সব ক'টার গতি একই রকম থাকছে, এতটুকু এদিক ওদিক নেই।

নড়েচড়ে উঠল ববের শরীর। চোখের পলকে থেমে গেল কাঁকড়া-বাহিনী, একই সঙ্গে, তারপর দ্রুত একটা ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ল তিন দিকে। দেখতে দেখতে গায়েব হয়ে গেল।

চোখ মেলল বব। শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল তারাখচিত আকাশের দিকে, হঠাৎ করেই ফিরে এল বোধশক্তি, ডান কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল তাড়াতাড়ি। তাকাল জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল সাগরের দিকে। পুরো এক মিনিট লাগল নিজেকে বোঝাতে, যে সে স্বপ্ন দেখছে না, সমস্ত ব্যাপারটাই কঠোর বাস্তব। উঠে দাঁড়াল সে। পাক দিয়ে উঠল মাথার ভেতর, গল গল করে বমি করে ফেলল। পেট থেকে নোনা পানি বেরিয়ে যাওয়ায় বরং ভালই হলো, হালকা হয়ে গেল শরীর আর মাথার ভেতরটা, টলোমলো পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে এখন। শরীরের জায়গায় জায়গায় ব্যথা অনুভব করছে, আঙুল কাঁপছে।

আরেকবার বমি করল সে, পেট থেকে নোনা পানি সব বেরিয়ে যাওয়ার পর সুস্থির হলো। তাকাল চারপাশে। সঙ্গীদেরকে দেখার আশা করছে না, দেখা গেলও না, কাউকে। বিমানটাও নেই। একা সে, ভয়ংকর একাকীত্ববোধ প্রচণ্ড পীড়া দিতে শুরু করল তাকে। অন্য তিনজন পানিতে ডুবে মরেছে, এটা বিশ্বাস করতে পারছে না, বেঁচে আছে ওরা, নিরাপদে আছে, তা-ও বিশ্বাস হচ্ছে না। পানির ধার ঘেঁষে পড়ে থাকা শাদাটে একটা জিনিস চোখে পড়ল তার, কম্পিত পায়ে এগোল সেদিকে। খানিক এগিয়েই বুঝতে পারল কি ওটা, কাছে যাওয়ার দরকার হলো না—বিমানের সিঁড়ি, ওরা যেটাতে করে এসেছিল, সেটার। জোর করে চেপে রাখা পানি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না, দরদর করে বেরিয়ে এল চোখ থেকে। আর অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। ধপ করে বালিতে বসে দু'হাতে মুখ ঢাকল বব।

কতক্ষণ একই ভাবে বসে থাকল বলতে পারবে না, অবশেষে উঠে দাঁড়াল আবার, এভাবে ভেঙে পড়ার কোন মানে নেই। পেছনের ঘন জঙ্গলের দিকে চেয়ে আত্মা কেঁপে গেল, কি ধরনের জানোয়ারের বাসা ওই জঙ্গলে? কি আতংক আর বিপদ ওঁৎ পেতে আছে কালো গাছগুলোর আড়ালে? জানে না সে, এখান থেকে দেখে কিছু বোঝারও উপায় নেই।

দূর, যত্তোসব আজেবাজে ভাবনা!—ধমক দিয়ে মন থেকে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করল সে। আবার ফিরল সাগরের দিকে। আরে, ওই তো, ওই সেই পাথরটা। যেটাতে নামার চেষ্টা করেছিল সে। বানের পানি চলে যাওয়ায় অনেক উঁচু হয়ে আছে, নিশ্চয় শুকনো। ঢেউয়ের দাপাদাপি আর নেই এখন ওটাকে ঘিরে। তার বন্ধুরা কি ওখানেই আছে, টিলার ওপরে বা নিচে কোথাও পড়ে আছে তাদের লাশ? ববের বাবা বলত, খুন করে লাশ গুম করে না সাগর, ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

যাবে নাকি? গিয়ে দেখবে? ডানে-বাঁয়ে ভালমত তাকাল আবার, কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না। খাড়া পাহাড়ের ধার ঘেঁষে এগোল, এখান দিয়েই যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তখন কিশোর আর মুসা, পানি থাকায় পারেনি, কিন্তু এখন শুকনো, ববের যেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। পাথরের টিলার কাছে চলে এল, গোড়ায় নেই কেউ, ওপরে চড়ল, না, এখানেও নেই। ফিরে এল আবার সৈকতে, পানি থেকে দূরে একেবারে জঙ্গলের ধারে উঠে এল। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে কালো বনের দিকে। বসল। এরপর কি করবে, ভাবছে। পানি দরকার আগে, গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু পানি খুঁজতে যাওয়ার সাহস নেই, চাঁদের আলোয় অদ্ভুত আলোআঁধারির খেলা জায়গায় জায়গায়, নির্জন নীরব এই পরিবেশে সেদিকে তাকাতেই গা ছমছম করছে ববের। ভোরের জন্যে অপেক্ষা করবে ঠিক করল সে। ডান হাতের তালুতে চিবুক রেখে ভাবতে লাগল নানা কথা, শূন্য দৃষ্টি স্থির একটা পাথরের স্তূপের দিকে।

বসে আছে তো আছেই। এত দীর্ঘ রাত আর আসেনি তার জীবনে। ভাগ্য ভাল, বাতাস উষ্ণ, নইলে খালি গায়ে যেভাবে বসে আছে খোলা বাতাসে, এভাবে থাকতে পারত না কিছুতেই, খুব অসুবিধেয় পড়ে যেত। নিজের কক্ষ পথে নীরবে এগিয়ে চলেছে চাঁদ, ববের ডানে সৈকত ঘুরে চলেছে যেন, অবশেষে তার বাঁয়ের পাথরগুলোর ছায়া দূর হলো চাঁদের আলো পড়ে, নীলচে উজ্জ্বল একটা আভা ছড়াচ্ছে এখন।

এই দুরবস্থায় থেকেও ঢুলুঢুলু হয়ে এল তার চোখ এক সময়, ঠিক তখনই একটা পাথরকে নড়তে দেখল সে, নাকি কল্পনা? নাহ, কল্পনাই। যে অবস্থায় রয়েছে সে, তাতে চোখ উল্টোপাল্টা অনেক কিছুই দেখতে পারে, মানে, দেখেছে মনে হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই পুরো সজাগ হয়ে গেল সে, প্রতিটি স্নায়ু টানটান। পাথরটা সত্যিই নড়ছে, ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে একটা মানুষে, চোখ বড় বড় করে ওটার দিকে চেয়ে থেকে ভাবছে বব, সে স্বপ্ন দেখছে। হয় স্বপ্ন দেখছে, নাহয় ওই জিনিস, যাকে সব চেয়ে বেশি ভয় তার। ভূত! ভূত মনে করার কারণও আছে। যে মানুষটাকে দেখছে সে, সে আধুনিক মানুষের পোশাক পরা নয়। মাথায় ছিটকাপড়ের রুমাল জড়ানো, একটা কোণা ঝুলছে ঘাড়ের ওপরে। ফতোয়ার মত একটা জামা পরনে, বুকের কাছটায় সুতার পাকানো সরু দড়ি আড়াআড়ি বুনট, ঢোলা রঙিন পাজামার নিচের দিক ঢোকানো বুটের ভেতরে—রূপার বাকলেস লাগানো রয়েছে জুতোতে, চাঁদের আলোয় চকচক করছে। আরও একটা জিনিস চকচক করছে, সেটা তার হাতের মস্ত ভোজালি, চোখা মাথাটা ঠেকিয়ে রেখেছে একটা পাথরে।

হাঁ হয়ে গেছে বব, নিঃশ্বাস ফেলতে ভয় পাচ্ছে। আস্তে ঘুরল মূর্তিটা, তাকিয়ে রইল প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে যেখানে ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ছে, সেদিকে। তারপর যেমন নীরবে এসেছিল, তেমনি ভাবেই গায়েব হয়ে গেল আবার।

আর কোন সন্দেহ নেই ববের, ভূতই দেখেছে, শত শত বছর আগে অপঘাতে মরা কোন জলদস্যুর ভূত। সারাজীবন যা করেছে, মৃত্যুর পরেও সেই পেশাই বোধহয় বেছে নিয়েছে ভয়ংকর ওই জলদস্যু! কিন্তু আরেকবার ওটাকে দেখার অপেক্ষা করল না বব, লাফিয়ে উঠে ছুটল বালিয়াড়ি ধরে। আরেকটা বড় পাথরের

স্তূপ চোখে পড়ার আগে গতি কমাল না। কাঁধের ওপর দিকে ফিরে তাকাল। ভূতটা তাড়া করে আসছে না দেখে থামল, হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। বসে পড়ে জিরিয়ে নিল খানিকক্ষণ, চোখ সারাক্ষণ রয়েছে যেদিক দিয়ে সে এসেছে সেদিকে। ভূতটার ছায়া দেখলেই উঠে দৌড় দেবে আবার।

আর দেখা দিল না ভূত। জিরিয়ে নিয়ে উঠল বব। সামনের পাথরের ফাঁকফোকর দিয়ে গজিয়ে উঠেছে কয়েকটা নারকেল গাছ। যাক, পানি পাওয়া যাবে। একটা নারকেল জোগাড়ের আশায় পা বাড়াল সে নারকেল-কুঞ্জের দিকে।

গাছের গোড়ায় একটা নারকেল দেখে কাছে এসে উবু হতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল জিনিসটা, চাঁদের আলোয় চমকাচ্ছে ওটার শরীর। অবিশ্বাস্য। চোখ ডলে নিয়ে আবার তাকাল, না, আছে তো। ল্যাগুনের স্থির আলোয় ভাসছে একটা বিমান, চকচকে ডানায় জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়েছে ববের চোখে। একবারও মনে এল না তার, ওটাতে চড়েই রওনা দিয়েছিল, ওটা তাদেরই সেই উভচর সিকরস্কি। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ভাবল, প্লেনের লোকগুলো গেল কোথায়? নিশ্চয় আশেপাশেই কোথাও রয়েছে। সরে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজল, কিন্তু ল্যাগুনের ধারে খোলা ছোট্ট সৈকতে কাউকে চোখে পড়ল না। মনস্থির করে নিয়ে পা বাড়াতে যাবে, এই সময় একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল সে, ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর। কাছেই আছে মানুষটা। নাক ডাকাচ্ছে।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল বব। কি করবে? ডাকবে মানুষটাকে! প্লেনটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা ভাবনা ঝিলিক দিয়ে গেল তার মনে। নির্জন এই দ্বীপে এই সময়ে প্লেন আসে কি করে? সিকরস্কিটা নাতো? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো, চেনা চেনা মনে হচ্ছে এখন বিমানটাকে। আরও কয়েক মুহূর্ত পর আর সন্দেহ রইল না, ওটা সিকরস্কিই। আনন্দ চলে গেছে মন থেকে, তার জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে ভয়, সুযোগ দিলে ভয়টা আতঙ্কে রূপ নেবে। মন শক্ত করল সে। কি করবে? প্লেন চালাতে জানে না, যে ওটা নিয়ে পালাবে। তাহলে? হ্যাঁ, প্লেন চালাতে জানে না, কিন্তু নৌকা তো চালাতে পারে। রবারের ডিঙিটা নিয়ে চলে যেতে পারে কাছের অন্য কোন দ্বীপে, এমন কোনটায়, যেটাতে মানুষের বাস আছে। কিন্তু তার আগে লুকিয়ে দেখে নেবে, হ্যামার আর সঙ্গীরা কি করছে। পুবের আকাশ ফেকাসে হতে শুরু করেছে, মরে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতা, ভোরের দেরি নেই। যা কিছু করার করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, আলো ফোটার আগেই।

নিঃশব্দে গাছপালার আড়ালে আড়ালে ঘুরে এসে দাঁড়াল পাথরের স্তূপের আড়ালে। আস্তে করে মাথা উঁচিয়ে উঁকি দিল, যেদিক থেকে নাক ডাকার শব্দ আসছে সেদিকে। ঢিবঢিব করছে বুকের ভেতর। সামনে একটুখানি খোলা জায়গা। পাশাপাশি শুয়ে আছে ছয়জন। কিন্তু চারজন তো থাকার কথা। একজন নড়েচড়ে উঠল। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল বব। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সাবধানে আবার উঁকি দিল।

নড়ে উঠে এদিকে ফিরে শুয়েছে মূর্তিটা। খালি গা। চাঁদের আলো পড়েছে

মুখে। দেখেই চিনতে পারল তাকে বব। কিশোর! গলার কাছে চিৎকারটা প্রায় এসে গিয়েছিল ববের, কোনমতে থামাল। বুকের ভেতরে ঢিবঢিব বেড়ে গেছে। কিশোর, তারমানে তার পাশে শোয়া মূর্তিটা মুসার। বোঝা যাচ্ছে, দু'জনেরই হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে, তাদের পড়ে থাকার বেকায়দা ভঙ্গি দেখেই এটা স্পষ্ট।

সাহায্য করা দরকার ওদেরকে, কিন্তু কিভাবে? একটা ছুরির জন্যে এত আফসোস জীবনে আর কখনও করেনি বব। বাঁধনের গিঁট কি খুলতে পারবে? পারুক আর না পারুক, চেষ্টা করে দেখতেই হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। আকাশের দিকে তাকাল। ইস, এত তাড়াতাড়ি আলো ফুটছে কেন? মনেই পড়ল না, এই খানিক আগেও বার বার বলেছে, কেন আলো ফুটতে এত দেরি হচ্ছে। যা কিছু করার খুব দ্রুত করতে হবে, ডাকাতগুলো জেগে যাওয়ার আগেই।

পাথরের স্তূপের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে নেমে এল বব। কিশোরের চোখ মেলা, ববকে দেখছে চুপচাপ। জ্বলজ্বল করছে না? তাইতো মনে হয়, ভাবল বব। হাসল। তার হাসি কিশোরের চোখে পড়ল কিনা বোঝা গেল না।

কিশোরের পাশে এসে বসে পড়ল বব। পায়ের বাঁধনে হাত দিল। একবার চেষ্টা করেই দমে গেল। ভীষণ শক্ত করে বেঁধেছে। এই বাঁধন খুলতে অনেক সময় নেবে।

উঠে বসার চেষ্টা করছে কিশোর। বব ফিরে তাকাতেই ফিসফিস করে বলল, 'ক্ষুর!' মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে দেখাল।

দেখতে পেল বব। খানিক দূরে চিত হয়ে শুয়ে আছে এক বেশালদেহী নিগ্রো, নীল জামা গায়ে, তার ছড়ানো হাতের কাছে পড়ে রয়েছে একটা ক্ষুর।

উঠে এগোল বব। ক্ষুরটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, এই সময় খুলে গেল নিগ্রোর চোখ।

জঘন্য একটা মুহূর্ত একে অন্যের দিকে চেয়ে রইল ওরা। গাল দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল ম্যাবরি।

'পালাও, বব, দৌড় দাও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

চমক ভাঙল যেন ববের, স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল । কিন্তু তার আগেই ক্ষুর হাতে উঠে পড়েছে নিগ্রো, সাঁই করে হাত চালাল, অল্পের জন্য বাঁচল ববের গলাটা। লাগলে ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেত মুণ্ডু। আর কি দাঁড়ায় সে সেখানে! আতঙ্কে চেঁচিয়ে দৌড় দিল তাড়া খাওয়া পাহাড়ী ছাগলের মত। সৈকত ধরে ছুটছে, পেছনে তাকানোর সাহস নেই, কোথায় কোনদিকে যাবে জানে না, শুধু বুঝতে পারছে, বাঁচতে চাইলে নিগ্রোর হাতে পড়া চলবে না। ধরে জবাই করে ফেলবে তাকে খুনেটা।

একটা পাহাড়ে উঠে পড়ল বব, উঠে চলল দ্রুত। পেছনে গুলির শব্দ হলো, ববের পায়ের কাছ থেকে উঠে গেল এক খাবলা মাটি। আরেকটা গুলি লাগল প্রথমটার কাছেই, আরেক খাবলা মাটি উড়ল। থামলো না বব। বড় একটা খাদের কাছে এসে থমকে দাঁড়াতেই হলো অবশেষে। সামনে যাওয়ার পথ নেই। ফিরে তাকিয়ে দেখল, উঠে আসছে নিগ্রো।

ঘুরে এক পাশে ছুটল আবার বব। ঢুকে পড়ল ঘন জঙ্গলে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই বুঝল, ভুল জায়গায় ঢুকেছে। ঘন হয়ে জন্মানো লিয়ানা লতা আর কাঁটাঝোপের ভেতরে ছুটে চলা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আবার বেরিয়ে এসে বাঁ দিক দিয়ে খাদটা ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করল। জানে না, এটা সেই জায়গা, হ্যামারের তাড়া খেয়ে তার বাবাও একদিন যেদিক দিয়ে ছুটেছিল।

খাদ ঘুরে ছুটল বব, তাড়া করে আসছে নিগ্রো, অনেক কাছে এসে পড়েছে। ছুটতে ছুটতে আবার বাধা পড়ল সামনে। জঙ্গলে ঢাকা একটা শুকনো খাঁড়িমত রয়েছে। ওটায় নেমে লুকিয়ে পড়া যায় না? এদিক ওদিক তাকাল সে। ছোট-বড় কয়েকটা গুহা চোখে পড়ল। সময় নেই। একটা গর্তে প্রায় লাফিয়ে নামল সে, ঢুকে বসে পড়ল। হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল, যাতে হাঁপানোর শব্দ শোনা না যায়।

খাঁড়ির পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ম্যাবরি, শব্দ শুনে বুঝতে পারল বব। এগিয়ে আসতে শুরু করল পাশের শব্দ, ববের গর্তটার দিকেই এগোচ্ছে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে বব। আর রক্ষা নেই, ধরা বুঝি পড়তেই হবে। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে পায়ের শব্দ, নিশ্চয় কোন গর্তের কিনারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখে নিচ্ছে ম্যাবরি।

ববের গর্তটা বড় জোর পাঁচ কি ছয় ফুট গভীর, কিনারে এলে তাকে দেখতে পাবে ম্যাবরি। কিন্তু চুপ করে বসে থাকা ছাড়া এখন আর কিছু করারও নেই।

এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ, ম্যাবরির ভারি শ্বাস ফেলার শব্দও কানে আসছে এখন। আসছে···আসছে···তারপর থেমে গেল। ওপরে তাকাতে সাহস হচ্ছে না ববের, তবুও তাকাল। তার দিকেই চেয়ে রয়েছে নিগ্রোটা। দাঁত বের করে নীরবে হাসছে। ভয়ংকর ভঙ্গিতে হাতের তালুতে শান দিচ্ছে ক্ষুর।

গর্তের কিনারে লম্বা হয়ে শুয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল নিগ্রো। ববের চুল খামচে ধরে টান দিল। চিৎকার করে উঠল বব, ছটফট করছে, ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। চুল ছেড়ে তার ঘাড় চেপে ধরে টেনে তুলে আনছে ম্যাবরি, জবাই করার জন্যে ছাগলের বাচ্চাকে তুলছে যেন।

গর্তের বাইরে ববকে বের করে আনল ম্যাবরি। দাঁড় করিয়ে দিয়ে চুল খামচে ধরল আবার, টান দিয়ে মাথা পেছনে বাঁকা করতেই গলা ঠেলে এল সামনে। ক্ষুর চালানোর সুবিধে হবে। হাসিতে উজ্জ্বল ম্যাবরির মুখ চোখ জ্বলজ্বল করছে। ক্ষুর সোজা করল সে, এগিয়ে আনল ধীরে ধীরে। গলায় বসিয়ে হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মারবে। আতঙ্কে হাত দিয়ে গলা রক্ষা করার কথাও ভুলে গেছে বব, সম্মোহিতের মত চেয়ে রয়েছে নিগ্রোর চোখের দিকে।

ঠা-শ্-শ্ করে একটা শব্দ হলো। বব মনে করল, চাপের চোটে তার ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেছে। কিন্তু ব্যথা পাচ্ছে না কেন? ক্ষুরই বা চালাচ্ছে না কেন নিগ্রোটা? আরে, চেহারা দেখি বদলে গেছে ব্যাটার হঠাৎ করে! হাসি মুছে গেছে। কেঁপে উঠল ম্যাবরির শরীর, হাত থেকে খসে পড়ে গেল ক্ষুর, পাথরে পড়ে শব্দ তুলল, ববের কানে মধুর বাজনার মত শোনাল সে শব্দ। তিন কি চার সেকেণ্ড ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল নিগ্রোটা, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল পাথরের ওপর।

চোখের সামনে থেকে বাধা সরে যেতেই লোকটাকে দেখতে পেল বব,

ম্যাবরির ঠিক পেছনেই। ধরেই নিল বব, মরে গেছে সে, মৃতের রাজ্যে ঢুকে পড়েছে, তাই এমন সব আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখতে পাচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই জলদস্যুর ভূত, বাঁ হাতে জোজালি, ডান হাতে ধরা শত শত বছরের পুরানো পিস্তলের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

বোবা হয়ে চেয়ে আছে বব। তার মগজ কাজ করতে চাইছে না যেন। কিন্তু একে একে দ্বিধার সমস্ত গিঁট ছাড়াল মগজ, খাপে খাপে বসিয়ে দিল সবকিছু।

চেঁচিয়ে উঠল বব, 'আপনি!'

তিন

ডুবতে ডুবতেও ভেসে রইল বিমানটা। দূর থেকে দেখে মুসা কিংবা কিশোর যতখানি খারাপ ভেবেছে, ঠিক ততখানি খারাপ অবস্থায় নেই ওমর। কারণ সহজে ডুববে না বিমান, ভেতরে বাতাস ঢুকে আটকে গেছে, ভেসে রয়েছে ওই বাতাসের জন্যেই। ছোট একটা উপদ্বীপ বা পাথরের অনেক বড় স্তূপ, যা-ই বলা যাক, ওটার দিকে ভেসে চলেছে বিমান, মূল দ্বীপের এক মাথা থেকে বড়জোর শ'দুয়েক গজ দূরে, তার পরে খোলা সাগর।

উদ্বিগ্ন হয়ে উপদ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওমর। আশা, যদি কোনভাবে ওটাতে উঠে ঢেউ ছাড়িয়ে ওপরে উঠে যেতে পারে, তো বেঁচে যাবে এযাত্রা। তারপর ঝড় কমলে সাঁতরে চলে যেতে পারবে মূল দ্বীপে। কিন্তু কাছে যাবে কি বিমানটা?

যেতে পারে, না-ও পারে, ফিফটি ফিফটি চান্স। একবার তো উপদ্বীপের একেবারে কয়েক গজের মধ্যে চলে এল, কিন্তু ওমর ঝাঁপ দিয়ে পড়ার আগেই বিপরীতমুখী স্রোতের টানেই হোক, কিংবা বাতাসের ঝাপটায়ই হোক, দ্রুত সরে চলে এল আবার। খানিক পরে আবার এগোল বিমান, আবার পিছিয়ে এল। তারপর আবার এগোতে শুরু করল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওমর, ঝুঁকিটা নেবে, ঝাঁপ দিয়েই পড়বে পানিতে, তারপর সাঁতরে তীরে ওঠার চেষ্টা করবে, এছাড়া উপায় নেই। ও যা ভেবেছে—, উপদ্বীপের একেবারে গায়ে বাড়ি খাবে বিমান, তা হবে না। বেশি সুবিধার জন্যে অপেক্ষা করলে শেষে আর কাছে না গিয়ে যদি স্রোতের টানে খোলা সাগরে ভেসে যায়, তাহলে সামান্য যে সুযোগ আছে, সেটাও মিলবে না।

তৃতীয়বার কাছাকাছি হতেই ঝাঁপ দিল ওমর। প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরাতে শুরু করল। কোনমতে এসে ধরে ফেলল বেরিয়ে থাকা একটা চোখা পাথর। ঢেউ আসছে, শব্দ শুনেই বুঝতে পারছে। লম্বা শ্বাস টেনে নিয়ে দম বন্ধ করে জোরে প্রায় জড়িয়ে ধরে রইল পাথরটা। এসে গেল ঢেউ, চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। কিন্তু সরার নাম নেই আর। দম ফুরিয়ে আসছে, বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস, আর পারছে না সে। সরল ঢেউ। এত জোরে টান দিল, ওমরের মনে হলো, গোড়া থেকে তার বাহু দুটো ছিঁড়ে শরীরটা নিয়ে চলে যাবে পানি। কিন্তু তার প্রচণ্ড মনোবলের কাছে হার মানল ঢেউ, নিতে পারল না।

ঢেউ সরে যেতেই পাথর ছেড়ে দিল ওমর, বুক সমান পানিতে এখন সে, টান

পুরোপুরি কমেনি। আবার হাত-পা ছুঁড়ে অবশেষে উঠে এল উপদ্বীপে। পাথর ধরে ধরে উঠল ওপরে, ঢেউয়ের নাগালের বাইরে এসে ধপাস করে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে শরীর।

কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়ে রইল ওমর। জিরিয়ে নিয়ে উঠে বসে তাকাল। উপদ্বীপে সাগরের দিকটায় উঠেছে সে। উঠতে শুরু করল চূড়ায়, ওখান থেকে দেখা যাবে মূল দ্বীপটা, মুসা আর কিশোরকে দেখতে পাওয়ার আশাও করছে।

কিন্তু চূড়ায় পৌঁছার আগেই অবাক হতে হলো তাকে। হঠাৎ আবিষ্কার করল, যে পাথর ধরে ধরে উঠে যাচ্ছে সে, ওগুলোতে মানুষের অস্ত্র লেগেছে। বড় পাথর কেটে ছোট ছোট বিভিন্ন আকারের টুকরো করে সেগুলো দিয়ে একটা বুরুজ মত বানানো হয়েছে। বুরুজের ওপরে ওঠার পথ খুঁজে বের করল সে। উঠে এল। অবাক হয়ে দেখল, পুরানো আমলের একটা দুর্গের ভাঙা চত্বরে উঠে এসেছে। গোটা ছয়েক পুরানো কামানও বসানো রয়েছে, কয়েকটা সাগরের দিকে মুখ করা, কয়েকটা ডাঙার দিকে। কাঠের বড় বারকোশে জমিয়ে রাখা হয়েছে বড় বড় গোলা, কামানের গোলা। দুর্গটা তৈরি হয়েছিল নিশ্চয় সেই আমলে, যখন বাক্যানিয়ারদের সঙ্গে স্প্যানিশদের যুদ্ধ চলছিল।

চত্বরের এক ধার থেকে ধাপে ধাপে নেমে গেছে সিঁড়ি, পাহাড়ের ভেতরে ঢুকেছে। ভেতরে কি আছে, দেখার কৌতূহল হচ্ছে বটে, কিন্তু দেখতে যাওয়ার সময় এটা নয়। উঠে এল একেবারে চূড়ায়, এখান থেকে মূল দ্বীপ দেখা যায়। সৈকত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যতদূর চোখ যায় জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। মুসা আর কিশোরের কি হলো? নিচে তাকাল ওমর। দ্বীপে আর উপদ্বীপের মাঝের সরু প্রণালীতে এখন উথাল-পাতাল ঢেউ, ভীষণ অবস্থা। এখন ওটা সাঁতরে পেরোনোর চেষ্টা আত্মহত্যার সামিল। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

মন খারাপ হয়ে গেছে ওমরের। ববকে হারিয়েছে, কোন সন্দেহ নেই। মুসা আর কিশোরের কি হয়েছে, বুঝতে পারছে না। দু'দুটো বিমান হারিয়ে সে আটকা পড়েছে এক দ্বীপে, সঙ্গে খাবার নেই, পানি নেই, অস্ত্র নেই।

আলো কমছে দ্রুত, শিগগিরই অন্ধকার হয়ে যাবে। ঝড় থেমেছে, কিন্তু সাগরের ফোঁস ফোঁস বন্ধ হয়নি। প্রণালীটা সাঁতরে পেরোনোর সময় হয়নি এখনও, দেরি আছে। দিগন্তে হঠাৎ করে উদয় হলো সূর্য, কালো মেঘের ফাঁকে। লালচে আলো ছড়িয়ে পড়ল মূল দ্বীপের চন্দ্রাকৃতি মাথায়, রাঙিয়ে লাল করে দিল। অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু দেখার মন নেই ওমরের। সে ভাবছে কিশোর আর মুসার কথা। কি হলো ওদের? বেঁচে আছে তো? নাকি ববের মত তাদেরকেও নিয়ে গেছে উন্মত্ত সাগর?

খামোকা বসে থাকার চেয়ে আশপাশটা ঘুরে দেখা উচিত মনে করল ওমর। যেখানে বসে আছে, ওখান দিয়ে নামতে পারবে না প্রণালীতে, খাড়া পাহাড়। ঢালু জায়গা বের করতে হবে। নেমে চলে এল আরেক দিকে। আরে, সিঁড়ি যে একেবারে তৈরিই করে রেখেছে। মালপত্র নিয়ে জাহাজ আসত, সেসব মালপত্র তোলার জন্যেই তৈরি হয়েছিল এই সিঁড়ি। হঠাৎই মনে পড়ল তার, পানি। নিশ্চয় পানি

রাখার ব্যবস্থা আছে কোথাও দুর্গে। এসব পাথুরে জায়গায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্যে ট্যাংক খোঁড়া হয় পাথরের তলায়, একটা বা বেশ কয়েকটা নালা কেটে পথ করে দেয়া হয়, সেই পথ দিয়ে গিয়ে বৃষ্টির পানি জমা হয় ট্যাংকে। পানির কথা মনে হতেই তৃষ্ণা টের পেল সে, এতক্ষণে খেয়াল করল, নোনা পানি শুকিয়ে চড়চড় করছে মুখ। ঠিক আছে, আগে পানির খোঁজই করবে। আবার সেই চত্বরে চলে এল সে, যেখানে কামানগুলো রয়েছে, যেখানে একপ্রান্ত থেকে সিঁড়ি নেমে ঢুকেছে পাহাড়ের গভীরে।

সিঁড়ি বেয়ে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল সে। যতই নামছে, বাড়ছে অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যায় না। খুব সাবধানে এক পা এক পা করে বাড়িয়ে দিয়ে নেমে চলল। যতক্ষণ সিঁড়ি আছে, নামবে, তারপর কিছু না পেলে ফিরে উঠে আসবে। কিন্তু আরও কয়েক ধাপ এগোতেই আলো চোখে পড়ল। খুব কায়দা করে সুড়ঙ্গ কেটে আলো আনার ব্যবস্থা হয়েছে। আলো আনার জন্যেই, না-কি অন্য কোন ব্যাপার? যা-ই হোক, পরে দেখা যাবে। আপাতত বড় একটা কামরায় এসে ঢুকেছে সে। পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে এই পাতালকক্ষ। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওমরের। অদ্ভুত এক অনুভূতি। লাফ দিয়ে কয়েকশো বছর পেরিয়ে অতীতে চলে এসেছে যেন সে। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে ঘরের ভেতরটা।

অনুমান করল ওমর, চল্লিশ ফুট চওড়া আর চল্লিশ ফুট প্রশস্থ হবে কামরাটা। ঘরের জিনিসপত্রের অবস্থা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, কোন কারণে খুব তাড়াহুড়ো করে ঘর ছেড়েছিল এর অধিবাসীরা, সোজা কথা, পালিয়েছিল। পুরানো আমলের একগাদা কাপড় স্তূপ হয়ে পড়ে আছে এক কোণে। লুপহোলে আটকানো একটা তামার সুইভেল-গানের ওপর পড়ে আছে কিছু কাপড়। এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে দু'টো কঙ্কাল, পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় খুব কষ্ট পেয়ে মরেছিল। একটা কঙ্কালের হাতের আঙুলের কাছে পড়ে রয়েছে মস্ত এক ভোজালি। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা পিস্তল আর মাসকেট বন্দুক। আর আছে ছ'টা পিপে। দেখা গেল, চারটে পিপেতে খাবার ছিল—তিনটেতে মাংস, শুকনো হাড়গুলো শুধু অবশিষ্ট রয়েছে আরেকটাতে ময়দা—নষ্ট হয়ে গেছে। বাকি দুটোতে ছিল বারুদ, কিছু তলানি এখনও আছে। ঘরের আরেক কোণে ধুলোয় ঢাকা পড়ে আছে ছোট গোল মার্বেলের মত কিছুর স্তূপ। এক মুঠো হাতে নিয়েই আবার ফেলে দিল ওমর। ওজনেই বোঝা গেছে কি জিনিস। গুলি। মাসকেটের হতে পারে, কিংবা সুইভেলগানের। কিন্তু পানির ট্যাংকের কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না।

আবার কঙ্কাল দুটোর দিকে তাকাল সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। কারা ওরা? বাড়ি কোথায়? কি কারণে এসেছিল এখানে? কোন দিনই জানবে না হয়তো, জানবে না কেউই। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ঘুরে এগোল সিঁড়ির দিকে। মাঝপথে থেমে কি ভাবল, তারপর ফিরল কাপড়ের স্তূপের দিকে। প্রায় উলঙ্গ হয়ে রয়েছে সে। কাপড় যখন আছে, কেন পরবে না? বাইরে বেরোলেই হয়তো ছেঁকে ধরবে মশার পাল, খালি গায়ে থাকলে অতিষ্ঠ করে ফেলবে।

বেছে বেছে একটা ফতোয়ার মত পোশাক তুলে নিল সে, বুকের কাছে সুতোর

দড়ির জালি। লালচে একটা পাজামা নিল, আর একটা ছিট কাপড়ের রুমাল। পুরানো, নোনা গন্ধ, কিন্তু গন্ধটা আপাতত সহ্য করল ওমর। খোলা বাতাস আর রোদ লাগলে চলে যাবে গন্ধ, আঠা আঠা ভাবটাও থাকবে না। আর তেমন বুঝলে ধুয়ে নিতে পারবে যখন-তখন। কাপড় যখন পাওয়া গেছে, খালি গায়ে থাকার কোন মানে হয় না।

কাপড়গুলো পরে নিয়ে খুঁজে খুঁজে পায়ের মাপমত একজোড়া বুট বের করল। একটু টুকরো তারপুলিনও পাওয়া গেল। ওমরের মুখে ফুটেছে অদ্ভুত হাসি। একটা পিস্তল তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল, ঠিকই আছে মেকানিজম। কয়েকবার স্লাইড টেনে ট্রিগার টিপে হ্যামারের আঘাত দেখল, নাহ্, গুলি ফাটাতে পারবে মনে হচ্ছে। কিছু গুলি নিল। বারুদ রাখার বিশেষ বোতলে ভরতি করে নিল বারুদ। এক সময় নরম চামড়া দিয়ে তৈরি হয়েছিল বোতলটা, এখন লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে, তবে কাজ চলবে। আর কিছু নেয়ার আছে? আছে, তবে তারপুলিনে বাঁধতে হবে না। পিস্তল, গুলি, জুতো আর বারুদের বোতল তারপুলিনে রেখে কোণাগুলো এক করে পোঁটলা বাঁধল। কঙ্কালের হাতের কাছে পড়ে থাকা ভোজালিটা নিয়ে গুঁজল কোমরে। তারপর পোঁটলাটা হাতে ঝুলিয়ে পা বাড়াল আবার সিঁড়ির দিকে। মুখে হাসি।

বাইরে বেরিয়ে দেখল, অনেক নেমে গেছে পানি। খুব সহজেই পেরোতে পারবে এখন প্রণালী। সুবিধামত একটা দিক খুঁজে বের করল। নিচু একটা দেয়াল ডিঙিয়ে যেতে হবে। পেরিয়ে এল সহজেই। পানিতে নামল।

চিত-সাঁতার দিয়ে এগুলো ওমর, দু'হাতে উঁচু করে ধরে রেখেছে পোঁটলাটা, যাতে পানি না লাগে। সহজেই পেরিয়ে এল প্রণালী, পোঁটলা ভিজল না। তীরে উঠে পরনের কাপড় খুলে চিপে পানি ঝরিয়ে নিয়ে আবার পরল।

চাঁদ উঁকি দিচ্ছে দিগন্তে। চারদিক বড় বেশি নীরব, শান্ত। বনের দিকে তাকাল। কি বিপদ লুকিয়ে রয়েছে ওই গাছের দঙ্গলের মধ্যে? জানে না। সাবধান থাকা দরকার। পোঁটলা খুলে আগে গুলি আর বারুদ ঠাসল পিস্তলে। বুট পরে পাজামার নিচের দিক গুঁজে দিল বুটের ভেতর। তারপুলিন দিয়ে বোতলটা বেঁধে নিল কোমরের সঙ্গে। তারপর পিস্তল আর ভোজালি হাতে চলল শেওলায় ঢাকা পাথরটা খুঁজতে, যেটার ওপর নামতে চেয়েছিল কিশোর আর মুসা।

পাথরটার আশপাশ খুঁজল ওমর। বালিতে পড়ে থাকা ববের জ্যাকেটা দেখতে পেল। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না। এগিয়ে চলল আবার এক দিকে। খানিক দূর এগোনোর পর সামনে দেখতে পেল পাথরের স্তূপ। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখল। ভাবল, ওদিকে যেতে পারবে না মুসা কিংবা কিশোর, আবার ফিরল সে। ফিরে এল সৈকতে, যেখানে উঠেছিল প্রথমে। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই কয়েকটা নারকেল পেয়ে গেল, ঝড়ে গাছ থেকে খসে পড়েছিল সাগরে, ঢেউ আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেছে তীরে। ভোজালি দিয়ে নারকেল কেটে আগে পানি খেল, তারপর ধীরেসুস্থে খেল ভেতরের নরম মিষ্টি শাঁস। পেটে কিছু পড়তেই ক্লান্তি এসে চেপে ধরল। চিত হয়ে ওখানেই শুয়ে পড়ল সে।

কিন্তু এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম এল না চোখে। ভাবছে। কি হলো ছেলে দুটোর? বেঁচে আছে ওরা? নানারকম দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করল মনে। ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার কানে আসতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ওমর। চোখ মিটমিট করছে, কোথায় আছে বুঝতে পারছে না। দু'য়েক সেকেণ্ড লাগল পূর্ণ সচেতনতা ফিরে আসতে। একটা শব্দ সে শুনেছে নিশ্চয়, কিসের শব্দ? এদিক ওদিক তাকাল, দৃষ্টি আটকে গেল পঞ্চাশ গজ দূরে। পাহাড়ের ওপরে উবু হয়ে বসে কি যেন তোলার চেষ্টা করছে বিশালদেহী এক নিগ্রো। কৌতূহল হলো, উঠে পায়ে পায়ে এগোল সেদিকে ওমর।

একটা ছেলেকে তুলে আনল নিগ্রো, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না ওমর। বব! নিগ্রোর হাতে কি যেন চকচক করছে। চকিতে মনে পড়ে গেল ওমরের, ক্ষুর, ম্যাবরি। ছুটল সে নিঃশব্দে।

দশ গজ দূরে থাকতে থমকে দাঁড়াল ওমর। আর দেরি করা যায় না। পিস্তল তুলে নিশানা ঠিক করে দিল ট্রিগার টিপে। গুলি ফুটবে কিনা, অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু ফুটল গুলি।

আবার দৌড় দিল ওমর। ছুটতে ছুটতেই দেখল টলে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ম্যাবরি।

চার

ঝুঁকে ববের হাত ধরে তাকে টেনে তুলল ওমর। 'লেগেছে কোথাও?...ইস্, বড় সময়মত এসে পড়েছিলাম, আরেকটু দেরি করলেই...'

মাথা ঝোঁকাল বব। কথা বলতে পারছে না।

পুব আকাশ লাল হয়ে আসছে।

হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে বব, তার কাঁধ চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল ওমর, 'আরে, কি করছ? মূর্ছা যাওয়ার সময় হলো এটা?...সোজা, সোজা হও।'

মলিন হাসি হাসল বব। 'সরি।' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। পা কাঁপছে। বাঁচব ভাবিনি।'

'হ্যাঁ, মস্ত ফাঁড়া গেছে,' বলল ওমর। চোখ পড়ল একটা জিনিসের দিকে। 'আরে, দেখো! দেখেছ?'

দেখল বব। নিগ্রোর ডান হাতের আঙুলের কয়েক ইঞ্চি দূরে পড়ে রয়েছে ছোট্ট গোল সোনালি একটা জিনিস, মোহর। সেই ডাবলুনটা।

'বলেছিলাম না,' ওমর বলল, 'মোহরটা অভিশপ্ত। যার হাতেই যায়, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে। ববকে মোহরটার দিকে এগোতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'না না, ছুঁয়ো না! ছুঁয়ো না!'

'এখানে ফেলে যাব?'

মাথা নাড়ল ওমর, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। 'এখানে নয়, চোখের আড়ালে। ওটাকে দেখলেও ক্ষতি হতে পারে, জিনের আসর আছে ওটাতে,' মোহরটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। এক লাথি দিয়ে ফেলে দিল একটা গর্তে,

এটাতেই লুকিয়েছিল বব। গড়িয়ে গড়িয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল মোহরটা। বিড়বিড় করে বলল ওমর, 'যাক, গেল আপদ।' ববের দিকে ফিরল। 'তোমাকে আবার দেখব, আশা করিনি, বব। খুব খুশি লাগছে। মুসা আর কিশোরের যে কি হলো?'

'আমি দেখেছি ওদের!' জানাল বব। 'ওদের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছিলাম। ওই সময় এই লোকটা জেগে উঠে তাড়া করল!'

'বেঁচে আছে ওরা? ইয়াল্লাহ্!' অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে এল ডাকটা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওমর।

'আছে, তবে বন্দি,' বলল বব।

'বন্দি?'

সংক্ষেপে সব কথা জানাল বব।

ববের কথা শেষ হতে আরেকবার লম্বা শ্বাস ফেলল ওমর। 'মুক্ত করতে হবে ওদের। চলো, এখুনি।'

নিগ্রোর দেহটা দেখাল বব। 'এটার কি হবে?'

'ওর সৎকার করার সময় নেই এখন,' ঠাণ্ডা ওমরের কণ্ঠ, 'ওর দোস্তরাই যা করার করবে।' কথা বলতে বলতেই আবার গুলি আর বারুদ ঠেসে নিল পিস্তলে। 'ক্ষুরটা নাও। মুসা আর কিশোরের বাঁধন কাটা যাবে।'

'ওমরভাই, এই কাপড় পেলেন কোথায়?' আর জিজ্ঞেস না করে পারল না বব। 'বুঝতে পারছি, গতরাতে আপনাকেই দেখেছিলাম,' চাঁদের আলোয় ভূতের ভয়ে ছোটার কথা মনে পড়তেই হেসে ফেলল। 'জলদস্যুর ভূত ভেবেছিলাম।'

ওমরও হাসল। 'পুরানো একটা দুর্গ আছে, উপদ্বীপে। এসব জিনিস ওখানেই পেয়েছি। কিন্তু এখন সব কথা বলার সময় নেই। কিশোর আর মুসাকে ছাড়িয়ে আনা দরকার। এসো, যাই।'

'পুরো দলটাকে আক্রমণ করবেন?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল বব, সৈকত ধরে চলেছে ওরা ল্যাগুনের উদ্দেশে।

'জানি না। লুকিয়ে থেকে আগে দেখব অবস্থা, পরিস্থিতি বুঝে যা করার করব,' বলল ওমর। 'প্রয়োজন হলে আক্রমণ করতেই হবে। তবে একটা লোককে নিয়ে সমস্যা, ইমেট চাব। রিভলভারে হাত নাকি তার খুবই ভাল। আমার এটা আদিম পিস্তল। এ-জিনিস নিয়ে ওর মুখোমুখি হতে পারব না। এটা হাতে আছে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, এই আর কি। বারো গজ দূর থেকে নিশানা ঠিক রাখা যাবে না...,' থমকে গেল সে হঠাৎ। 'কে জানি আসছে?'

সামনে একটা পাথরের স্তূপের ওপাশ থেকে আসছে শব্দ। স্তূপটার ওপর উঠে সাবধানে উঁকি দিল ওমর। পরক্ষণেই লাফিয়ে নেমে ববের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'জলদি! জঙ্গলে!'

ববকে টেনে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওমর। কাঁটার খোঁচায় দু'জনেরই চামড়া ছিঁড়ে গেল জায়গায় জায়গায়।

'কী?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বব।

'ইমেট চাব বোধহয়, হাতে রিভলভার। হ্যাঁ, ও-ই। এদিকে আসছে, নিগ্রোটাকে খুঁজছে, কিংবা হয়তো গুলির শব্দ শুনে সন্দেহ করেছে। চুপ করে থাকো।'

'ও দলছুট হলে আমাদের জন্যে ভালই,' ফিসফিস করে বলল বব।

মাথা নোয়াল ওমর। ঠোঁটে আঙুল রাখল। 'শ্‌শ্‌শ্‌।'

গাছের আড়াল থেকে ইমেট চাবকে দেখতে পাচ্ছে দু'জনে। পাথরের স্তূপটার চূড়ায় উঠে মুখ ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখল সে। চেঁচিয়ে ডাকল, 'ম্যাবরি। এই ম্যাবরি।' তারপরই দেখতে পেল পাহাড়ের ওপর পড়ে থাকা নিগ্রোকে। গাল দিয়ে উঠে স্তূপ থেকে নেমে ছুটল সেদিকে।

'এসো, এই আমাদের সুযোগ,' উঠে দাঁড়াল ওমর। জঙ্গলের ভেতর দিয়েই কোনমত পথ করে এগোল। ইচ্ছে, গাছ-পালার আড়ালে আড়ালে পাথরের স্তূপটার পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ওপাশে। তাহলে আর তাদেরকে দেখতে পাবে না ইমেট চাব।

কিন্তু যে পরিমাণ লতা আর কাঁটা, নিঃশব্দে এগোনো অসম্ভব, এর ভেতর দিয়ে এগোনো সাংঘাতিক কঠিন। যতটা সম্ভব কম আওয়াজ করে এগোল ওরা।

স্তূপটার পাশ কাটিয়ে এসে ঝোপ সরিয়ে মুখ বের করল ওমর। ববকে জিজ্ঞেস করল, 'শেষ কোন্ জায়গায় দেখেছিলে ওদের?'

আরেকটা পাথরের স্তূপ দেখাল বব। পাথর আর ভূমিধস নেমেছিল ওখানে কোন আদিমকালে, নারকেল গুচ্ছ গজিয়েছে এখন। 'ওটার ওপাশে।'

'এসো। ইমেট চাব আসার আগেই কাজ সারতে হবে আমাদের,' পাশে তাকিয়ে ইমেট চাব আসছে কিনা দেখল। 'দৌড় দাও।'

নিরাপদেই ভূমিধসটার কাছে চলে এল ওরা। আরেকবার পেছনে তাকিয়ে দেখল ওমর, ইমেট চাবকে দেখা যাচ্ছে না। 'বব, এবার তোমার পালা। এখুনি মুক্ত করতে না পারলে আর কখনও পারব না। পিস্তল দেখিয়ে আটকে রাখব আমি বারডু আর হ্যামারকে। তুমি কিশোর আর মুসার বাঁধন কাটবে। মাথা নিচু রাখবে, যে কোন সময় গোলাগুলি শুরু হতে পারে। যা-ই ঘটুক, তুমি কোন দিকে তাকাবে না, ওদের বাঁধন না কাটা পর্যন্ত। ওদেরকে ছাড়াতে পারলেই প্লেনটা আবার দখল করব। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

'গুড। এসো, যাই।'

এক হাতে পিস্তল আরেক হাতে ভোজালি নিয়ে পাথরের দ্বিতীয় স্তূপটার চূড়ায় উঠে গেল ওমর। শক্ত করে ক্ষুর চেপে ধরে বব অনুসরণ করল তাকে। বিমানটা দেখা যাচ্ছে, সৈকতে পড়ে থাকা রবারের ডিঙিটাও, কিন্তু মানুষ নেই।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ববের দিকে তাকাল ওমর।

আরও কয়েকটা বড় পাথর দেখিয়ে বলল বব, 'ওগুলোর ওপাশে। ওখানেই ক্যাম্প করেছে ব্যাটারা!'

নিঃশব্দে নেমে এল ওরা স্তূপের ওপর থেকে। নরম বালি মাড়িয়ে কুঁজো হয়ে

ছুটল। বড় পাথরগুলোর কাছে এসে আস্তে করে উঁকি দিল। বড় জোর ছয় কদম দূরেই রয়েছে ওরা। পায়ের ওপর পা রেখে আরাম করে বসে একটা টিন থেকে কি নিয়ে খাচ্ছে হ্যামার। কিশোর আর মুসার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তেমনি পড়ে রয়েছে মাটিতে। সিডনি বারডুকে দেখা যাচ্ছে না।

পিস্তল নিশানা করল ওমর। হেঁকে বলল, 'হাত দুটো তোলো, মিস্টার হ্যামার। শয়তানী করলেই খুলি উড়িয়ে দেব। সন্দেহ থাকলে চেষ্টা করে দেখতে পারো।' ববের দিকে ফিরে নিচু গলায় বলল, 'যাও।'

ফিরে তাকাল হ্যামার, এতোই অবাক হয়েছে, হাস্যকর দেখাচ্ছে তার গরিলার মত মুখটা। কোনরকম শয়তানীর চেষ্টা করল না সে। হাত থেকে টিনটা ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলল দুই হাত।

শান্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে হ্যামারের মাথার পেছনে পিস্তল ঠেকাল ওমর। 'শান্ত থাকো।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বারডুকে খুঁজল। নেই। তাকাল ববের দিকে, মুসার বাঁধন কাটা সারা, কিশোরের বাঁধন কাটছে দ্রুত হাতে।

মুক্ত হয়েও দাঁড়াতে পারল না কিশোর। গোড়ালি ডলছে, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ।

কঠিন হয়ে গেল ওমরের মুখ। 'বব। এদিকে এসো।'

দৌড়ে এল বব।

'পিস্তলটা ধরো,' বলল ওমর। 'ব্যাটা একটু নড়লেই দেবে ট্রিগার টিপে।' ববের হাতে পিস্তল ধরিয়ে দিয়ে হ্যামারের পকেট হাতড়াতে শুরু করল সে।

একটা রিভলভার পাওয়া গেল, বাঁ হাতে নিল সেটা। দরকার নেই, তবু কি ভেবে নকল ম্যাপটা বের করে নিজের পকেটে রাখল। তারপর উঠে গেল মুসা আর কিশোরের কাছে। কিশোর তো পারছেই না, মুসাও দাঁড়াতে পারছে না ঠিকমত। কব্জি আর গোড়ালি ডলছে। দীর্ঘ সময় রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সাংঘাতিক ফুলে উঠেছে জায়গাগুলো। ওদের ঠিক হতে আরও কয়েক মিনিট লাগবে।

'ঠিক আছে, বসো,' হাত তুলে বলল ওমর। 'ভালমত ডলো। বেশি দূর না, ডিঙিটার কাছে যদি যেতে পারো, তাহলেই চলবে। জানিও, কখন পারবে।'

'বিমানটা দখল করবেন আবার, না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নিশ্চই,' সঙ্গে সঙ্গে বলল ওমর। 'আমাদের জিনিস···,' থেমে গেল সে। ঝট করে মাথা ফেরাল বিমানটার দিকে।

স্টার্ট নিয়েছে উভচরের ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল প্রবাল প্রাচীরের দিকে। এক পাশের খোলা মুখ দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে খোলা সাগরে। জানে লাভ নেই, তবু দৌড় দিল ওমর। কিন্তু দশ পা এগোতে না এগোতেই গতি বেড়ে গেল বিমানের, পানিতে ঢেউ তুলে ছুটে গেল দ্রুত গতিতে।

বন্ধুদের কাছে ফিরে এল ওমর। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'বারডু হারামজাদা। একবারও ভাবিনি ও প্লেনে উঠে বসে আছে।'

শূন্যে উঠল উভচর। উৎফুল্ল চোখে সেটার দিকে চেয়ে রইল হ্যামার।

রেগে গেল ওমর আরও। চোখের পাতা কাছাকাছি হলো। 'দাঁড়াও, শয়তানের

বাচ্চা, তোমার নিজের ওষুধই তোমাকে দেব। আশা করি অসুবিধে হবে না,' প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করছে বেদুঈনের চোখ। 'মুসা, উঠতে পারবে? দড়ি দিয়ে ব্যাটার হাত-পা বাঁধো কষে।'

হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'ও-কে, বস্।'

'বব,' বলল ওমর, 'যাও তো, স্তূপের চূড়ায় উঠে দেখো, ইমেট চাব আসছে কিনা। পিস্তলটা কিশোরের হাতে দাও, গরিলার বাচ্চা বাধা দিলেই দেবে গুলি মেরে।'

কিশোরের হাতে পিস্তল দিয়ে স্তূপের দিকে দৌড়ে গেল বব। ওপরে উঠে একবার চেয়েই ছুটে ফিরে এল। 'আসছে! আসছে!'

ফিরে চাইল ওমর। 'কত দূরে?'

'একশো গজ হবে। খুব আস্তে আস্তে আসছে, ম্যাবরিকে নিয়ে আসতে হচ্ছে তো।'

দ্রুত চিন্তা চলেছে ওমরের মাথায়। 'সবাই তৈরি হয়ে যাও। পালাতে হবে আমাদের।'

ভুরু কোঁচকাল মুসা। 'ইমেটের ভয়ে পালাব?'

'হ্যাঁ,' বলল ওমর, 'অহেতুক ঝুঁকি নিতে যাব কেন? রিভলভারে হাত খুব ভাল ওর। ওর মুখোমুখি হওয়ার যোগ্যতা নেই আমার, অন্তত রিভলভার নিয়ে। গুলি খেয়ে না মরলেও আহত হতে পারি, আমাদের যে কেউ। এই বিজন অঞ্চলে তখন আরও বিপদে পড়ব, ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই। চলো, ভাগি। জলদি করো।'

পাথরের স্তূপের দিকে তাকাল কিশোর, পেছনে ঘন বনের দিকে চাইল। ওমরের দিকে ফিরে বলল, 'যাব কোন দিক দিয়ে?'

'ওদিক,' সাগরের দিকে হাত তুলল ওমর। 'বব, মুসা, জলদি গিয়ে ডিঙি নামাও পানিতে। কিশোর, এদিকে এসো, আমাদের জিনিস আমরা নিয়ে যাই।' প্রথমেই খাবারের টিনগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে শুরু করল সে।

ওমর আর কিশোর মিলে খাবারের টিন বয়ে এনে তুলতে লাগল নৌকায়। সব তুলতে পারল না, তবে যত বেশি পারল, তুলল। কিশোর উঠে পড়ল। ডিঙিটা গভীর পানির দিকে ঠেলে দিয়ে আলগোছে লাফিয়ে উঠে বসল ওমর। পানি থেকে বড়জোর ইঞ্চি দুই ওপরে রয়েছে ডিঙির কানা, তবে এখন সাগর শান্ত, আরোহীরা বেশি নড়াচড়া না করলে ডুববে না নৌকা।

'ভেবেছ পার পেয়ে যাবে,' চেঁচিয়ে বলল হ্যামার। 'এত সহজ না। দেখাব মজা।'

'আমরা অপেক্ষায় থাকব,' চেঁচিয়েই জবাব দিল ওমর, বৈঠা তুলে নিয়ে ঝপাং করে ফেলল পানিতে।

'ইমেট, এই ইমেট!' চেঁচামেচি শুরু করল হ্যামার। 'কোথায় তুমি? জলদি এসো। ব্যাটারা পালাল!'

পাথরের স্তূপের ওপাশ থেকে সাড়া দিল ইমেট চাব।

'শান্ত থাকবে,' সঙ্গীদেরকে হুঁশিয়ার করল ওমর, 'ইমেট চাব গুলি চালালেও

নড়বে না কেউ। নড়াচড়ায় ডিঙি ডুবে গেলে আর রক্ষে থাকবে না।'

স্তূপের মাথায় দেখা গেল ইমেট চাবকে, প্রায় একশো গজ দূরে চলে এসেছে ততক্ষণে ডিঙি।

'ও দেখে ফেলেছে আমাদের,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।

রিভলভার হাতে পানির ধারে দৌড়ে আসছে ইমেট চাব, যতখানি সম্ভব কাছে থেকে গুলি করতে চায়।

'আসুক, অনেক দূরে চলে এসেছি,' বলল ওমর। 'যত ভাল হাতই হোক, পঞ্চাশ গজের পরে রিভলভার দিয়ে নিশানা ঠিক রাখা খুব কঠিন।'

পানির ধারে চলে এল ইমেট চাব। গর্জে উঠল তার রিভলভার। ডিঙি থেকে কয়েক ফুট দূরে পড়ল বুলেট, পিছলে উড়ে চলে গেল সাঁ করে।

দাঁড় বাইতে বাইতে কিশোরকে বলল ওমর, 'গুলি করো। জানি লাগবে না, তবু অস্বস্তিতে পড়ুক। পাল্টা গুলির মুখে দাঁড়িয়ে হাত স্থির রাখতে পারবে না।'

গর্জে উঠল আদিম পিস্তল। পাথরে বাড়ি লেগে বিইঙ করে উড়ে চলে গেল বল, এত দূর থেকেও সে শব্দ শোনা গেল।

কিন্তু ঘাবড়াল না ইমেট চাব, একের পর এক গুলি করে গেল। একটা গুলিও লাগাতে পারল না। ইতিমধ্যে আরও দূরে সরে এসেছে ডিঙি। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেল সে হ্যামারের বাঁধন খুলতে।

ডিঙির নাক বাঁয়ে ঘোরাল ওমর, তীরের সঙ্গে সমান্তরাল রেখে এগিয়ে চলল।

'কোথায় যাচ্ছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'দ্বীপের শেষ মাথায় একটা উপদ্বীপ দেখেছ? এখান থেকে আধমাইল মত হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের জন্যে সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। ওখান থেকে চারদিকে লক্ষ্য রাখতে পারব। লুকিয়ে এসে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারবে না হ্যামারের দল। গিয়ে আগে কিছু মুখে দিয়ে নেব, তারপর মিটিঙে বসব। সামনে অনেক কাজ।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু ওমরভাই, ওই পোশাক কোথায় পেলেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

কড়া হয়েছে রোদ। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ওমর। 'গেলেই দেখবে। আচ্ছা, হ্যামারের দল থেকে দূরে থাকতে পারলে না?'

'হঠাৎ করেই ধরা পড়ে গেলাম, ওমরভাই,' জবাব দিল মুসা। 'কল্পনাও করিনি ওভাবে ধরা পড়ব।'

আর কোন কথা হলো না। চুপচাপ দাঁড় বেয়ে চলল ওমর। ল্যাগুনের ধারে বালিয়াড়িতে দেখা যাচ্ছে হ্যামার আর ইমেট চাবকে, ডিঙির দিকেই ফিরে আছে। ঘুরে উপদ্বীপের অন্য দিকে নৌকা নিয়ে এল ওমর, খোলা সাগরের দিকে। এখান থেকে দেখা যায় না ল্যাগুনটা। আস্তে আস্তে দাঁড় বেয়ে ডিঙিটাকে নিয়ে এল সিঁড়ির গোড়ায়, যেখানে জাহাজ থেকে মালখালাস করা হত এককালে।

'জিনিস নিয়ে উঠে যাও তোমরা,' বলল ওমর।

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'খাবার পানি লাগবে না? দ্বীপে যেতেই হচ্ছে। কয়েকটা নারকেল কুড়িয়ে নিয়ে আসি। বেশি দেরি করব না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়ব।'

বোঝা কমে গিয়ে একেবারে হালকা হয়ে গেছে ডিঙি। নাক ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত দাঁড় বেয়ে চলল ওমর।

পাঁচ

ফিরে এসে ডিঙিটা ঘাটে শক্ত করে বাঁধল ওমর। চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্যেরা, অবাক হয়ে দেখছে সবকিছু। হুড়াহুড়ি করছে, চেঁচামেচি করছে উত্তেজনায়, কিন্তু বাধা দিল না ওমর। ছেলেমানুষ ওরা, করবেই। এমন এক জায়গা, তার নিজেরই জানি কেমন লাগছে। বলে বোঝানো যাবে না, এমনি এক ধরনের উত্তেজনা, রোমাঞ্চ।

'ওমরভাই, এ-জায়গার খোঁজ পেলেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'খুঁজে বের করিনি,' বলল ওমর। 'বাঁচার জন্যে উঠেছি। দেখি এই কাণ্ড। প্রথমে ভেবেছিলাম পাথরের স্তূপ, কিংবা উপদ্বীপ। বিমান থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে উঠলাম। বেয়ে বেয়ে উঠে এলাম এই চত্বরে। সিঁড়িটিড়িগুলো পরে আবিষ্কার করেছি।'

'কিন্তু ওই পোশাক পেলেন কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

'নিচে,' সিঁড়ির দিকে আঙুল তুলে বলল ওমর। 'বেশ বড় একটা ঘর আছে।'

'আরও কাপড় আছে?'

'এক গাদা।'

'ওই সিঁড়ি দিয়েই নামা যাবে তো? মাঝে কোন বাধা-টাধা?'

'কিচ্ছু নেই, একেবারে পরিষ্কার। তবে অন্ধকার।'

আর শোনার অপেক্ষা করল না কিশোর। মুসা আর ববকে ডাকল, 'চলো, দেখি।'

হৈ-হৈ করে ছুটে গেল ওরা সিঁড়ির দিকে। সেদিকে চেয়ে মুচকি হাসল ওমর, চূড়ায় উঠতে শুরু করল। এটাকে পাহাড়ের চূড়া বলা যায়, নিচের ঘরটার ছাতও বলা চলে। ছাত বললেই বেশি মানানসই হবে, ভাবল সে।

চূড়া কিংবা ছাত যা-ই হোক, চমৎকার জায়গা। চ্যাপ্টা। ওপরে উঠে চারদিকে চোখ রাখতে এর জুড়ি আশেপাশে আর একটিও নেই। বাইরের শত্রু যেদিক দিয়েই আসুক, এখানে বসে কেউ চোখ রাখলে, তার চোখ এড়িয়ে আসতে পারবে না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ল্যাগুনের ধারে বালিয়াড়ি। মাটিতে পড়ে থাকা কালো একটা কিছুর ওপর ঝুঁকে রয়েছে হ্যামার আর ইমেট চাব, বোধহয় নিগ্রোটা। হঠাৎ নিচ থেকে চেঁচামেচি শোনা গেল। ছেলেগুলোকে থামানো দরকার, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল ওমর। 'কি ব্যাপার?'

'এটা দেখেননি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। হাত তুলে দেখাল আরেক ধাপ সিঁড়ি, মেঝে থেকে নিচে নেমে গেছে। কতগুলো কাপড় আর কম্বল সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা চ্যাপ্টা পাথর, মাঝখানে লোহার রিঙ লাগানো। সিঁড়ির মুখ ঢাকা ছিল

পাথরটা দিয়ে।

'না, তখন ভালমত খুঁজে দেখিনি,' বলল ওমর। 'তবে ওরকম কিছুর খোঁজেই নেমেছিলাম। কম্বলে ঢাকা ছিল, না?'

'হ্যাঁ,' মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা কয়েকটা কম্বল আর কাপড় দেখাল কিশোর, 'ওগুলো ছিল ওপরে।'

'ওরকম কিছুর খোঁজে ছিলেন মানে?' প্রশ্ন করল মুসা। 'জানতেন, আছে ওটা?'

'না থাকলেই বরং অবাক হতাম।'

'কি এমন জিনিস...'

'পানি রাখার ট্যাংক। ছাত থেকে গড়িয়ে পড়ে জমা হয় ওখানে। পাথর ছাড়া কিছু নেই, এখানে যারা থাকত, পানি পেত কোথায়? মূল দ্বীপে হয়তো কোথাও আছে পানি, ঝর্নাও থাকতে পারে। কিন্তু এই দুর্গে যাদের বাস ছিল, তাদেরকে যদি পানির জন্যে বাইরে যেতে হত, নিরাপত্তা থাকত? ছাতে কোথাও না কোথাও একটা গর্ত নিশ্চয় আছে, বৃষ্টির পানি ওই গর্ত দিয়ে সুড়ঙ্গপথে এসে জমা হয় ট্যাংকে। তো, পানি আছে ট্যাংকটায়?'

'দেখিনি এখনও,' বলল কিশোর।

একটা গুলি তুলে নিয়ে গর্তের মুখ দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিল ওমর।

পানিতে পড়ে টুলুপ্ শব্দ তুলল ওটা।

'হুঁ, আছে,' মাথা নাড়ল ওমর। 'খাওয়ার যোগ্য কিনা দেখি।...ওই যে, একটা বালতি,' পুরানো কাপড়-চোপড়ের মাঝে পড়ে থাকা কালো একটা জিনিস দেখাল সে। চামড়ার তৈরি, বারুদ রাখার বোতলের মতই কঠিন হয়ে গেছে এখন।

বালতি তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল কিশোর। উঠে এল পানি ভরে নিয়ে। চামড়ার বালতির জায়গায় জায়গায় ফুটো, সেগুলো দিয়ে ফোয়ারার মত পানি ছিটকে পড়ছে।

দু'হাত এক করে একটা ফোয়ারার সামনে পাতল ওমর, অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মুখে তুলল। 'ঠিকই আছে মনে হয়,' মাথা দোলাল সে। 'কিন্তু যতক্ষণ নারকেল আছে, আমি ওই পানি গিলছি না। মুসা, ঢাকনাটা দিয়ে রাখো। পেট জ্বলছে, আমি খাবার আনতে যাচ্ছি।'

ট্যাংকের দিক থেকে ফিরল ওমর, এই প্রথম খেয়াল করল যেন ছেলেদের পরনের বিচিত্র পোশাক।

পোকায় কাটা লাল একটা শার্ট গায়ে দিয়েছে কিশোর, পরনে পাজামা, হাঁটুর নিচে নেমেই শেষ, খুব টাইট-ফিটিং। মাথায় বিচিত্র টুপি, চূড়াটা অনেকটা চিমনির মত, ষোলো-সতেরোশো শতকে যেমন পরত নাবিকেরা। নীল-শাদা ডোরাকাটা শার্ট গায়ে দিয়েছে মুসা। শার্টের বুকের কাছে ছোট গোল একটা ছিদ্র, ছিদ্রের চারদিক ঘিরে খয়েরী একটা দাগ, বোঝাই যাচ্ছে কিসের। পরনে সুতি কাপড়ের ময়লা প্যান্ট। মাথায় দিয়েছে তিন কোণা একটা কালো টুপি। কিশোরের গায়ে শার্ট ঠিকমত লাগেনি, বড় হয়েছে, কিন্তু ববের একেবারে ঢলঢল করছে। রঙচটা নীল সিল্কের শার্ট গায়ে দিয়েছে, পুরানো একটা বেল্ট লাগিয়েছে কোমরে, শার্টের ওপরে,

ফলে মেয়েদের ফ্রকের মত লাগছে দেখতে। বেল্টের ভেতরে আবার বিরাট পিস্তল গুঁজেছে একটা। মাথায় লাল টুপি, কানের অর্ধেক ঢেকে দিয়েছে, পেছনে লেজ নেমেছে ঘাড়ের ওপর।

'হা-হাহ্!' ববকে দেখতে দেখতে হেসে ফেলল ওমর, চেহারায় ফোটাল কৃত্রিম আতংক। 'আরে, ইসরায়েল হ্যাণ্ডস দেখছি! এখন একটা জলি রোজার পেলেই হত। চূড়ায় উঁচিয়ে দিয়ে বুক চাপড়ে খাড়া হয়ে যেতাম। ভয়ংকর একদল জলদস্যু, দুর্গ দখল করে বসেছি।'

হেসে উঠল সবাই।

'স্টিভেনসনের লেখা ট্রেজার আইল্যাণ্ডের ডাকাত না ইসরায়েল হ্যাণ্ডস?' বলল বব। 'পড়েছিলাম।'

'নামটা ধার নিয়েছেন স্টিভেনসন,' বলল কিশোর। 'আসল ইসরায়েল হ্যাণ্ডসও ডাকাত ছিল, খুনে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড টীচ-এর কোয়ার্টারমাস্টার।'

'এডওয়ার্ড টীচটা কে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জলদস্যু ব্ল্যাকবীয়ার্ডের নাম শুনেছ?'

মাথা ঝোকাল মুসা।

'এডওয়ার্ড টীচের ডাক নাম ছিল ব্ল্যাকবীয়ার্ড। এতবড় খুনী লুই ডেকেইনিও ছিল কিনা সন্দেহ।'

'লুই ডেকেইনির নাম শুনেছি,' বলল বব। 'আচ্ছা, কিভাবে মরেছিল ডাকাতটা, বলতে পারো? ফাঁসিতে? ফাঁসি দিয়ে নিশ্চয় ফাঁসিকাঠেই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল লাশটা, শুকিয়ে শুকিয়ে শেষ না হওয়াতক?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ওর মৃত্যুটা একটা রহস্য। কেউ জানে না, কিভাবে মারা গেছে লুই ডেকেইনি। শোনা যায়, মস্ত একটা গ্যালিয়ন দখল করার পর রহস্যময়ভাবে গায়েব হয়ে যায় ডেকেইনি আর তার কিছু নাবিক। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল ওয়েস্ট ইনডিয়ান রুটের সদাগরী জাহাজের নাবিকেরা। আমার মনে হয়, ডুবে মরেছে ডেকেইনি আর তার দল। আমরা যে পোশাক পরে আছি, ডেকেইনির নাবিকদেরই কিনা, কে বলবে!'

'চুপ, চুপ!' আঙুল নাড়ল মুসা। 'ওসব কথা বলো না, আমার ভয় লাগে!' পরনের কাপড়গুলোর দিকে অস্বস্তিভরে তাকাল সে।

'একটা কথা কিন্তু ঠিক,' বলল কিশোর। 'রত্নদ্বীপে জলদস্যুর পোশাকে বেমানান নই আমরা।'

'রত্নদ্বীপ কি করে হলো?' ভুরু নাচাল মুসা।

'নাহলে এসেছি কেন আমরা? হ্যামারই বা পিছু নিয়ে এসেছে কেন! রত্নের লোভেই তো।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল ওমর, 'রত্নদ্বীপেই এসেছি আমরা। বরং, নামটা একটু বদলে জলদস্যুর দ্বীপ রাখলে আরও মানানসই হয়। বব যখন বলল, উভচরটা নিয়ে এখানে নেমেছে হ্যামারের দল, তখনই বুঝে নিয়েছি, এই দ্বীপেই আসতে চেয়েছিলাম আমরা।'

'ওমরভাই,' হাত বাড়াল কিশোর, 'হ্যামারের পকেট থেকে যে ম্যাপটা নিয়েছেন তাতে কিছু কিছু জায়গা বদলে দিয়েছি বটে, কিন্তু কিছু মিল আছে। আছে পকেটে? দিন তো।'

পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে দিল ওমর। 'কেন জানি মনে হচ্ছিল কাজে লাগতেও পারে, ঠিকই লাগল।'

ভাঁজ খুলে ম্যাপটা মেঝেতে বিছাল কিশোর। 'ববের বাবার নির্দেশ মত,' বলল সে, 'এই যে এখান থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে থাকার কথা জাহাজটা। আমি আরও সরিয়ে দিয়েছি। উপদ্বীপ থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে, উপদ্বীপ একটাই আছে, আর সেটাতেই রয়েছি আমরা। মূল ম্যাপে এই যে, এখানটাতে ছিল ক্রস চিহ্ন,' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল কিশোর। 'খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? এসেছি মোহর খুঁজতে, খোঁজা দরকার।'

'যদি হ্যামার আর ইমেট চাব কাছাকাছি থাকে?' মুসার প্রশ্ন।

'তাহলে যাওয়া যাবে না।'

'দূর, যাই আর না যাই, খেয়ে তো নিই। আর থাকতে পারছি না। ওমরভাই, টিন?'

'হ্যাঁ, চলো, নিয়ে আসি।'

'এখানে আনার কি দরকার? চত্বরে বসেই তো খেতে পারি।'

'না, ওখানে সাংঘাতিক রোদ। তাছাড়া ওখানে থাকলে ডাকাতদের চোখে পড়ে যেতে পারি। আমরা কোথায় আছি, ওদের না জানানোই ভাল।'

দুপদাপ করে ওপরে উঠে এল ছেলেরা, পেছনে ওমর। নৌকায় করে আনা সমস্ত মালপত্র হাতে হাতে নামিয়ে আনল ওরা ঘরে, ওমরের আনা নারকেলগুলোও আনল। কোন আসবাব নেই ঘরে, বসার কিছু নেই, মেঝেতেই বসল ওরা। কোথায় বসবে, কোথায় শোবে এ-নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাল না।

'ওই ভদ্রলোকদের সামনে খাই কি করে? কেমন চেয়ে আছে দেখেছেন?' কঙ্কালদুটো দেখিয়ে বলল মুসা, কণ্ঠে অস্বস্তি।

'তোমারও দেখছি ভূতের ভয় আছে,' হেসে বলল ওমর, 'ববের একা না। ওরা চেয়ে আছে তো কি হয়েছে? কঙ্কাল তো কঙ্কালই, তোমার ভেতরেও তো আছে একটা।'

খেতে খেতে আলোচনা চলল। কে কিভাবে দ্বীপে নেমেছে, সেই কাহিনী খুলে বলল। মুসা আর কিশোর ভাগাভাগি করে শোনাল তাদের কাহিনী। ববঁ শোনাল তার কিসসা, কিভাবে ম্যাবরি তার গলা কাটতে যাচ্ছিল, কিভাবে ওমরভাই বাঁচিয়েছে, তার বিশদ বর্ণনা। দ্রুত কাটছে সময়। দুপুর হয়ে এসেছে।

নারকেলের মালাগুলো সযত্নে সরিয়ে রাখল ওমর, কাপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। 'বেশ বেকায়দা অবস্থায়ই পড়েছি,' চিন্তিতকণ্ঠে বলল সে। 'এই দ্বীপ থেকে যেতে পারছি না আমরা, হ্যামারও পারছে না, অন্তত সিডনি বারডু যতক্ষণ না আসছে। কিন্তু প্লেন নিয়ে গেল কোথায় ব্যাটা? ফিরছে না কেন? প্রথমে ভেবেছিলাম, হ্যামারকে আটকে ফেলেছি দেখে প্লেন নিয়ে পালিয়েছে, ফিরে আসবে

আমরা সরে গেলেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে কি করত? প্লেন নিয়ে কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করত। কিন্তু তা না করে সোজা উড়ে চলে গেল। ম্যারাকিনায়ই গেছে কিনা কে জানে। ভাবনার কথা।'

'ঠিকই বলেছেন,' মাথা কাত করল কিশোর। 'আমিও সেকথাই ভাবছি।'

'গেছে হয়তো খাবার-দাবার আনতে,' মুসা বলল। 'ওদের সব কিছু তো নিয়ে এসেছি আমরা।'

'কি করে জানল খাবার নিয়ে নিচ্ছি আমরা?' ওমরের প্রশ্ন।

চুপ করে রইল মুসা, জবাব দিতে পারল না।

'আমাদেরগুলো নিয়েছিল তো,' বব বলল, 'হয়তো ভেবেছে, এত অল্প খাবারে চলবে না। তাই আরও আনতে পাঠাচ্ছিল বারডুকে। সে রওনা দেয়ার আগেই আমরা গিয়ে হাজির হয়েছি।'

'কিংবা হতে পারে, যন্ত্রপাতি আনতে গেছে। শাবল, কোদাল, ঝুড়ি, ইত্যাদি। মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন তোলার জন্যে,' বলল মুসা।

'ওসব কিছুই আনতে যায়নি,' হাত নাড়ল কিশোর। 'ওরা ভালমতই জানে, গুপ্তধন রয়েছে জাহাজে, মাটির নিচে নয়। শাবল-কোদালের দরকার নেই, এটা আমরা যেমন জানি, ওরাও জানে। গেছে অন্য কোন কারণে।'

'তোমার কি মনে হয়?' মুসা প্রশ্ন করল। 'ভয় পেয়ে পালিয়েছে?'

'কিসের ভয়?' ওমর বলল। 'ওর মত লোক ভয় পাবে? যখন জানে হাতের কাছেই কোথাও রয়েছে একগাদা মোহর? ওসব না, অন্য কোন সিরিয়াস ব্যাপার। সে যা-ই হোক; ও যদি আর ফিরে না আসে, তো আমাদের অবস্থা কাহিল। ভালমতই আটকা পড়লাম এখানে। টিনের খাবারে আর কদ্দিন চলবে। তারপর থেকে শুধু নারকেল ভরসা। তিনবেলা নারকেল খাওয়া সম্ভব? দ্বীপে যাওয়ারও অনেক বিপদ। ওখানে হ্যামার আছে, ইমেট চাব আছে, দেখামাত্র গুলি করবে। যা খাবার আছে, আমার ধারণা, আর দুই কি তিন দিন চলবে। তারপর?'

'হ্যামার কোম্পানিরও তো একই সমস্যা,' বলল মুসা।

'কিন্তু ওদের চেয়ে আমরা খারাপ অবস্থায় রয়েছি। ঠাণ্ডা মাথায় দেখামাত্র গুলি করতে পারব না আমরা, কিন্তু ওরা দ্বিধা করবে না।'

'যাক, অন্তত একটা শয়তান মরেছে, এ-ও কম না, বলল বব।

'মরল আর কোথায়?' হাত নাড়ল ওমর। 'ভেবেছিলাম মরেছে, আসলে মরেনি। তবে গুরুতর জখম হয়েছে, নড়াচড়া বিশেষ করতে পারবে বলে মনে হয় না। চলো, ওপরে যাই, দেখি ব্যাটারা কি করছে। এখন থেকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে আমাদের, পাহারা দিতে হবে, নইলে এখানেই এসে হামলা করবে হঠাৎ এক সময়। আমরা তখন অসতর্ক থাকলেই গেছি।'

'ভালই লাগছে আমার এসব ডাকাত-ডাকাত খেলা,' হেসে বলল বব। 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড পড়ার সময় কল্পনাও করিনি, গুপ্তধন খুঁজতে এসে আটকা পড়ব আমরা কোনও দ্বীপে।'

ওমরও হাসল। 'মজা লাগছে, না? ঠিকই বলেছ, ট্রেজার আইল্যাণ্ডের সঙ্গে

অনেক মিল আছে, সত্যিই। হ্যামার হলো লঙ জন সিলভার, তার সঙ্গীরা জলদস্যু, আর আমরা...' হাসি বিস্তৃত হলো তার, 'আমরা...হ্যাঁ, বব হলো জিম হকিনস, কিশোর স্কয়ার ট্রেলনী, মুসা ডক্টর লিভসী, আর আমি...আমি...'

'ক্যাপ্টেন স্মলেট,' চেঁচিয়ে উঠল বব।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওমর, নাটকীয় ভঙ্গিতে বাউ করল। তারপর ট্রেজার আইল্যাণ্ড বইয়ের সংলাপ নকল করে বলল, 'বান্দা আপনাদের খেদমতে হাজির, ভদ্রমহোদয়গণ। আপনাদের সহায়তায় লঙ জন সিলভারকে ফাঁসিতে না ঝোলাতে পারি তো আমার নাম ক্যাপ্টেন স্মলেট নয়। উঠুন, সবাই ডেকে যান, মন শক্ত রাখবেন। চলুন দেখি, শয়তানগুলো কি করছে।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। এমনিতেই সে ভাল অভিনেতা। ট্রেজার আইল্যাণ্ড ছবিতে দেখা স্কয়ার ট্রেলনীর ভঙ্গি হুবহু নকল করে বলল, 'ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন, আরেকবার আপনার বিচক্ষণতার প্রশংসা করছি। মোহরগুলো পাওয়ার আশায় রইলাম।'

জোরে হেসে উঠল দর্শকরা।

সারি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা ওপরে, ছাতে উঠল। ল্যাগুনের ধারে সৈকতে এখনও পড়ে রয়েছে ম্যাবরি। ওর পাশে বসে আছে হ্যামার আর ইমেট চাব।

'অতো সোজা হয়ে দাঁড়িও না, নিচু হও,' সাবধান করল ওমর, 'ওরা দেখে ফেলবে।'

'তীরে যাব?' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল বব।

মাথা ঝোঁকাল ওমর। 'হ্যাঁ, আশা করছি এখন নিরাপদেই যেতে পারব। ওরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগে ঘুরে দেখে এলে মন্দ হয় না।'

'যদি ওরা টের পেয়ে যায়?' মুসার জিজ্ঞাসা। 'যদি আক্রমণ করে?'

'আমরাও প্রতিহত করব। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়েই যাব। কিন্তু খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে আমাদের অস্ত্র, পুরানো জিনিস, ওগুলোর বিশ্বাস নেই। নিজেরাই জখম হয়ে যেতে পারি। বব, তোমার পিস্তলে গুলি আছে?'

'না।'

'ঠিক আছে, চলো, নিচে। কি করে গুলি ভরতে হয়, দেখিয়ে দেব। কিশোর, মুসা, তোমরা একটা করে মাসকেট নেবে।'

আবার নিচে নেমে এল ওরা। যার যার অস্ত্র পছন্দ করে নিল। সব গাদা-বন্দুক, গাদা-পিস্তল, কি করে গুলি ভরে গুলি করতে হয়, শিখিয়ে দিল ওমর। তারপর আবার বেরিয়ে এল চত্বরে। চট করে আরেকবার ছাতে উঠে দেখে নিল ওমর, শত্রুরা কি করছে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে নৌকায় চড়ল সবাই। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল দ্বীপের চোখা প্রান্তে। নামল। ডিঙিটা টেনে তুলে রাখল পানি থেকে দূরে, বড় একটা পাথরের খাঁজে। হ্যামার বা তার দলের কারও কোন সাড়াশব্দ নেই। নিশ্চিত হয়ে দ্বীপের ভেতর দিকে রওনা হলো ওরা। একটা টিলার মাথায় উঠে সামনে কি আছে

না আছে দেখল ওমর। ঘন জঙ্গল, ঝোপঝাড়, লিয়ানা লতা, বড় বড় ক্যাকটাস ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। অন্যেরাও উঠে এল তার পাশে।

মাথা নাড়ল ওমর। 'না, ওখানে গ্যালিয়নটা আছে বলে মনে হয় না। না কি বলো?'

'ওরকম জায়গায় থাকার কথাও না,' কিশোর বলল, 'ভুল জায়গায় খুঁজছেন। আর যদি সত্যি সত্যি থেকে থাকে, তো ওটা থেকে মোহর বের করে আনা আমাদের কর্ম নয়। দেখেছেন কি ঘন জঙ্গল! আর্মি লাগালেও ওই জঙ্গল পরিষ্কার করতে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে।'

'তবু চলো, খুঁজে দেখি,' ওমর বলল। 'ববের বাবা তো লিখেছেনই এমন জায়গায় রয়েছে জাহাজটা, যেখানে আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। ঘন জঙ্গলেই তো ওটা লুকিয়ে থাকা স্বাভাবিক, মাস্তুল দেখা যাবে না, কিছুই দেখা যাবে না। খুঁজে বের করা খুবই কঠিন হবে, মনে হচ্ছে।'

দুটো ঘণ্টা পুরোদমে খুঁজল ওরা। জঙ্গলের যেখানেই সামান্যতম ফাঁক ফোকর দেখল, ঘন লতা পাতা গাছগাছালিতে সামান্যতম ফাঁক দেখল, সেখানেই ঢুঁ মারল। ঝোপঝাড়ে ঢাকা উঁচু টিলায় উঠল, শুকনো খাঁড়িতে নামল। কিন্তু জাহাজের চিহ্নও চোখে পড়ল না।

আরও ঘন জঙ্গলে ঢোকার চেষ্টা করল ওরা, বিফল হয়ে বাদ দিল সে চেষ্টা। ঝোপঝাড়ে ঢাকা নিচু একটা জায়গা পেরিয়ে উঠল পাহাড়ে, সেই জায়গাটায়, যেখানে ম্যাবরির তাড়া খেয়ে উঠেছিল বব।

পাথরের ওপর বসে পড়ে শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ওমর।

'দূর! কি কষ্টরে বাবা! এমন জানলে কে আসে?' বিরক্তি প্রকাশ করল মুসা।

'কষ্টের কি দেখেছ?' বলল ওমর। 'আমার তো মনে হয়, মাত্র শুরু হয়েছে।'

'চুলোয় যাক মোহর। চলুন, ওসব খোঁজা বাদ দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।'

'যাবে কিভাবে?' হাসল কিশোর।

'সে তুমি জানো!' চটে উঠল মুসা। 'তুমিই তো ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে এসেছ। তোমার জন্যেই তো...'

'আরে কি ঝগড়া শুরু করে দিলে ছেলেমানুষের মত?' মৃদু ধমক দিল ওমর। 'থামো। আলো আর বেশিক্ষণ নেই, সে খেয়াল আছে? ঘরে নারকেলও আছে আর মাত্র দু'তিনটে। চলো, কিছু নারকেল কুড়িয়ে নিয়ে যাই। শুকনো সরু গলা দিয়ে নামাতে সুবিধে হবে।'

'হ্যাঁ, নারকেল জমিয়ে রাখা উচিত আমাদের,' কিশোর বলল।

'বব,' ওমর নির্দেশ দিল, 'যাও তো, চট করে ওদিকটা দেখে এসো। হ্যামার আর ইমেট চাব না আবার এদিকে এসে পড়ে। দেখো, সৈকতে কেউ আছে কিনা।'

দৌড়ে গেল বব।

মুসা আর কিশোর চলল একটা নারকেল কুঞ্জের দিকে, নারকেল কুড়াতে। খুব বেশি দূরে না কুঞ্জটা, কাছেই, জঙ্গলের ধারে গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু বারো কদম

যাওয়ার আগেই থেমে গেল ওরা, পড়িমড়ি করে ছুটে আসছে বব। উত্তেজিত চেহারা।

'হুঁশিয়ার!' চাপা গলায় বলল বব। 'হ্যামার আর চাব এদিকেই আসছে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওমর। 'কোথায়? কদ্দূর?'

'ওই যে, পাথরের স্তূপটার ওধারে। এখান থেকে ঢিল মারলে গিয়ে মাথায় পড়বে। ঝোপের ধারে ঝুঁকে কি জানি খুঁজছে।'

'মরুক হারামজাদারা!' নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসল ওমর। 'এখান দিয়ে আর যেতে পারব না, গেলেই দেখে ফেলবে। দুর্গে ফেরাই তো এক মহাসমস্যা হয়ে গেল।' মুসা আর কিশোর ফিরে এসেছে, ওদের দিকে চেয়ে উল্টোদিকে হাত তুলে বলল, 'চলো, দেখি ওদিক দিয়ে যাওয়া যায় কিনা। নৌকার কাছাকাছি গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব। ওরা একটু সরলেই ভাগব।'

আগে আগে চলল ওমর, পেছনে সারি দিয়ে অন্যেরা। প্রায় ছুটে ঢুকল জঙ্গলে। একটা জায়গায় কাঁটাঝোপ আর লিয়ানা সামান্য পাতলা। নাকি পথ করা হয়েছিল কোন এক সময়, আবার লতা আর ঝোপ জন্মে ঘন হয়ে আসছে? কে পথ করল? ওরা জানে না, কয়েক মাস আগে হ্যামারের তাড়া খেয়ে এখান দিয়েই ঢুকেছিল ববের বাবা, লুকিয়েছিল এদিককার জঙ্গলেই, পথটা তৈরি করেছিল তখন।

জঙ্গলের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এসে কিসে হোঁচট খেল ওমর। গাছের মত লম্বা কিছু একটা, শেওলায় ঢাকা, পথ জুড়ে আড়াআড়ি পড়ে রয়েছে।

'আরে, কি এটা?' আপনমনেই বিড়বিড় করল ওমর। ঝুঁকে পরীক্ষা করল। খানিকটা জায়গার শেওলা সরিয়ে দেখেই সন্দেহ হলো। আরও অনেকখানি জায়গার শেওলা পরিষ্কার করল। ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছ বলে তো মনে হচ্ছে না। মানুষের তৈরি না-তো?

মানুষের তৈরিই, জাহাজের মাস্তুল, নিশ্চয় গ্যালিয়নের প্রধান মাস্তুল। ফিরে চাইল ওমর। তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে কিশোর, চোখাচোখি হতেই মাথা ঝোঁকাল। সে-ও বুঝতে পেরেছে। এগিয়ে আসতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটল কিশোরের। উহ্ করে নিচু হয়ে কাঁটা খুলতে গিয়ে ভারসাম্য হারাল, থাবা দিয়ে ওমরের কাঁধ ধরে ফেলল। তৈরি ছিল না ওমর, সে-ও ভারসাম্য হারাল। পড়ে যেতে শুরু করল সে-ও। একটা লতা ধরল। কিন্তু দু'জন মানুষের ভার রাখতে পারল না সে লতা, ছিঁড়ে গেল। পড়ে গেল দু'জনেই। তাদেরকে সাহায্য করতে লাফিয়ে এল মুসা আর বব।

অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল এই সময়। তীক্ষ্ণ চড়াৎ শব্দে ফেটে যেতে শুরু করল যেন তলার মাটি।

'আরে আরে, মাটি ফাঁক হয়ে যাচ্ছে?' চেঁচিয়ে উঠল ওমর। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না। কিছু বলার জন্যে আবার মুখ খুলল, কিন্তু বলা আর হলো না। তার আগেই ভেঙে গেল নিচের তক্তা, গ্যালিয়নের শেওলায় ঢাকা ডেকের কাঠ। ভাঙা গর্ত দিয়ে নিচে পড়ল ওমর।

বাকি তিনজনের ভারে তক্তা মড়মড় করে ভেঙে গিয়ে গর্ত আরও বড় হলো,

পড়ল তারাও, আট-দশ ফুট নিচের কাঠের মেঝেতে। ওমরের ওপর পড়ল কিশোর, তাই ব্যথা বিশেষ পেল না। উহ্-আহ্ করে উঠল অন্যেরা।

মুসা চেঁচিয়ে উঠল, 'গেছিরে আল্লাহ, মারা গেছি!'

সকলের আগে উঠে দাঁড়াল ওমর। হাঁপাচ্ছে? 'হলো কি? কাণ্ডটা কি হলো?' দ্রুত তাকাল চারপাশে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান করেছিল, দেখে আরও নিশ্চিত হলো এখন।

গোঁ-গাঁ করে, আরও নানারকম বিচিত্র শব্দ তুলে কোকাতে কোকাতে উঠে দাঁড়াল অন্য তিনজন। কোমর ধরে বাঁকা হয়ে আল্লাহকে ডাকছে মুসা, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে বব। কিশোর কিছুই বলছে না। উঠে ওমরের মতই তাকিয়ে দেখছে চার পাশে।

'কোথায় এলাম রে বাবা! উফ্, কোমরটা বুঝি ভেঙেই গেল! বলি এলাম কোথায়? জবাব নেই কেন? এই কিশোর···,' কনুই দিয়ে খোঁচা মারল মুসা গোয়েন্দা প্রধানের পিঠে।

'যা খুঁজছিলাম আমরা,' জবাব দিল ওমর। হাত দিয়ে ঝেড়ে কাপড় থেকে শেওলা আর ময়লা পরিষ্কার করছে। 'জাহাজটার ভেতরেই পড়েছি···শশ্শ্!' হঠাৎ থেমে গেল সে, কান পাতল।

কথা শোনা যাচ্ছে, খুব কাছে। হ্যামার। স্পষ্ট শোনা গেল এখন তার কথা। 'আমি বলছি, শুনেছি শব্দ। এদিকেই কোথাও। মিনিটখানেক আগেও ছিল।'

ঠোঁটে আঙুল চেপে ইশারায় সবাইকে চুপ থাকার নির্দেশ দিল ওমর।

নিচু হয়ে আস্তে করে মাসকেট তুলে নিল কিশোর, তার সঙ্গেই পড়েছে বন্দুকটা। মুসারটাও পড়েছে, কিশোরের দেখাদেখি সে-ও তুলে নিল। তাকাল ওপর দিকে। ডেকের ভাঙা জায়গায় ফোকর হয়ে আছে, তবে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না ফাঁকটা, লতাপাতায় ঢেকে দিয়েছে, সবজেটে আলো আসছে ওখান দিয়ে।

'হবে শুয়োর-টুয়োর কিংবা অন্য জানোয়ার,' জোরাল গলা শোনা গেল ইমেট চাবের।

'আমি বলছি কথা শুনেছি!' হ্যামার বলল।

'তাহলে আমাদের সাড়া পেয়ে পালিয়েছে। আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? চলো, সরে যাই। জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে আমাদের দেখছে কিনা কে জানে? পালের গোদাটার কাছে পিস্তল আছে। ম্যাবরির মত পিঠে গুলি খাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। চলো। যাবে কোথায় ওরা? কাল সুযোগমত ধরে ফেলব। আরে, চলো না! দেবে তো মেরে।'

নিশ্চয় দ্বিধা করছে হ্যামার, কারণ পায়ের শব্দ শোনা গেল না তক্ষুণি।

কান পেতে রয়েছে নিচের শ্রোতারা। অবশেষে ফিরল ওপরের দু'জন, ধীরে ধীরে চলে গেল, বোঝা গেল শব্দ শুনেই।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল ওমর, 'গেছে। এই সুযোগে জাহাজটায় তল্লাশী চালিয়ে দেখি আমরা। কি বলো?'

ছয়

ওমর আর তার দল জাহাজের যেখান দিয়ে পড়েছে, ববের বাবা সেখান দিয়ে পড়েনি, সে পড়েছিল স্যালুনের ছাত দিয়ে স্যালুনে। তখনকার দিনে জাহাজের স্যালুন তৈরি হত সাধারণত পুপের ওপর। ওমর আর তার তিন সঙ্গী পড়েছে জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায়।

ভেতরে কি কি আছে দেখায় মন দিল ওরা। এক জায়গায় পড়ে আছে কম্বলের স্তূপ, দীর্ঘ দিন স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থেকে ছাতা পড়ে গেছে—সবুজ ছত্রাক। ওগুলোর কাছেই পড়ে আছে কাপড়ের স্তূপ, নষ্ট হয়ে গেছে সব ছাতা পড়ে। পচা গন্ধ ছড়াচ্ছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু নেই। মরচে পড়া কিছু অস্ত্রশস্ত্র পড়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বোধহয় তাড়াহুড়ো করে যাওয়ার সময় ফেলে গিয়েছিল নাবিকেরা। মূল্যবান কিছুই নেই।

'এখানে গুপ্তধন নেই,' জোরে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছে ওমর, বিষণ্ন এই প্রাচীন পরিবেশ ভাল লাগছে না তার। মৃতের জগতে এসে হাজির হয়েছে যেন।

বেরিয়ে এল ওরা। নীরবে এগিয়ে চলল জাহাজের কোমর ধরে। পেরিয়ে এল বহু পুরানো কামান—ধুলো ময়লায় ঢাকা, কামানের গোলা, বারুদের পিপা—কয়েকটা আবার বারুদে বোঝাই, মোটা শেকল, দড়ি, গাছের গুঁড়ি, খুঁটি, এমনি সব জিনিস। ওপরে জায়গায় জায়গায় চিড় ধরেছে তক্তা, ফাটল, আবছা আলো আসছে সেসব পথে, সেই আলোয় কেমন যেন বিকট দেখাচ্ছে জিনিসগুলো, গা শিরশির করে।

'গুপ্তধন ছাড়াই অনেক মূল্য জাহাজটার,' বলল কিশোর, 'অ্যানটিক মূল্য। যে কোনো যাদুঘর পেলে লুফে নেবে। এত পুরানো জাহাজ এত সংরক্ষিত অবস্থায় আর পাওয়া যায়নি। যাদুঘরে রাখলে দলে দলে আসবে দর্শক শুধু এটা দেখার জন্যেই। আমি শুনলে আমিও যেতাম। গুপ্তধন যদি না-ও পাই, বাড়ি ফিরে এই জাহাজের খবর দিলেই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাব।'

সাবধানে, খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওরা দেখতে দেখতে, যেন যাদুঘরে রয়েছে, কোনো কিছুতে পা পড়লে কিংবা হাত দিলে যেন এখুনি হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবে প্রহরী।

পাথরের এক বিশাল বয়েম দেখাল ওমর, বোতলের গলাটা খুব সরু, মুখে পাথরের ছিপি আঁটা। গায়ে কালো কালিতে ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছেঃ বেস্ট ওল্ড জ্যামাইকা। বোতলটার দিকে চেয়ে, ট্রেজার আইল্যাণ্ডে জলদস্যুদের গাওয়া সেই বিখ্যাত চরণটি সুর করে গেয়ে উঠল ওমর, 'ইয়ো হো হো, অ্যাণ্ড আ বটল্ অভ রাম।' ভারি পরিবেশ হালকা করার চেষ্টা করল সে।

নিশ্চয় ভেতরে রয়েছে অনেক পুরানো মদ। বোতলটার দিকে চেয়ে মাথা ঝোঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে ওটা থেকে নিয়ে খেলে পরের চরণটাও সত্যি হয়ে যাবে ঃ ড্রিংক অ্যাণ্ড ডেভিল হ্যাভ ডান ফর দা রেস্ট।'

ওপরে ওঠার একটা সিঁড়ির গোঁড়ায় এসে থামল ওরা। ভালমত পরীক্ষা করে

দেখল, ভার সইতে পারবে কিনা, তারপর পা দিল ওতে। বড় একটা ঘরে এসে ঢুকল। এটা ক্যাপ্টেনের স্যালুন।

ছাতের প্রায় গোল একটা ফোকর দিয়ে আলো আসছে। ঠিক নিচেই জমে রয়েছে শুকনো পাতা, কুটো, ছেঁড়া শুকনো লতা আর শেওলা। আঙুল তুলে ফোকরটা দেখিয়ে বলল কিশোর, 'ওখান দিয়েই পড়েছিলেন ববের বাবা।'

ববের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

'ইয়াল্লা!' ফিসফিস করে বলল ওমর, 'দেখো, দেখো!' মাথা নাড়ছে আস্তে আস্তে, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন।

অন্যেরাও দেখল, নাড়া খেলো ওমরের মতই।

প্রচুর টাকা খরচ করে সাজানো হয়েছিল স্যালুনটা। দেয়ালের জায়গায় জায়গায় লাগানো রয়েছে সোনালি রঙের সুদৃশ প্রদীপদানী, তার ফাঁকে ফাঁকে নানারকম ছবি, সবই সাধুদের কিংবা ধর্মীয় কোনো পবিত্র দৃশ্যের। অপরূপ কার্পেটে ঢাকা পুরো মেঝে, আর কি তার রঙ। উজ্জ্বল লাল আর নীলের মাঝে সোনালি আলপনা। দেয়ালের সঙ্গে লোহার চ্যাপ্টা দণ্ড দিয়ে আটকানো রয়েছে বড় বড় আলমারি, ঢেউয়ের দোলায় বা ঝড়ের ঝাঁকুনিতে যাতে স্থানচ্যুত না হতে পারে, সে-জন্যে। আলমারির আঙটায় ঝুলছে বড় বড় তালা, বেশির ভাগই খোলা। সামনের দিকের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে ওয়ালনাট কাঠের মস্ত এক টেবিল, তাতে চমৎকার খোদাইয়ের কাজ। কিন্তু এসব দেখে নাড়া খায়নি দর্শকরা। তাদের চমকে দিয়েছে একটা কঙ্কাল। উঁচু পিঠওয়ালা, জায়গায় জায়গায় তামার কাজ করা একটা ভারি চেয়ারে বসে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে রয়েছে কঙ্কালটা।

'খাইছে!' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা। 'জ্যান্ত মনে হচ্ছে!' তার ভয়, এখুনি বুঝি, 'হ্যাল্লো, কেমন আছ,' বলে হাত মেলাতে উঠে আসবে পোশাক পরা কঙ্কালটা।

আস্তে আস্তে কঙ্কালটার কাছে এগিয়ে গেল ওমর। ফেকাসে হয়ে গেছে চেহারা। বিকট ভঙ্গিতে দাঁত খিঁচিয়ে আছে যেন কঙ্কাল, কালো অক্ষিকোটর আরও ভয়ংকর করে তুলেছে চেহারাকে, দীর্ঘ এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল ওমর, পরনের কাপড়-চোপড়গুলো দেখল।

ওমরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। ভালোমত দেখে বলল, 'জাহাজটা স্প্যানিশ, সন্দেহ নেই,' খুব আস্তেই বলেছে সে, কিন্তু অস্বাভাবিক এই নীরবতায় অনেক জোরালো হয়ে কথাটা কানে বাজল যেন, 'কিন্তু এই লোকটা স্প্যানিয়ার্ড ছিল না। পোশাক দেখেছেন? জলদস্যুর। নিশ্চয় কোনো অঘটন ঘটেছিল, ওর দলে বোধহয় ও-ই বেঁচেছিল শেষ অবধি,' বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে টেবিলে পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিল সে। উল্টে পাল্টে দেখে ওমরের হাতে দিয়ে বলল, 'দেখুন তো! পিস্তল-বন্দুকের ব্যাপারে আমি আনাড়ি।'

ভালমত নাড়াচাড়া করে দেখল পিস্তলটা ওমর, গন্ধ শুঁকল। 'গুলি নেই ভেতরে। মনে হয়···মনে হচ্ছে,' কাঁপা কাঁপা হাতে কঙ্কালটাকে চেয়ারসুদ্ধ সামান্য সরাল সে, ঘোরাল নিজের দিকে। 'দেখো, দেখো!'

সবাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল, ওমর কি দেখেছে দেখার জন্যে। রঙচটা

পোশাকের পেটের কাছটায় চেপে রয়েছে কঙ্কালের ডান হাতের আঙুলগুলো। গোল একটা ছিদ্র শার্টে, ছিদ্রের ধারটা পোড়া।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ওমর, মেঝেতে চোখ পড়তেই চমকে উঠল। 'খোদা!' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে। 'এই পিস্তলের গুলিতেই মরেছে। আত্মহত্যা নয়তো? দেখো।'

দেখল সবাই। কঙ্কালটার জুতোর চারপাশ ঘিরে কার্পেটে কালচে গাঢ় দাগ, শুকনো রক্ত ছাড়া আর কোন কিছুতেই ওই দাগ হতে পারে না।

'মন খারাপ হয়ে যায়, না?' অনেকখানি সামলে নিয়েছে ওমর। আবার আগের অবস্থায় সরিয়ে রাখল কঙ্কালটাকে। সরানোর সময় টুপ করে কি যেন পড়ল মেঝেতে। কুড়িয়ে নিল ওটা, অন্যেরাও কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে এল দেখার জন্যে। 'গুলি,' বলল ওমর। 'এটাই খুন করেছিল লোকটাকে। শরীরের ভেতরেই কোথাও আটকে ছিল, নড়াচড়ায় খসে পড়েছে। সুভনির রাখতে চাও, বব?'

নাক-মুখ বাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল বব। দু'হাত নেড়ে বলল, 'না দরকার নেই।'

হেসে উঠল অন্যেরা। এতক্ষণের গুরুগম্ভীর পরিবেশ হালকা হয়ে গেল হঠাৎ করে।

পিস্তলটা কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল ওমর। রূপার মোমদানীটা দেখিয়ে বলল, 'কমপক্ষে দু'শো পাউণ্ড হবে এখনকার বাজারে ওটার দাম। ড্রয়ারগুলোতে কি আছে,' বলতে বলতেই টান দিয়ে টেবিলের সব চেয়ে ওপরের ড্রয়ারটা খুলে ফেলল। চামড়ায় বাঁধা একটা বই তুলে নিল ড্রয়ার থেকে। আস্তে করে কভার ওল্টাল, যেন ছিঁড়ে যাবে ভয় করছে। প্রথম পৃষ্ঠাটা পড়তে শুরু করল।

চেহারার ভাব বদলে যাচ্ছে ওমরের, দৃষ্টি বদলে যাচ্ছে, বইয়ের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে মাথা। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ, হাতের আঙুল কাঁপছে। মুখ তুলে তাকাল সে। সবাই অবাক হয়ে আছে তার দিকে। 'কি আছে এতে জানো?' খসখসে হয়ে গেছে ওমরের কণ্ঠ। 'ভয়ংকর এক খুনীর কথা, এই একটু আগে যার কথা বলেছিলাম। লুই ডেকেইনি, যার অনেকগুলো নাম, লুই লা গ্রানডি, দা এক্‌স্‌টারমিনেটর, নিজেকেই এক্‌স্‌টারমিনেট করেছে, আত্মহত্যাই করেছে বোধহয়।'

হঠাৎ করেই বড় বেশি নীরব হয়ে গেল ঘরটা। ঠিক এমনি নীরবতা বিরাজ করেছিল তিনশো বছর আগে, ডেকেইনি গুলি খাওয়ার আগের মুহূর্তে।

লম্বা দম দিল ওমর। হাতের বইটা দেখিয়ে বলল, 'এটা ডেকেইনির লগবুক। দারুণ লাগবে পড়তে। নিশ্চয় লেখা আছে, কিভাবে, কখন কোন খুনটা করেছিল, কি কি করেছিল। ভাবছি, কত বীরত্বের গাথা লেখা আছে এতে? কত নিরীহ নাবিকের মৃত্যুর কাহিনী? দেখি তো, ডেকেইনি কিভাবে মারা গেছে...' দ্রুত পাতা উল্টে চলল সে। লেখা যে পৃষ্ঠায় শেষ, সেটাতে এসে থামল। পড়তে শুরু করল জোরে জোরেঃ

'...রাম শেষ, জাহাজে বিদ্রোহ চলছে, সবাই দ্বিধাগ্রস্ত। বউনের মোহরই এজন্যে দায়ী, নরকে পচে মরুক চোর হারামজাদা। বার বার এসে আমাকে চাপ

দিচ্ছে নাবিকেরা, সমস্ত মোহর সাগরে ফেলে দিতে বলছে, কিন্তু আমি কি আর রাজি হই? মোহরটা অভিশপ্ত হলে ওরাও মরবে, মরুক আগে, আমি দেখি, তারপর যা করার করব।

'বাতাস বাড়ছে আবার, পাল তোলার কেউ নেই। পাইকারী খুন, বিদ্রোহ, ঝড়, নীরবতা, পানির সমস্যা, তারপর আবার ঝড়ের সংকেত। মনে হচ্ছে, শয়তান নিজে এসে হাত লাগিয়েছে, জাহাজে বাস করছে যেন সে, সবাইকে, সব কিছুকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না। হারামজাদা বউন, নিজেও মরেছে, পোর্ট রয়ালের ফাঁসিকাঠে নিশ্চয় শেকলবাঁধা অবস্থায় পচে-গলে শেষ হচ্ছে এখন, আমাদেরকেও মেরে রেখে গেছে। ওর মোহরে ভর করেই যেন এসেছে শয়তান। সবাইকে শেষ করেছে; কেউ পাগল হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, হাঙরেরা খতম করেছে তাদের, কেউ ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, বাকি রয়েছি আমি...'

চুপ হয়ে গেল ওমর।

'আর কিছু নেই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না।'

'ডেকেইনি এরপর কি করল, খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

'জানা যাবে না কোনদিনই। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? বার বার বউনের মোহরের কথা উল্লেখ করেছে। বউনের অভিশপ্ত মোহর। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল ডেকেইনির নাবিকেরা। বউন কে জানি না, আমেরিকায় ফিরে জ্যামাইকার পুরানো রেকর্ড ঘাঁটাঘাঁটি করলে হয়তো জানতে পারব। আমার ধারণা, বউনের মোহরই পড়ে ছিল এই টেবিলে...'

'বাবা যেটা তুলে নিয়েছিল,' বলে উঠল বব।

'হ্যাঁ। কুসংস্কার নেই আমার, আগেই বলেছি। কিন্তু তবু কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারছি না, মোহরটার কিছু অশুভ ক্ষমতা আছে। যেখানে যার হাতেই গেছে, তারই ক্ষতি করেছে। যতক্ষণ আমাদের কাছে ছিল, একটার পর একটা বিপদে পড়েছি। ওটা হাতছাড়া হওয়ার পর থেকেই ভাগ্য ভাল হতে শুরু করেছে। অ্যালেন কিনে নিয়েছিল ওটা, তার অবস্থা দেখেছি আমরা। তারপর আমাদের কি দুরবস্থা। ববের কপাল ভাল, জ্যাকেকটা খুলে ফেলেছিল, নইলে সে-ও মরত। আশ্চর্য, জ্যাকেটটা এত ঝড়েও ভেসে গেল না, তীরে এসে পড়ল। কিশোর আর মুসা, তোমরা পেলে ওটা, মোহরটা নেয়ার একটু পরেই কি বিপদে পড়েছ, মরতে মরতে বেঁচেছ। ম্যাবরি নিল ওটা, গুলি খেলো আমার হাতে। আমার বিশ্বাস, ওই মোহরের জন্যেই শেষ হয়ে গেছে ডেকেইনি আর তার দলবল।'

'আরও অনেক মোহরের উল্লেখ করেছে ডেকেইনি,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

'বলেছে,' বলল ওমর, 'কিন্তু কেন বলেছে? কেন সব মোহর সাগরে ফেলে দিতে চাপ দিয়েছে নাবিকেরা? কারণ, তারা জানত, ওই মোহরের সঙ্গে বউনের মোহরটাও আছে। জানত না, ঠিক কোনটা বউনের অভিশপ্ত মোহর। তাই জাহাজে যত মোহর ছিল, সব ফেলে দিতে চেয়েছে।'

'শেষ অবধি কি তাহলে সব মোহর ফেলে দিয়েছিল?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন

করল কিশোর। 'নইলে গেল কোথায় ওগুলো?'

'আমার মনে হয় ফেলেনি,' ওমর বলল। 'তাহলে বউনের মোহরটা থাকত না ডেকেইনির কাছে সে নিজেও মরত না। মোহরগুলো আছে হয়তো জাহাজে, কিংবা কাছাকাছি কোথাও।'

'কিন্তু কোথায় আছে?' ভুরু নাচাল মুসা।

'সেটা বের করার জন্যেই তো এসেছি আমরা,' বলল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে সে। 'আমার মনে হয়, মোহর লুকিয়ে রেখে জায়গাটার ম্যাপ তৈরি করে ডেকেইনি, তারপরই কোনভাবে মারা যায়। তার আঁকা আসল ম্যাপটা নেই এখন আমার কাছে, তবে নকলটা আছে, আর কোন্ কোন্ জায়গা বদল করেছি, সেটাও মনে আছে আমার। দেখি রহস্য ভেদ করা যায় কিনা।' পকেট থেকে নকল ম্যাপটা বের করল সে। 'একটা কলম দরকার,' বলেই চোখ পড়ল টেবিলের ওপর। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল পালকের কলমটা, যেটা দিয়ে লিখেছিল ডেকেইনি। ছাতের ফোকর দিয়ে বাইরে তাকাল, আলো কমে গেছে। 'বেরোনো দরকার। আর পনেরো মিনিটেই অন্ধকার হয়ে যাবে। খুব কাছাকাছি না থাকলে আজ আর খুঁজে বের করা যাবে না মোহর, সময় নেই। তাড়াহুড়ো করে দেখে নিই একবার।' কলম আর ম্যাপ টেবিলে রেখে দিয়ে কাজে লেগে গেল সে।

টেবিলের বাকি ড্রয়ারগুলো খুলে দেখল কিশোর। বেশ কিছু জিনিস রয়েছে, তার মধ্যে তিনটে জিনিস মনোযোগ আকর্ষণ করল। তার একটা, কালো এক টুকরো কাপড়। সুন্দরভাবে ভাঁজ করা। মনে হলো টেবিলক্লথ। ড্রয়ারটা লাগিয়ে দিল কিশোর, হঠাৎ কি মনে পড়তেই টেনে আবার খুলল। কাপড়ের এক কোণ ধরে বের করে এনে ঝাঁকি দিয়ে খুলল পুরোটা, দু'হাতে ধরে ছড়াল। কালো একটা পতাকা, মাঝখানে মানুষের খুলির তলায় মানুষের হাড়ের ক্রসচিহ্ন—শাদা কাপড় কেটে সেলাই করে লাগানো হয়েছে। একটা হাড়ের নিচে লেখা বড় হাতের 'এল', আরেকটার নিচে 'ডি'।

'ভাগ্যের কি পরিহাস,' বিড়বিড় করল ওমর। 'যে কঙ্কালের চিহ্ন উড়িয়ে হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছে সে, সেই কঙ্কাল হয়ে নিজেই বসে আছে এখন চেয়ারে, তার কঙ্কালখচিত পতাকার কাছেই। মুহূর্তের জন্যেও এখন এই দৃশ্যটা যদি দেখতে পেত ডেকেইনি।'

পতাকাটা আবার ভাঁজ করে রবের দিকে ছুঁড়ে দিল কিশোর। 'রেখে দাও, চমৎকার ট্রফি। তুমি রাখতে না চাইলে পরে আমাকে দিয়ে দিয়ো।'

আরেক ড্রয়ারে পাওয়া গেল খুব সুন্দর একটা চুনি বসানো আঙটি।

'দেখি তো,' হাত বাড়াল ওমর। আঙটিটা নিয়ে দেখতে লাগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

অন্য আরেক ড্রয়ারে পাওয়া গেল শ'খানেক রূপার মুদ্রা। একটা তুলে নিয়ে দেখে বলল কিশোর, 'পিসেস অভ এইট। মুসা, একটা ব্যাগ-ট্যাগ পাও নাকি দেখো তো। নিয়েই যাই এগুলো। হ্যামারের হাতে পড়লে আর ফেরত পাওয়া যাবে না। আমরা যেমন দেখেছি, ওরাও দেখে ফেলতে পারে জাহাজটা।'

এরপর সবাই মিলে খুঁজল পুরো ঘর। প্রতিটি আলমারি খুঁজে দেখল। মোহর মিলল না কোথাও। রয়েছে গাদা গাদা সিল্ক, সাটিন আর মিহি সুতার কাপড়, পোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। জাহাজের খোলে ঢুকে, খোঁজাখুঁজি করল। মোহর পাওয়া গেল না, তবে কয়েক পিপা ছাতা পড়া চিনি, কফি আর ময়দা পেল।

অনেক জায়গা খোঁজার বাকি রয়ে গেল, থাকারও ইচ্ছে আছে ওদের। কিন্তু থেকে লাভ নেই। অন্ধকার হয়ে গেছে।

'আলো ছাড়া হবে না,' বলল ওমর।

'আলো থাকলেও রাতে থাকছি না আমি এখানে,' জোরে মাথা নাড়ল মুসা। 'লুই ডেকেইনির ভূত ঠিক এসে ঘাড় মটকাবে।'

মুসার বলার ধরনে হেসে ফেলল সবাই।

'এই, ওমর ভাই,' আবার বলল মুসা, 'খিদে পায়নি আপনার? চলুন না, বেরোই।'

'হ্যাঁ, চলো যাই। সকালে আবার আসব।'

কিন্তু যত সহজে বলে ফেলল, তত সহজে বেরোনো গেল না। উঠবে কিভাবে? ওমরের কাঁধে দাঁড়িয়ে ফোকরের ধার ধরে দোলা দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল মুসা, তক্তা ভেঙে ধুড়ুম করে পড়ল আবার নিচে, সবার ভয় হলো, স্যালুনের মেঝে ভেঙে না খোলে পড়ে যায়। ওভাবে বেরোনোর চেষ্টা বাদ দিতে হলো। একা বেরোতে কতখানি কষ্ট হয়েছিল ববের বাবার, উপলব্ধি করল ওরা। মনে পড়ল, জাহাজের খোল কেটে বেরিয়েছিল কলিনস।

খোঁজাখুঁজি করতেই ফোকরটা পাওয়া গেল, জাহাজের সামনের গলুইয়ের নিচে। হাতে হাতে ট্রফিগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। বিষণ্ন অতীত ছেড়ে বেরিয়ে এল যেন বর্তমান পৃথিবীর উজ্জ্বল তারাখচিত আকাশের নিচে।

যেভাবে রেখে গিয়েছিল, তেমনিই রয়েছে নৌকাটা। পানিতে নামিয়ে তাতে চড়ে বসল সবাই। ফিরে এল উপদ্বীপে।

'কাল খুব সকালে বেরোব,' যেতে যেতে বলল ওমর। নারকেলের মালায় নারকেলের পানি, শক্ত শুকনো খাবার গলায় আটকে গেলে সেই পানি দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছে। 'মোহর খোঁজার আগে এই দুর্গটাকে দুর্ভেদ্য করে নিতে হবে। প্রতিরোধ যাতে করতে পারি, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারব না এখানে, এক সময় দেখে ফেলবেই হ্যামার আর ইমেট চাব, জেনে যাবে কোথায় আছি আমরা। হয়তো বারডুও ফিরে আসবে। কি করবে তখন ব্যাটারা? আমি হলে, দ্বীপের প্রান্তে এসে পাথরের স্তূপের আড়ালে বসে থাকতাম, যাতে উপদ্বীপ থেকে কেউ বেরোতে না পারে। ওরাও যদি তাই করে? আমি হলে অবশ্য দেখামাত্র গুলি করতাম না, কিন্তু ওরা করবে।'

'কি করব আমরা কাল সকালে, বললেন না?' শুকনো মাংস চিবাতে চিবাতে বলল মুসা।

'প্রচুর নারকেল এনে জমিয়ে ফেলতে হবে। বারুদ আনতে হবে জাহাজ থেকে, লড়াই লেগে গেলে তখন অনেক বারুদের দরকার পড়বে। আর আজ রাত

থেকেই পাহারা দিতে হবে আমাদের।'

খাওয়া শেষ হলো। প্রথমে ববকে পাহারায় রাখার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। দু'ঘণ্টা পর এসে মুসাকে তুলে দেবে সে। এমনি করে একজনের পর একজন পাহারা দিয়ে রাতটা পার করে দেবে।

'ম্যাপটা ভালমত দেখা দরকার,' বলল কিশোর।

'এখনই?' বলল ওমর। 'সকালে দেখলে হয় না? খামোকা মোম জ্বালিয়ে লাভ কি?'

'ভাগ্য ভাল, আমাদের জিনিস আবার ছিনিয়ে আনতে পেরেছি হ্যামারের কাছ থেকে। কিন্তু তা না হলেও কি অন্ধকারে থাকতাম? এত নারকেল থাকতে?' হাসল কিশোর। 'আলোর অভাব হবে না।' পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে আলোর সামনে বিছাল সে। জাহাজ থেকে পালকের কলম, কালির দোয়াত নিয়ে এসেছে। কালি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তাতে সামান্য পানি ঢেলে নিতেই আবার কালি হয়ে গেল। পাতলা কালি, তবে কাজ চলবে।

'আরেকটা ম্যাপ এঁকে ফেলি,' বলল কিশোর। ডেকেইনির লগবুক থেকে একটা শাদা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে আরেকটা ম্যাপ আঁকল। ডেকেইনির আঁকা ম্যাপটার মতই হলো অবিকল, নকলটার মত ভুল জায়গায় চিহ্ন দিল না, যতদূর সম্ভব সঠিক জায়গায় দেয়ার চেষ্টা করল। সবই আঁকল ঠিকঠাক, কিন্তু কোনটা কিসের চিহ্ন জানে না। এক দুর্বোধ্য রহস্য মনে হলো। অন্য তিন জনের দিকে চেয়ে বলল, 'কিছু বোঝা যাচ্ছে?'

'তুমি বুঝেছ?' মুসা প্রশ্ন করল।

'না।'

'কিশোর পাশা যে রহস্যের মীমাংসা করতে পারেনি, আমরা তার কি কচুটা বুঝব? আমি ঘুমাতে যাচ্ছি, তুমি সমাধান করে জানিও,' উঠল মুসা, কম্বল বিছাবে।

'আরে দাঁড়াও, কাজ আছে,' হাত তুলল কিশোর।

'কি?' ঘুরে তাকাল মুসা।

'ওই দুই ভদ্রলোক,' ঘরের কোণ দেখাল কিশোর। 'ওদেরকে ঘরে রেখে ঘুমাতে অস্বস্তি লাগবে। চলো, সাগরে ফেলে দিয়ে আসি।'

'মাপ চাই, ভাই, আমি পারব না,' হাতজোড় করল মুসা।

'আরে দূর, এসো,' হাত ধরে টানল কিশোর, 'কঙ্কালই তো, ভয় কি? পাথরের যেমন প্রাণ নেই, ওগুলোরও নেই।'

কিন্তু কঙ্কাল দুটো বের করে ফেলার সময় দেখা গেল, মুসার চেয়ে কম ভয় পাচ্ছে না কিশোর, কম অস্বস্তি বোধ করছে না। হেঁইও হেঁইও করে কঙ্কাল দুটো পানিতে ফেলে দিল ওরা।

'বব, তুমি থাকো,' বলল ওমর। 'দু'ঘণ্টা পর এসে মুসাকে ডেকে দিয়ো।'

'কিন্তু সময় বুঝব কি করে?' প্রশ্ন তুলল বব। 'ঘড়ি কই?'

'অনুমান,' কিশোর বলল। 'ওই যে, ওদিকে নারকেল গাছগুলো দেখেছ? চাঁদ যখন গাছগুলোর মাথায় উঠবে, ধরে নেবে, দু'ঘণ্টা হয়েছে। ও হ্যাঁ, বন্দুক রেখো

সঙ্গে।'

'আই, আই, মিস্টার ট্রেলনী, স্যার,' ট্রেজার আইল্যাণ্ডের জিম হকিনসের সংলাপ ধার নিল বব। পাহারা দিতে চলল।

সাত

সময় যেন কাটতেই চাইছে না ববের। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিচ থেকে কথাবার্তা শোনা গেল, কমতে কমতে থেমে গেল এক সময়। নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। গ্রীষ্মমণ্ডলের রাত, কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ, অসহ্য নীরবতা। সামান্যতম শব্দ নেই কোথাও। পাথরে ঢেউ আছড়ে পড়ার মৃদু ছপছপ শব্দ ছিল, সেটাও থেমে গেছে। নারকেলের পাতা স্থির, তারাগুলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, এত কাছে মনে হচ্ছে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। আকাশ যেন মস্ত এক গম্বুজ, ওখান থেকে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে কেউ তারাগুলো। দিগন্তে উঁকি দিল লালচে চাঁদ, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল ওপরে, রূপালী করে দিল সাগরকে। রহস্যময় হয়ে উঠল দ্বীপটা। শাদা বালির সৈকত আর মাঝে মাঝে পাথরের স্তূপকে দেখে মনে হচ্ছে, সাগরের পানি থেকে মাথা তুলেছে কোন অজানা দানব।

অবাক হয়ে প্রকৃতির এই রূপ দেখছে আর ভাবছে বব। পাশে রাখা বন্দুকের গায়ে হাত বোলাল। ঠিক এখানটায় এমনিভাবে বন্দুক নিয়ে বসে দূর অতীতে এমনি কোন রাতে নিশ্চয় পাহারায় ছিল কোন জলদস্যু। যে দুটো কঙ্কাল ফেলে দিয়ে এসেছে খানিক আগে, তাদেরও কেউ হতে পারে। আচ্ছা, ওদেরই মত ববও তো একদিন কঙ্কালে পরিণত হবে, সেদিনও কি ঠিক এমনি থাকবে প্রকৃতি? এমনি করে চাঁদ উঠবে, জ্যোৎস্না বিলাবে, আকাশে জ্বলবে তারা? এমনিই থাকবে সব, জানে বব, কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চায় না। এই সুন্দর পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে সে একদিন, মানুষের মন থেকে চিরতরে মুছে যাবে তার স্মৃতি, ভাবতেই যেন কেমন লাগে। কোন দিন মনে হয়নি, কিন্তু এই পরিবেশে আজ হঠাৎ করেই মনে হলো, জীবনের কোন অর্থ নেই। এই জন্মানো, বেঁচে থাকা, তারপর একদিন মরে যাওয়া, এর কোন মানেই নেই।

আচ্ছা, এই দুর্গে কারা ছিল? ডেকেইনির লোক? নাকি দিগ্বিজয়ী মহানাবিক ড্রেক? জানে না বব, হয়তো কেউই জানে না, জানার কোন উপায় নেই। আহা, কি রোমাঞ্চকর দিনই না কাটিয়েছে তারা! মরে গেছে ঠিক, কিন্তু উপভোগ করে গেছে জীবনটা। আফসোস হলো ববের, কেন আরও দু'তিনশো বছর আগে জন্মাল না? ড্রেকের নাবিকদলের একজন হতে বড় ইচ্ছে করে। লুই ডেকেইনির দলের কেউ হতেও আপত্তি থাকত না তার। সেই তো জন্মাল, কিন্তু এমন এক যুগে, যখন ভাত-কাপড়ের চিন্তা করতেই সময় শেষ। দুত্তোর, জন্মানোর নিকুচি করি, লাথি মারি এই বেঁচে থাকার কপালে!—বিড়বিড় করল সে। ভাগ্যিস কিশোর পাশার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নইলে এই ক'দিনের অভিযানের স্বাদটুকুও পাওয়া হত না।

প্রচণ্ড হতাশা গ্রাস করল তাকে। কপালগুণে মোহর যদি পায়ও, বড়লোক

হয়তো হবে, খাওয়া-পরার ভাবনা হয়তো থাকবে না, কিন্তু লুই ডেকেইনির মত জলদস্যু কি আর হতে পারবে? পাবে সেই রোমাঞ্চের স্বাদ? হতে পারবে ড্রেকের মত দিগ্বিজয়ী নাবিক? পারবে না, কোনদিনই পারবে না, কারণ সেই যুগ আর নেই। চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। কাঠের জাহাজে পাল তুলে অজানার উদ্দেশ্যে বোরোনোর অবকাশ আর নেই। ববের ধারণা, মানুষ নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছে, ইঞ্জিন আবিষ্কার করে, লোহা আর ইস্পাত দিয়ে জাহাজ তৈরি করতে শিখে। মস্ত চিমনি দিয়ে ভকভক করে বেরোয় কালো ধোঁয়া, দূর, এ কোন দৃশ্য হলো নাকি? শাদা পাল ঘিরে চক্কর দিয়ে উড়ন্ত সী-গাল, সফেদ অ্যালবেট্রস, কোথায় সেই ছবি, আর কোথায় কালো…মাঝে মাঝে গেঁউউউউ করে কান ঝালাপালা করে দিয়ে বেজে ওঠা লোহার জাহাজের বিরক্তিকর বাঁশি…বাতাসে থাবা দিয়ে বিরক্তিকর শব্দ সরানোর চেষ্টা করল যেন বব।

কিন্তু এই মুহূর্তে জীবন খুব একটা একঘেয়ে নয় ববের জন্যে, অনেকের চেয়ে সে ভাগ্যবান। দারুণ রোমাঞ্চকর এক অভিযানে এসেছে। আর সত্যিই যদি গুপ্তধন পেয়ে যায় তাহলে তো এক লাফে বড়লোক। গুপ্তধন, মোহর! শব্দ দুটো উচ্চারণ করল সে বিড়বিড় করে। কোথায় আছে ওগুলো? ম্যাপটার কথা ভাবল। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি। আচ্ছা, মোহরটায় কোন সংকেত নেই তো? যেটা গর্তে ফেলে দিয়েছে ওমর ভাই? যেটাকে অভিশপ্ত ভাবা হচ্ছে?

যতই ভাবল বব, মনে হলো, উচিত হয়নি, মোটেই উচিত হয়নি ফেলে দেয়া। ভালমত দেখা দরকার ছিল। হয়তো ওতেই রয়েছে গুপ্তধনের নিশানা, আঁচড় কেটে বা অন্য কোনভাবে চিহ্ন দিয়ে রেখেছে হয়তো ডেকেইনি।

মোহরটা পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল ববের। খুব বেশি দূরে তো নয়। নৌকা নিয়ে যাবে আর আসবে, বড় জোর মিনিট দশেক লাগবে। এটুকু সময়ে কিছু ঘটবে না, নিজেকে বোঝাল বব। পাহারা ছেড়ে যাওয়া মোটেই উচিত হবে না, এটাও জানে। কিন্তু সব কিছুই এত বেশি শান্ত, অঘটন ঘটার আশংকা মনে আসতেই চাইছে না।

অবশেষে মনস্থির করে নিল সে, যাবে। পাহারা ছেড়ে যাচ্ছে বলে একটা অন্যায়বোধ পীড়া দিচ্ছে মনকে, জোর করে দমন করল সেটা। দ্রুত ছাত থেকে নেমে ঘরে ঢুকল। সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। শান্ত পরিবেশ। পা টিপে টিপে একধারের দেয়ালের কাছে এসে ঠেস দিয়ে রাখল রাইফেলটা, হাতড়ে বের করল তার পিস্তল, কোমরে গুঁজে বেরিয়ে এল চত্বরে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে নৌকা খুলে সাগরে ভাসাল। রওনা হলো দ্বীপের দিকে।

বিকেলে যেখান দিয়ে উঠেছিল, সেখান দিয়েই উঠল বব। পাথরের খাঁজে নৌকা রেখে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। ওপরে উঠে নিচে তাকিয়ে দেখল একবার। নির্জন, কোন সাড়াশব্দ নেই। কেন জানি মনে হলো তার, এমনি নীরবতা বিরাজ করছিল তখন গ্যালিয়নের ভেতর, লুই ডেকেইনির কঙ্কালটা দেখার পর। তার প্রেতাত্মা ঘোরাফেরা করছে না-তো? দূর, কি যা-তা ভাবছে? নিজেকে ধমক দিল সে। কিন্তু ভয় তাড়াতে পারল না মন থেকে। আবার তাকাল এদিক ওদিক। অস্বস্তি

বোধ করছে। আবার বোঝাল মনকে, 'মানুষ মরে গেলে আর কিছু করতে পারে না। ভূত-ফূত সব বাজে কথা।' গর্তটার কাছে এসে দাঁড়াল সে, ম্যাবরির ভয়ে যেটাতে লুকিয়েছিল, মোহরটা যেটাতে ফেলেছে ওমর, সেই গর্ত। আবার ফিরে তাকাল। চাঁদের আলোয় রহস্যময় মনে হচ্ছে বনভূমিকে, কিছু কিছু ছায়াকে মানুষের ছায়া বলে ভুল হচ্ছে। হ্যামার আর ইমেট চাব লুকিয়ে থেকে তাকে দেখছে না তো?

ভীষণ দুরুদুরু করছে বুক। গর্তে নেমে পড়ল বব। আশ্চর্য, মাটিতে হাত দিতেই পেয়ে গেল মোহরটা। হাতে নিয়েই মনে পড়ল ওটার অশুভ ক্ষমতার কথা। কাঁপা হাতে মোহরটা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। গর্তের বাইরে চ্যাপ্টা একটা পাথরে মোহরটা রেখে দু'হাতে ভর দিয়ে গর্ত থেকে বেরোতে গেল। কিন্তু গর্তের দেয়ালে বেরিয়ে থাকা একটা পাথরে আটকে গেল পিস্তল, হ্যাঁচকা টানে আবার নেমে আসতে বাধ্য হলো বব। বেল্ট থেকে খুলে গর্তে পড়ে গেল পিস্তল। যতই তাড়াহুড়ো করতে চায় আরও দেরি হয়ে যায়। বসে পড়ে পিস্তলটা হাতড়ে খুঁজতে শুরু করল।

হাতে ঠেকল গোল একটা কিছু, পিস্তল নয়। জিনিসটার আকার আর ওজন চমকে দিল তাকে। কিন্তু ডাবলুনটা তো রেখে দিয়েছে বাইরে, পাথরের ওপর। তাহলে এটা কি আরেকটা? উঠে মুখ বাড়িয়ে দেখল, ডাবলুনটা আগের জায়গায়ই আছে। কিন্তু হাতেও তো আরেকটা। চাঁদের আলোয় চমকাচ্ছে, ভুল হতেই পারে না। তারমানে দুটো হলো? অসম্ভব···বিশ্বাস করতে পারছে না সে। উত্তেজনায় কাঁপছে, কপাল বেয়ে দরদর করে ঝরছে ঘাম। ভূতের ভয় ফিরে এল আবার মনে। নিশ্চয় ডেকেইনির ভূতই এই কাণ্ড করছে, তাকে বোকা বানানোর জন্যে। কেন যে এসেছিল মরতে? কেন এসেছিল অভিশপ্ত মোহরের লোভে···

আরেকটা ভাবনা মাথায় আসতেই চকিতে দূর হয়ে গেল ভূতের ভয়। ঝট করে বসে পড়ে আঙুল দিয়ে খামচে মাটি সরাতে শুরু করল। এক গাদা গোল জিনিস হাতে ঠেকল, গলা শুকিয়ে গেল তার। বেড়ে গেল বুকের দুরুদুরু। দম বন্ধ হয়ে যাবে যেন। গর্তের দেয়ালে হেলান না দিয়ে আর পারল না, এক মুঠো গোল জিনিস তুলে নিয়ে দেখল। শব্দ শুনল। না, কোন ভুল নেই। মোহরই। পেয়েছে! পেয়ে গেছে সে ডেকেইনির গুপ্তধন! 'মোহর! মোহর!' চেঁচিয়ে উঠল সে নিজের অজান্তেই। ভুলে গেল পিস্তলের কথা, ভুলে গেল কোথায় রয়েছে। বসে পড়ে আবার মাটি খুঁড়তে শুরু করল আঙুল দিয়ে। আরও মোহর ঠেকল হাতে। হাতে জোরে কামড় মারল সে। জেগেই আছে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে না।

জামা পাজামায় পকেট নেই, মোহর নিয়ে যেতে পারবে না, যেখানে ছিল সেখানেই ওগুলো আবার ফেলে বেরোতে যাবে, এই সময় কানে এল মানুষের কথা। ধড়াস করে এত জোরে লাফ মারল হৃৎপিণ্ড, ববের মনে হলো বুকের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার চিনতে পারছে কণ্ঠস্বর। হ্যামার।

'এদিকেই কোথাও লুকিয়েছে ব্যাটারা, তখনও বলেছি, এখনও বলছি,' তিক্ত শোনাল হ্যামারের কণ্ঠ।

'তো হলো কি তাতে?' ইমেট চাব বলল। 'ঘাবড়ানোর কি আছে? কাল বেড়

দিয়ে ধরব ব্যাটাদের!'

'ওরা কি করছে যদি জানতে পারতাম,' বলল হ্যামার। পরক্ষণেই স্বর বদলে গেল। 'আরে, ওটা কি?'

দ্রুত এগিয়ে এল দুই জোড়া পায়ের শব্দ, শুনতে পেল বব। গর্তের পারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ে কুঁকড়ে গেল সে।

'আরে, মোহর,' ইমেট চাবের বিস্মিত কণ্ঠ, 'এটা এল কোথা থেকে?'

'নিশ্চয় মোহরগুলো খুঁজে পেয়েছে ব্যাটারা। নেয়ার সময় পড়ে গেছে কোনভাবে।'

'না, ম্যাবরির পকেট থেকে পড়েছে। ওর কাছে একটা মোহর ছিল, মনে আছে? এখানেই পড়েছিল সে, এখান থেকেই তুলে নিয়ে গেছি। ওই যে, রক্ত। মোহরটা রাখতে পারল না, বেচারা। আর দেখেই বা কি হবে? যেখানে গেছে, ওখানে মোহর কোন কাজে লাগবে না।'

'হাত সরাও, ইমেট, আমি আগে দেখেছি, ওটা আমার,' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল হ্যামার।

'কি হলো, বিগ? এটা কি ধরনের ব্যবহার? একটা মোহরই তো, এটার জন্যে...'

'দাও বলছি ওটা!' হ্যামারের গর্জনে গর্তে থেকেও কেঁপে উঠল বব।

'নইলে কি করবে?' পাল্টা গর্জন করে উঠল ইমেট চাব। 'ও ছুরি...ছুরির ভয় দেখাচ্ছ...,' কথা বন্ধ হয়ে গেল তার আচমকা, বিচ্ছিরি ঘড়ঘড়ানি শোনা গেল। ধড়াস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল ভারি কিছু, পাথরে ঘষাঘষির শব্দ হলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর চুপ।

জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল বব, অনেক কষ্টে সামলাল নিজেকে, চিৎকার করে উঠেছিল প্রায়। মনের পর্দায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ছবি, গর্তের বাইরে কি ঘটেছে।

'আমার সঙ্গে ইতরামি...আমার সঙ্গে...,' ভয়ংকর কণ্ঠে বিড়বিড় করল হ্যামার। 'হুঁহ্!'

পায়ের শব্দ চলে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বব। কিন্তু আরও মিনিট দশেক বাইরে বেরোনোর সাহস হলো না। কুঁকড়ে বসে থাকতে থাকতে হাতে-পায়ে খিল ধরার অবস্থা। অবশেষে আস্তে করে সোজা হয়ে উঁকি দিল গর্তের বাইরে। এক নজরই যথেষ্ট, দ্বিতীয় বার আর ইমেট চাবের গলাকাটা লাশটার দিকে চাওয়ার সাহস হলো না।

মোহর নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করল না বব, পিস্তলটা খুঁজে বের করার জন্যেও থামল না আর। এক লাফে বেরিয়ে এসে সোজা দৌড় দিল নৌকার দিকে। বার দুই হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল, পায়ের চামড়া ছড়ে গেল ধারাল পাথরে লেগে, কেয়ারই করল না। নৌকার ওপর এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কাঁপা আঙুলে কি ভাবে দড়ি খুলল, বলতে পারবে না, নৌকাটা এনে ফেলল পানিতে। লাফিয়ে উঠে বসে দাঁড় বেয়ে তীর বেগে ছুটল। ঘোরের মধ্যে যেন পেরিয়ে এল প্রণালীটা, নৌকা বাঁধল ঘাটে, একেক লাফে দুটো তিনটে করে সিঁড়ি

ডিঙিয়ে উঠে এল ওপরে।

'থামো! কে?' বরফ-শীতল ওমরের কণ্ঠ।

'আ-আমি, বব,' হাঁপাচ্ছে বব।

'উঠে এসো।'

চত্বরে উঠে এলো বব। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ওমর। অন্য দু'জন তার পেছনে।

'কোথায় গিয়েছিলে?' কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওমর।

'দ্বীপে।...আ-আমি পেয়েছি...,' হাঁপানোর জন্যে কথা বলতে পারছে না।

ধারাল ছুরির মত কেটে বসল যেন ওমরের কথা, 'কি পেয়েছ সেটা পরের কথা। পাহারা ছেড়ে গিয়েছ কেন?'

'কিন্তু...'

'কোন কৈফিয়ত শুনতে চাই না। গেছ কিনা, বলো আগে।'

'হ্যাঁ।'

'অন্যায় করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আর কক্ষনো করবে না। ভাগ্য ভাল, কিছু ঘটেনি। কিন্তু ঘটতে পারত। সবাইকে বিপদে ফেলে দিতে পারতে।'

'সরি! আর এমন হবে না।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এটা করলে কেন?'

'ডাবলূনটা আনতে গিয়েছিলাম।'

'কী?' ধাক্কা খেয়ে যেন পিছিয়ে এল ওমর। 'সেই অভিশপ্ত মোহর?'

'হ্যাঁ। ভাবলাম...'

'ভাবাভাবি পরের কথা। মোহরটা এনেছ? জলদি ফেলো, ছুঁড়ে ফেলো পানিতে।'

'আনতে পারিনি। হ্যামার নিয়ে গেছে।'

'কি করে জানলে?'

'আমি গর্ত থেকে তুলে একটা পাথরে রেখেছিলাম। একটু পরেই হ্যামার আর ইমেট চাব এল। মোহরটা দেখে এ বলে আমি নেব, ও বলে আমি নেব। কথা কাটাকাটি, শেষে ইমেট চাবের গলা ফাঁক করে দিল হ্যামার। মোহরটা নিয়ে চলে গেল।'

মুসা আর কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। 'কি, বলেছিলাম না, মোহরটা অভিশপ্ত?' বদলে গেছে তার কণ্ঠস্বর, ফ্যাসফেঁসে হয়ে উঠেছে। 'বউনের মোহরের জন্যে আরেকজন মরল। হ্যামার নিয়ে গিয়ে কপালে দুর্গতি টেনে আনল আর কি।' ববের দিকে ফিরল আবার সে। এতক্ষণ কি করলে?'

'গর্তে বসেছিলাম। আরও অনেকগুলো পেয়েছি।'

'কি পেয়েছ?'

'মোহর,' বোম ফাটাল যেন বব।

চুপ হয়ে গেল সবাই।

'আরও মোহর পেয়েছ?' বলল অবশেষে কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'কতগুলো?'

'কয়েকশো হতে পারে, কিংবা কয়েক হাজার,' হাত উল্টাল বব।

'শিওর?' ওমর বলল।

'শিওর। হাতে নিয়ে দেখেছি।'

'ঘুমিয়ে পড়োনি তো?' ওমরের কণ্ঠে স্পষ্ট সন্দেহ। 'স্বপ্ন দেখেছ?'

এক পা সামনে বাড়ল বব। চেঁচিয়ে উঠল, 'স্বপ্ন? মোটেই না। বললাম তো, হাতে নিয়ে দেখেছি।'

এগিয়ে এল কিশোর : 'কোথায় পেলে বব?'

'ওমরভাই যে গর্তে ডাবলূনটা ফেলে দিয়েছিল। ম্যাবরির তাড়া খেয়ে ওটাতেই লুকিয়েছিলাম।'

'নাহ্, বিশ্বাস হচ্ছে না!' গাল চুলকাল ওমর, মাথা নাড়ল আনমনে। 'এত সাধারণ একটা গর্তে মোহর লুকিয়েছিল ডেকেইনি?'

'হ্যাঁ, তাই,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'এখন বুঝতে পারছি। ম্যাপে পাহাড় বোঝানো আছে, আঁকাবাঁকা লম্বা দাগ দিয়ে, দাগের এক জায়গায় ছোট একটা গোল চিহ্ন, তারমানে গর্তটা। ওই গর্তে মোহর রেখে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছিল ডেকেইনি। বব, হ্যামার আর ইমেট চাব ওখানে কি করতে এসেছিল?'

'কথাবার্তা শুনে তো মনে হলো, আমাদের খুঁজতে।'

'কি কি বলেছে, শুনেছ ভালমত?'

'খুব বেশি কিছু বলেনি। তবে একটা কথা জরুরী মনে হলো, আগামীকাল বেড় দিয়ে নাকি ধরবে আমাদের।'

'উঁহুঁ!' মুখ বাঁকাল মুসা। 'পুকুরে জিয়ানো মাছ পেয়েছে আর কি। হারামির বাচ্চা! কিভাবে ধরবে, বলেছে?'

'না তবে কথাটায় বেশ জোর ছিল। এমনভাবে বলল, যেন আগামীকাল বিশেষ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তাতে আমাদের ধরা খুব সহজ হয়ে যাবে।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল ওমর। 'বুঝতে পারছি না। কিভাবে আমাদের ধরবে? কিছুক্ষণ আগে ছিল চারের বিরুদ্ধে দুই, এখন হয়েছে এক। ম্যাবরি আহত, তাকে গোণার বাইরে রাখা যায়...'

'মনে হয় মারা গেছে,' বলে উঠল বব। 'ইমেট চাব বলছিল, ম্যাবরি এমন এক জায়গায় গেছে, যেখানে মোহর কোন কাজে লাগবে না তার।'

'অভিশপ্ত ডাবলূনের আরও শিকার,' নরম গলায় বলল ওমর। 'ইমেটের লাশ কোথায়?'

'গর্তটার ধারেই পড়ে আছে।'

'কাল সকালেই ওকে সরিয়ে ফেলতে হবে। লাশ দেখতে ফিরে এসে না আবার মোহর আবিষ্কার করে বসে হ্যামারের বাচ্চা। এখন রাতের বেলা কিছু

করতে পারব না, তবে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগব। চলো, ঘুমিয়ে নিই। মুসা, তুমি পাহারায় থাকো। ববের মত ঘাড়ে ভূত চাপবে না তো?'

হাসল মুসা। মাথা নাড়ল।

ওমর আর কিশোরের পেছন পেছন ঘরে নেমে এল বব। শুয়ে খালি এপাশ-ওপাশ করতে লাগল, ঘুম এল না সহজে। ঘুমের মধ্যেও দুঃস্বপ্ন দেখল, হ্যামার আর লুই ডেকেইনি হাতে হাত মিলিয়েছে, মস্ত দুই ছুরি নিয়ে তাড়া করছে তাকে।

আট

ধরমড়িয়ে উঠে বসল বব। অন্ধকার রয়েছে এখনও, আবছা একটা মূর্তিকে নড়াচড়া করতে দেখল সে। আরও ভালমত দেখার জন্যে সোজা হয়ে বসল।

বাইরের কেউ নয়, ওমর। ববকে নড়াচড়া করতে দেখে বলল, 'উঠে পড়ো। বেরোনোর সময় হয়েছে।'

'এখনও ভোর হয়নি, না?'

'হয়নি, তবে হবে। তারার আলো কমে গেছে, পাঁচ মিনিট পরেই ভোরের আলো ফুটবে। আরে এই মুসা, আবার শুয়ে পড়লে যে? ওঠো, ওঠো, নারকেল ভেঙে নাস্তা সেরে নাও। আমি বন্দুকগুলো গুছিয়ে নিই।'

হাই তুলতে তুলতে উঠে বসল মুসা। 'দরকার পড়বে?'

'শত্রু যখন রয়েছে, পড়তেও পারে।'

'কিশোর কই?'

'ছাতে, পাহারা দিচ্ছে, নাস্তাও সেরে নিচ্ছে। জলদি করো. রেডি হয়ে নাও।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'হায় আল্লাহ, মোহরের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ওগুলো আনতে যাচ্ছি আমরা?'

'হ্যাঁ। ওগুলোও আনতে হবে।'

নারকেল ভাঙল মুসা। ঢকঢক করে পানি খেলো। নারকেল সুদ্ধ অর্ধেকটা মালা ববকে দিয়ে বাকি অর্ধেকটা দিতে গেল ওমরকে।

'আমি খেয়েছি,' বলল ওমর। 'তোমরা জলদি সেরে নাও।'

'নৌকায় বসেই খেতে পারব, চলুন যাই,' মুসা বলল।

চত্বরে বেরিয়ে কিশোরকে ডাকল ওমর, ছাত থেকে নামতে বলল। ফেকাসে নীল হয়ে গেছে আকাশ, পুব দিগন্তে লালচে আলো। সূর্য উঠবে। কি ভেবে ছাতে উঠে গেল ওমর। ল্যাগুন আর তার আশপাশে যতদূর দেখা যায়, দেখল। হ্যামারকে দেখা যাচ্ছে না, উভচরটাও না। ফেরেনি সিডনি বারডু।

একটা করে মাসকেট নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা, নৌকায় উঠল।

পাঁচ মিনিটে পেরিয়ে এল প্রণালী, পাথরের খাঁজে তুলে রাখল নৌকাটা।

বব আর কিশোরকে দাঁড়াতে বলল ওমর। 'মুসা, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কাজ আছে, সেরে ডাকব। তোমরা পাহারা দাও। হ্যামারকে দেখলে জানাবে।'

একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল কিশোর। কি কাজ সারতে গেছে ওমর ভাই, অনুমান করতে পারছে। কিছুক্ষণ পর উল্টো দিকে পানিতে ঝপাং করে শব্দ হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'ভাল,' বিড়বিড় করল সে, 'ইমেট চাবের লাশ আর দেখতে হলো না আমাকে। সোনার লোভ কত মানুষের যে সর্বনাশ করল!'

'স্বর্ণ সর্বনাশ করেনি, মানুষ নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছে,' গম্ভীর হয়ে বলল বব।

ওমরের ডাক শোনা গেল। তাড়াতাড়ি উঠে ছুটল বব আর কিশোর।

'বব,' ওমর বলল, 'আগে হাঁটো, পথ দেখাও। মোহর তুমি খুঁজে পেয়েছ, আগে গর্তে নামার সম্মান তোমার প্রাপ্য।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ববের মুখ। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সঙ্গীদের। গর্তটার কিনারে এসে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'ওটা।'

'আল্লাহ্! সত্যিই তো,' গর্তে উঁকি দিয়ে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ওমর।

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোর আর মুসার মুখ।

লাফিয়ে গর্তে নেমে এক মুঠো মোহর তুলল ওমর। 'ঠিকই বলেছ তুমি, বব। কয়েক হাজারের কম না।'

'আরও বেশিও হতে পারে,' বলল বব। 'গুণব নাকি?'

'এক মিনিট,' হাত তুলল কিশোর, 'মাথা গরম করলে চলবে না। এখানে বসে গোণা রিসকি হয়ে যাবে, আর গোণার দরকারই বা কি? যা আছে তো আছেই। এগুলো এখান থেকে নিতে হলে ওই দুর্গেই নিতে হবে। তারপর মোহর পাহারা দিয়ে বসে থাকতে হবে ওখানে, কতদিন কে জানে। ঝড় উঠলে, সাগরের অবস্থা খারাপ হলে বেরোতে পারব না, দ্বীপে আসতে পারব না, মোহর সামলাতে গিয়ে শেষে না খেয়ে মরতে হবে। ওদিকে হ্যামার কি করছে সে-ই জানে। চুপ করে বসে থাকার পাত্র সে নয়, নিশ্চয় কোন শয়তানী বুদ্ধি আঁটছে। শীঘ্রি কিছু একটা করবে সে। আমাদের হুঁশিয়ার থাকা দরকার।'

'ঠিকই বলেছ,' গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো ওমর। 'তৈরি থাকতে হবে আমাদের। মুসা, নারকেল কুড়াও গিয়ে। যত বেশি পারো, জমাও। কিশোর, জাহাজটায় যেতে পারবে আবার?'

'পারব। কেন?'

'বারুদ আনতে হবে।'

'আচ্ছা,' মাথা কাত করল কিশোর।

'বব,' বলল ওমর, 'যাও তো, এক দৌড়ে গিয়ে বালতিটা নিয়ে এসো, ফুটা বালতিটা। মোহরগুলো নিতে হবে। আমি বাইরে তুলে রাখছি।'

'হ্যামার এলে?' মুসা প্রশ্ন করল।

'আসুক। চারজনের বিরুদ্ধে যদি লাগার সাহস থাকে, আসুক না। পকেটে অভিশপ্ত ডাবলূন, সে-তো এমনিতেই মরা। যাও, তোমরা যার যার কাজে চলে যাও।'

নারকেল কুড়িয়ে স্তূপ করে ফেলল মুসা। বালতি নিয়ে এলো বব। কিশোরও

বারুদের পিপে নিয়ে হাজির—জাহাজে ঢোকা আর বেরোনোর পথ পেয়ে গেছে, কাজটা আর মোটেই কঠিন নয় এখন। মোহর তুলে গর্তের পাড়ে জমাচ্ছে ওমর।

সূর্য অনেক উপরে উঠেছে। কড়া রোদ। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল ওমর, 'মুসা, নারকেল ভাঙবে? খুব খিদে পেয়েছে।'

'এখুনি আনছি,' নারকেল আনতে চলে গেল মুসা।

'বারুদ কতখানি আনলে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ওমর।

'আধ পিপার বেশি। এর বেশি আর বইতে পারলাম না।'

'ওতেই চলবে। দুর্গেও কিছু আছে। ছোটখাট লড়াই ঠেকানো যাবে।'

'লড়াই হবেই? কিন্তু বুঝতে পারছি না, লড়াইটা কার বিরুদ্ধে করব? হ্যামার তো একলা,' নিজের সঙ্গেই আলোচনা করছে যেন কিশোর। 'যাকগে, যখন হয় তখন দেখা যাবে। এখন মোহর সরানো দরকার।'

'হ্যাঁ,' ওমর বলল, 'অনেক মোহর। সরাতে সময় লাগবে। তুলছিই শুধু, শেষ আর হয় না।'

নারকেল ভেঙে নিয়ে এল মুসা। গর্তের পাড়ে বসে খেলো চারজনে, জিরিয়ে নিল।

'কিশোর,' ওমর বলল, 'তুমি আর মুসা মোহরগুলো দুর্গে নিতে থাকো। আমি আর বব তুলে বালতি ভরে দিচ্ছি।'

বার বার নৌকা নিয়ে আসা আর যাওয়া, বেশ পরিশ্রমের কাজ, গর্ত খুঁড়ে মোহর তোলাও কম মেহনত নয়। সময় লাগল অনেক। কিন্তু অবশেষে শেষ হয়ে এল কাজ। শেষবারের মত বালতি ভরা হলো মোহর দিয়ে। আর নেই। ওমরের অনুমান, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মোহর নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

'যাক বাবা, সারলাম, বাঁচা গেল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওমর। 'কিন্তু হ্যামারের পাত্তা নেই কেন? কি করছে?' একটা শব্দ শোনা গেল। 'ওই যে সাড়া বোধহয় মিলল। বব, এক দৌড়ে গিয়ে দেখে এসো তো।'

সৈকতে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল বব। হাঁ করে চেয়ে রইল এক মুহূর্ত তারপর ঘুরে দৌড় দিল। দূরে থাকতেই চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি আসুন, জলদি! পালাতে হবে!' নৌকার দিকে ছুটল সে।

পাথরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তিনজনে। 'কি হয়েছে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ওমর।

'সৈন্য!' জবাব দিল বব। 'ম্যারাবিনা থেকে, সৈন্য নিয়ে এসেছে,' কণ্ঠে আতংক, 'অনেক সৈন্য। এদিকেই আসছে ওরা।'

আর দেরি করল না ওমর। ছোঁ মেরে মাসকেট তুলে নিল, হাত বাড়াল বালতির দিকে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বালতিতে পা লাগিয়ে টান মেরে বসল কিশোর, কাত হয়ে পড়ে গেল বালতি, ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত মোহর। কুড়িয়ে তুলতে গেল আবার ওগুলো।

'রাখো রাখো,' বলে উঠল ওমর। 'তোলার সময় নেই। জলছদ নৌকার দিকে

দৌড় দাও।'

নৌকা পানিতে নামিয়ে দাঁড় হাতে তৈরি হয়ে আছে বব। কিশোর আর মুসা উঠল। গভীর পানিতে নৌকা ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল ওমর। এক পাশে কাত হয়ে বেশ খানিকটা পানি উঠল নৌকায়, উল্টে যাচ্ছিল প্রায়।

পাথরের স্তূপের কাছ থেকে শোনা গেল সম্মিলিত চিৎকার। ওদের দেখে ফেলেছে সৈন্যরা। খানিকক্ষণ পর আবার শোনা গেল চিৎকার।

'মোহরগুলোও দেখেছে,' ববের হাত থেকে দাঁড় নিয়ে জোরে জোরে বাইতে শুরু করল ওমর।

কিশোরের ছড়িয়ে ফেলা মোহরগুলোই প্রাণ বাঁচাল ওদের। রাইফেলের নিশানা করে ফেলেছিল কয়েকজন সৈন্য, ট্রিগার টিপতে যাবে, এই সময় তাদের কানে এল, 'মোহর! মোহর!' চিৎকার। অন্যেরা লুটছে, তারাই বা বাদ পড়ে কেন? ছুটল তারাও। গিয়ে দেখে সত্যি মোহর কুড়াচ্ছে তাদের সঙ্গীসাথীরা, রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে তারাও কুড়াতে লেগে গেল। হ্যামারের শত চিৎকারেও কান দিল না কেউ।

ইমেট চাবের অটোমেটিকটা নিয়ে নিয়েছিল হ্যামার, ওটা নিয়েই ছুটে এল সৈকতে। রাগে, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে, হাত ঠিক রাখতে পারল না, এলাপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ল, নৌকার ধারেকাছে এল না একটাও।

সব মোহর কুড়িয়ে পকেটে ভরল সৈন্যরা, আর একটাও পড়ে রইল না। রাইফেল তুলে নিয়ে ফিরে এল আবার সৈকতে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দূরে চলে এসেছে নৌকা। গুলি করল সৈন্যরা, দু'একটা বুলেট নৌকার একেবারে কাছে পানি ছিটাল, কিন্তু লাগল না কারও গায়ে।

'গুলি করো, কিশোর,' বলল ওমর। 'কারও গায়ে লাগুক না লাগুক, ভয় দেখাও।'

গর্জে উঠল কিশোরের মাসকেট। প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। এত ধাক্কা দেবে কল্পনাও করেনি সে, বাঁকা হয়ে গেল এক পাশে। পাথরে বাড়ি লেগে বিকট শব্দ তুলে সৈন্যদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল বল। চোখের পলকে ডাইভ দিয়ে আড়াল নিল ওরা। ওখান থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকল একনাগাড়ে।

নিরাপদেই সিঁড়ির গোড়ায় এসে ভিড়ল নৌকা।

'জলদি উঠে যাও,' বলল ওমর। 'একবারে একজন করে।'

লাফিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে এল তিন কিশোর। ঘাটের কাছে নৌকাটাকে শক্ত করে বেঁধে ওমরও উঠে এল। 'হাউফ্‌ফ্‌,' করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়ল অন্যদের পাশে, একটা নিচু পাথরের দেয়ালের আড়ালে। 'বড় বাঁচা বেঁচেছি। কিন্তু ব্যাটারা এল কিভাবে?'

ছাতে উঠল ওমর, হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল কিনারে। সাবধানে উঁকি দিল। যা দেখার দেখে পিছিয়ে এসে বলল, 'অবস্থা ভাল না।'

'কি?' জানতে চাইল কিশোর।

'জাহাজ নিয়ে এসেছে ব্যাটারা, সাইজ দেখে মনে হলো ট্রলার। কোস্ট

গার্ডদের বোধহয়। কিন্তু জানল কিভাবে…'

'বারডু, সিডনি বারডু,' বলল কিশোর। 'ও-ই গিয়ে খবর দিয়েছে ম্যারাবিনায়, সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল নিশ্চয় হ্যামার। অ্যালেন কিনি মরেছে বটে, কিন্তু তার দোসরগুলো তো আছে। কোনটার চেয়ে কোনটা কম শয়তান না।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' তর্জনী নাড়ল ওমর। 'ইউনিফর্ম পরা ওই শয়তানটাকেও দেখেছি সৈন্যদের সঙ্গে, ওই যে ওই অফিসারটা, যেটা এসে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে।'

'কতজন আছে?'

'ঠিক বোঝা গেল না, তিরিশ-চল্লিশ কিংবা তার বেশিও হতে পারে।'

'হুঁ। ভাগ্যিস, নারকেলগুলো এনে রেখেছিলাম। আরি…,' শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর।

'বারডু! বারডু আসছে,' চেঁচিয়ে বলল মুসা। হাত তুলে দেখাল, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উড়ে আসছে বিমানটা।

কপালে হাত রেখে দেখল ওমর, মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, আমাদের উড়চরটাই। সহজে ছাড়বে না, বোঝা যাচ্ছে।'

ছাতে উঠে এল চারজনেই, নিচু দেয়ালের ছোট ছোট ফোকর (বন্দুকের নল ঢুকিয়ে শত্রুদের ওপর গুলি চালানোর জন্যে তৈরি হয়েছে ফোকরগুলো) দিয়ে দেখছে। সৈকত থেকে সামান্য দূরে জঙ্গলের ছায়ায় গিয়ে বসেছে সৈন্যরা। হাত নেড়ে তাদেরকে কি যেন বলছে হ্যামার।

ফিরল হ্যামার। এগিয়ে এল সৈকত ধরে। দুর্গের দিকে চোখ।

'কি ব্যাপার?' বিড়বিড় করল ওমর।

'আরি, মিল করতে আসছে মনে হয়!' অবাক কণ্ঠে বলল কিশোর।

হ্যামারের হাতে একটা লাঠি, মাথায় শাদা কাপড় বাঁধা। পানির একেবারে কিনারে এসে উঁচু একটা পাথরে চড়ল, লাঠিটা মাথার ওপর তুলে কাপড় নাড়ল জোরে জোরে। চেঁচিয়ে বলল, 'এই, শুনছ? এইই, তোমরা?'

'আমাকে কভার দাও,' ছেলেদেরকে বলল ওমর, আমি বললেই গুলি চালাবে।' হ্যামারকে বলল, 'কী? চেঁচাচ্ছ কেন?'

'একটা অফার দিতে এসেছি,' বলল হ্যামার।

'বলো।'

'মোহরগুলো দিয়ে দাও, বিনিময়ে তোমাদেরকে ম্যারাবিনায় পৌঁছে দেব।'

হাসল ওমর। 'ধন্যবাদ। ম্যারাবিনায় যাব না।'

'মোহরগুলো দেব না?' রেগে উঠছে হ্যামার।

'যা পেয়েছ পেয়েছ, আর একটাও না।'

'ঠিক আছে,' দাঁতে দাঁত চাপল হ্যামার। 'ধরে এমন ধোলাই দেব, গলার এই জোর থাকবে না। বলতে দিশে পাবে না, কোথায় রেখেছ মোহর।'

'ধোলাই তো পরের কথা, আগে ধরতে হবে তো আমাদের?'

'শাআলা!' গাল দিয়ে উঠল হ্যামার। 'দাঁড়া, আগে ধরি, জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে

নেব।' মুখ খিস্তি করে আরও কয়েকটা গাল দিল সে, ঘুসি পাকিয়ে হাত ঝাঁকাল বার কয়েক। দুপদাপ করে নেমে ছুটে গেল নিজের লোকজনের কাছে। মিনিটখানেক পর তিনজন সৈন্য রাইফেল হাতে ছুটে গেল ট্রলারের দিকে।

'কি করতে চায়?' নিচু কণ্ঠে বলল কিশোর।

'নৌকা নিয়ে আসবে মনে হচ্ছে,' বলল ওমর। 'লড়াই করতেই হচ্ছে। চত্বরে স্তূপ করে রাখা হয়েছে চকচকে সোনালি মোহরগুলো। 'তেমন বুঝলে সব মোহর পানিতে ফেলে দেব, তবু ব্যাটাদেরকে দেব না। চলো, রেডি হই।' ছাত থেকে নেমে বলল সে, 'আমাদের কাছে মাসকেট আছে, জানে হ্যামার, কিন্তু ওগুলোর খবর জানে না,' হেসে কামানগুলো দেখাল। 'সুইভেল-গানটার কথাও জানে না। পয়লা চোটেই ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে হবে।'

কাজে লেগে গেল চার অভিযাত্রী। কড়া রোদ মাথার ওপরে। দরদর করে ঘামছে ওরা, কামান-বন্দুকে বারুদ ঠাসছে। পাঁচ পাউণ্ড ওজনের একটা গোলা তুলে নিয়ে বলল মুসা, 'এটা যদি লাগে হ্যামার মিয়ার মুখে? ডেনটিস্ট দেখানোর আর দরকার পড়বে না?' বলেই ঢুকিয়ে দিল একটা কামানে।

তার রসিকতায় হাসল অন্যেরা।

বেজায় ভারি সুইভেল-গানটা। নিচ থেকে এনে প্রণালীর দিকে নিশানা করে বসাতে গিয়ে ঘামে চুপচুপে হয়ে গেল একেকজন। বারুদের পিপা, গুলি, পিস্তল-বন্দুক, এমনকি ছুরি-বল্লম যা আছে, সব নিয়ে আসা হলো ওপরে, হাতের কাছে রাখা হলো। এভাবে দেখল ওমর, ওভাবে দেখল, সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে।'

'আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়?' প্রস্তাব রাখল কিশোর। 'লুই ডেকেইনির নিশানটা উড়িয়ে দিই?'

'খুব ভাল হয়,' আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠল বব। 'দারুণ হয়।'

'ভাল বলেছ,' হাসিতে ঝকঝকে শাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার।

'মন্দ বলোনি,' ওমরও হাসছে।

ববের উৎসাহই বেশি। ছুটে নিচে গিয়ে কালো পতাকাটা নিয়ে এল সে। নৌকার দাঁড়ের মাথায় বেঁধে উড়িয়ে দিল ছাতের ওপরে। সুর করে গেয়ে উঠল ট্রেজার আইল্যাণ্ডের জলদস্যুদের সেই বিখ্যাত গান, 'ফিফটিন মেন অন দা ডেড ম্যানস চেস্ট, ইয়ো হো হো, অ্যাণ্ড আ বটল্ অভ্ রাম।'

ববের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোরাস গাইল অন্যেরাঃ 'ড্রিংক অ্যাণ্ড দা ডেভিল হ্যাড ডান ফর দা রেস্ট, ইয়ো হো হো, অ্যাণ্ড আ বটল্ অভ রাম।'

ফোকর দিয়ে দেখল কিশোর, এদিকেই চেয়ে আছে সৈন্যরা। মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে, কিন্তু তাজ্জব যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'ওরা ভাবছে, আমরা পাগল হয়ে গেছি।'

'ভুল ভাবছে?' হাসিতে উজ্জ্বল ওমরের মুখ। হঠাৎ সাগরের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে বলল, 'মাথা নামাও! ওরা আসছে।'

ল্যাগুনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে একটা নৌকা, দাঁড় টানছে চারজন লোক। তীর ঘেঁষে চলছে। গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা। হ্যামারকে মাথা নিচু করে সেদিকে ছুটে যেতে দেখা গেল। খানিক পরে আড়াল থেকে আবার বেরিয়ে এল নৌকাটা।

'কতজন?' বিড়বিড় করল কিশোর।

'চোদ্দ-পনেরোজন হবে,' আন্দাজ করল ওমর।

দ্বীপের চোখা প্রান্তের কাছে চলে এল নৌকা। লোকের ভারে প্রায় ডোবে ডোবে। বার বার হাত ঝাঁকি দিয়ে কি যেন বলছে হ্যামার, বোধহয় আরও জোরে দাঁড় টানতে বলছে।

'আমি না বললে গুলি করবে না,' নিচু গলায় নির্দেশ দিল ওমর।

আরও এগিয়ে এল নৌকা।

হঠাৎ আদেশ দিল ওমর, 'ফায়ার!'

গর্জে উঠল মাসকেট, বার বার তীরের পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো বিকট আওয়াজ। নৌকার পাশের পানি ছিটকে উঠল গুলি লেগে। পাটাতনে নুয়ে পড়ে গেল নৌকার একজন। কিন্তু দাঁড় বাওয়া থামাল না ওরা, দ্রুত এগিয়ে এল।

'গুলি করো,' আদেশ দিল আবার ওমর। 'থেমো না।'

আরও দু'জন সৈন্য পড়ে গেল। দু'হাত শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল একজন, বাঁকা হয়ে পানিতে পড়ল ঝপাং করে। একবার কাত হয়ে আবার সোজা হলো নৌকাটা, থামল না, এগিয়ে আসছে আরও দ্রুত।

মাসকেট ফেলে সুইভেল-গানের কাছে চলে এল ওমর। নৌকার দিকে নল ফেরাতে ফেরাতে অদ্ভুত হাসি ফুটল মুখে। টাচ-হোলে কিছু আলগা বারুদ ঢেলে দিয়ে কম্বল-ছেঁড়া দিয়ে বানানো সলতেয় আগুন ধরিয়ে দাগল কামান। নলের মুখ দিয়ে ঝলকে বেরোল আগুন, আগুনের ফুলঝুরি ছিটিয়ে ছুটে গেল এক ঝাঁক বল। প্রচণ্ড শব্দে কানের পর্দা ফেটে গেছে মনে হলো অভিযাত্রীদের, কামানের নলের সামনে কালো ধোঁয়ার মেঘ।

প্রতিক্রিয়া দেখে বোবা হয়ে গেল যেন ওমর। এত জোরে পিছু-ধাক্কা দেবে সুইভেল-গান, কল্পনাও করেনি সে। প্রায় শ'খানেক বল ভরে দিয়েছিল, সব ছুটে গেছে ঝাঁক বেঁধে। টগবগ করে ফুটতে শুরু করল যেন কিছুটা জায়গায় পানি, আরেকটু হলেই গিয়েছিল উল্টে নৌকা। সৈন্যদের গোঙানি আর আতংকিত চিৎকার শোনা গেল। চারজনের মাত্র একজনের হাতে দাঁড় রয়েছে, কিন্তু ওই তাণ্ডবের মাঝে সে-ও বাইতে পারছে না, কিংবা বাওয়ার কথা ভুলেই গেছে। সব শব্দ ছাড়িয়ে শোনা যাচ্ছে হ্যামারের কুৎসিত গালাগাল। ধাক্কার চোটে নৌকার নাক ঘুরে গেছে আবার যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে।

সামলে নিল আবার সৈন্যরা। কারও দাঁড় পানিতে পড়ে গিয়েছিল, কারও বা নৌকার পাটাতনে, তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দ্বিগুণ বেগে দাঁড় বেয়ে ছুটে গেল তীরের দিকে। পালাচ্ছে।

পাগলের মত হাত চালাল ওমর। ওদের পালাতে দেয়া চলবে না। সুইভেল-গানে আবার বল ভরে বারুদ ঠাসছে। চোখ তুলে দেখল, তীরের কাছে চলে গেছে নৌকা। তাড়াতাড়ি সলতে লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে গুলি করল আবার।

বু-ম্‌-ম্‌ করে কানফাটা গর্জন তুলে আবার তপ্ত বল ছিটাল সুইভেল-গান।

এবার আর রেহাই পেল না নৌকা, উল্টে গেল। তীরের কাছে অগভীর পানিতে মৃদু ঢেউয়ে দুলছে। জনাতিনেক সৈন্য হাত-পা ছুঁড়ছে পানিতে, বাকিরা স্থির হয়ে ভাসছে। দুর্বল ভঙ্গিতে আঙুল দিয়ে বালি খামচে খামচে নিজেকে শুকনোয় টেনে তোলার চেষ্টা করছে একজন। হ্যামারসহ আরও তিনজন ছপছপ করে হাঁটু পানি ভেঙে পড়িমড়ি করে উঠল ডাঙায়, উঠেই দৌড় দিল জঙ্গলের দিকে। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল পাথরের স্তূপের আড়ালে।

'গুলি করো,' নির্দেশ দিল ওমর। 'ঝাঁঝরা করে দাও নৌকার তলা, যাতে ওটা নিয়ে আর না আসতে পারে,' বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে আবার মাসকেট তুলে নিয়ে গুলি চালাল। নৌকার উপুড় হয়ে থাকা তলা থেকে কাঠের চিলতে উড়ে গেল। বল ভরে গুলি চালাল আবার। পরের পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে গুলি চালিয়ে গেল ওরা। ওমরের প্রায় প্রতিটি গুলিই লক্ষ্য ভেদ করল, অন্যদের কোন কোনটা লাগল, তবে বেশির ভাগই মিস হলো। তাদেরই কারও একটা গুলি নৌকায় না লেগে লাগল গিয়ে ক্রল করে ওঠার চেষ্টা করছে যে আহত লোকটা, তার গায়ে। পড়ে গেল সে কাদা পানিতে, স্থির হয়ে রইল।

'ভয় পেয়েছে ব্যাটারা,' দম নিয়ে বলল ওমর, 'এত খোলামেলাভাবে আর আসার সাহস করবে না,' ধীরে সুস্থে মাসকেটে গুলি ভরছে সে।

দাঁত বের করে হাসল কিশোর, বারুদের ধোঁয়া লেগে কালো হয়ে গেছে মুখ। 'হ্যাঁ, আর ছেলেমানুষ ভাববে না আমাদেরকে। ওমরভাই, কি মনে হয়? আবার আসবে?'

'আসবে তো বটেই। মরার আগে হাল ছাড়বে না হ্যামার। সব রকমে চেষ্টা করে দেখবে। আক্রমণ করে না পারলে, খাবার আর পানি আটকে দেবে। তখন আর কোন উপায় থাকবে না আমাদের, ওর কথা শুনতে বাধ্য হব।'

'সে-তো অনেক পরের কথা, খাবার ফুরোলে তবে তো,' এতক্ষণে খাবার কথা মনে পড়ল মুসার। 'এখুনি সুযোগ, গোটা কয়েক নারকেল ভাঙলে কেমন হয়?'

রাইফেল গর্জে উঠল, একটা বুলেট এসে লাগল পাথরে, বিইঙঙ করে পিছলে বেরিয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা।

'অসতর্ক হলে কি হবে বুঝলে তো?' ভুরু নাচাল ওমর। 'তখনও বোকামি করেছ দেখেছি, কয়েকবার দাঁড়িয়ে উঠেছ। ওরা ঠিকমত গুলি চালাতে পারলে তোমার নিজের নারকেলই ভেঙে পড়ে থাকত এতক্ষণে। খবরদার, আর কক্ষনো মাথা তুলবে না।'

ভ্রূ-কুঞ্চিত হলো ববের। বোকার মত বলল, 'আমাদেরকে গুলি করছে?'

'তো কাকে? পাথরে হাত সই করছে? পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে

আমাদের দেখলেই গুলি ছুঁড়বে। মনে হচ্ছে, এইই করবে ওরা আপাতত। যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে কিছু মুখে দিয়ে এসো। আমি পাহারায় থাকছি। তোমরা এলে আমি যাব।'

বিকেল গড়িয়ে গেছে। ছেলেরা যখন ফিরে এল, পশ্চিমে হেলে পড়েছে তখন সূর্য। শত্রুদের দেখা যাচ্ছে না, তবে মাঝেমধ্যে একআধটা বুলেট ছুটে এসে আঘাত হানছে পাথরের দেয়ালে। কারও কোন ক্ষতি করতে পারছে না। এটা বোঝা যাচ্ছে, দুর্গের দিকে কড়া নজর রেখেছে শত্রুরা।

রাত নামল। চার জন সৈন্য ছুটে এল উল্টানো নৌকাটার দিকে। তারার আলোয় তাদের আবছা মূর্তি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল অভিযাত্রীরা। যেমন এসেছিল, তেমনি তাড়াহুড়ো করে আবার ফিরে গেল সৈন্যরা।

রাত গভীর হলো। সৈন্যদের সাড়া নেই আর। কাউকে দেখা গেল না।

'কড়া পাহারা দিতে হবে আজ রাতে,' ওমর বলল সঙ্গীদেরকে। 'ঘুমোতে হবে এখানে শুয়েই। বব, আজও দ্বীপে যাবে নাকি?'

'মাথা খারাপ!' জোরে মাথা নাড়ল বব।

নয়

ভোর হলো। ববের এখন ডিউটি। সাগরের ওপর হালকা কুয়াশা, ধোঁয়ার চাদর ঢেকে রেখেছে যেন দ্বীপটাকে। সূর্য উঠল। এক ঝটকায় সরিয়ে নিয়ে গেল ঝুলে থাকা কুয়াশা। চেঁচিয়ে উঠল বব তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে, 'এই, তোমরা জলদি এসো! ওমরভাই! জলদি আসুন।'

ছুটে এসে উঠল সবাই ছাতে।

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?' চোখ ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করল ওমর।

খোলা সাগরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল বব। আয়নার মত সমতল সাগর, কাঁচা রোদে চিকচিক করছে। তাতে ঢেউ তুলে আস্তে আস্তে দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে ট্রলারটা, আগের দিন যেটাকে ল্যাগুনের কাছে দেখা গিয়েছিল। গলুইয়ের নিচে পানি ছিটকে পড়ছে দু'দিকে, পানির ছোট ছোট কণাগুলোতে রোদ লাগায় মনে হচ্ছে হীরের টুকরো। শিল্পীর তুলিতে আঁকা যেন এক অপরূপ ছবি, কিন্তু ওমরের তা মনে হচ্ছে না। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসছে সুন্দর জাহাজটা।

'তাহলে এই ব্যাপার,' বিড়বিড় করল ওমর। 'জাহাজ থেকে আক্রমণ চালাবে।'

'সারেঙ ছাড়া তো আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর।

'নিশ্চয় নিচে রয়েছে, যাতে গুলি না করতে পারি আমরা। থাকুক। সুইভেল-গানটার কথা জেনে গেছে ওরা, কিন্তু কামানের কথা জানে না এখনও। সই করে দু'একটা গোলা জাহাজে ফেলতে পারলেই কাঁপিয়ে দিতে পারব। শোনো,' ভারি হলো ওমরের কণ্ঠ, 'এ-যাবৎ ডাকাত-ডাকাত খেলা খেলে এসেছি, কিন্তু এটা খেলা নয়! প্রাণপণে লড়তে হবে এবার। হ্যামারের হাতে পড়া চলবে না। তাব

শয়তানীর সাক্ষী আমরা, তাকে খুন করতে দেখেছি। সাক্ষী বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে না সে কিছুতেই। এসো, হাত লাগাও।' বক্তৃতা শেষ করল সে। কোমরের পিস্তল খুলে নিয়ে তাতে বারুদ আর গুলি ভরল। 'চলো, কামানের মুখ ঠিক করে রাখি।'

কামানের মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে ববের মনে হলো, তিনশো বছর পিছিয়ে গেছে সে, রক্তে লড়াইয়ের উম্মাদনা। নিজের অজান্তেই নিজেকে জলদস্যু ভাবতে শুরু করেছে।

'আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে গতকাল,' বলল ওমর, 'দেখছ, কেমন লুকিয়ে আছে? কারও ছায়াও দেখা যাচ্ছে না।'

'এসব কামানের রেঞ্জ কত, বলতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল ওমর। 'এত পুরানো জিনিস ছুঁয়েও দেখিনি কোন দিন।

'জাহাজ সই করে দিন না তাহলে মেরে। কত দূরে যায়, এক গোলাতেই বুঝে যাব।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল ওমর। 'সরো, আমি গোলা ছোঁড়ার সময় কাছে থাকবে না। কি পরিমাণ ঝাঁকি দেবে কে জানে। পাগলা ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠলেও অবাক হব না।' একটা কামানের পেছনে বসে পড়ল ওমর। আগের দিনই গোলা ভরে রেখেছে। 'আগুন, কিশোর, জলদি।' কামানের মুখ সামান্য সরিয়ে জাহাজের দিকে নিশানা করল।

কম্বল ছিঁড়ে সলতে বানানোই আছে। একটাতে আগুন ধরিয়ে এগিয়ে এল কিশোর। 'ওমরভাই, দিন না, পয়লাটা আমিই করি। কিভাবে করতে হবে শুধু দেখিয়ে দিন।'

কিশোরের দিকে চেয়ে কি ভাবল ওমর, সে-ই জানে। হাসি ফুটল মুখে। 'বেশ, তবে খুব সাবধান। ওই ডোজালিটা আনো। ওটার মাথায় সলতে রেখে লাগিয়ে দাও বারুদে। দিয়েই সরে যাবে এক পাশে।'

তৈরি হলো কিশোর।

'ফায়ার!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল ওমর।

কামানের মুখ দিয়ে ছিটকে বেরোল কমলা আগুন, পেছনে ঘনকালো ধোঁয়ার মেঘ, বাজ পড়ল যেন ঠিক কানের কাছে, এত প্রচণ্ড শব্দ। দ্বীপের পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল সে আওয়াজ। জাহাজটা এখন কোয়ার্টার মাইল দূরে, ওটার পেছনে পানিতে পড়ল গোলা, চারিদিকে ছিটকে উঠল পানি।

'গেছিল,' কামান ছুঁড়তে পারার আনন্দে ধেই ধেই করে এক পাক নেচে নিল কিশোর। 'আরেকটু হলেই লেগে গিয়েছিল। ওমরভাই, কামানের মুখ সামান্য নামিয়ে দিন, পরের বারেই লাগিয়ে দেব।'

মুসা আর ববকে খালি কামানে আবার গোলা-বারুদ ভরার নির্দেশ দিয়ে পাশের কামানটার কাছে বসল ওমর। দেখে নিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা। কিশোরকে আগুন আনতে বলে সরে গেল।

'ফায়ার!' আবার আদেশ দিল ওমর।

'বুম্ম্!'

আবার কমলা আগুন ছুটে গেল জাহাজের দিকে। এবার আর মিস হলো না। ট্রলারের পেছনে কাঠ ভাঙার শব্দ হলো, শূন্যে লাফিয়ে উঠল কাঠের চিলতে।

'লাগিয়েছি! লাগিয়েছি!' আবার নাচতে শুরু করল কিশোর, সেই সঙ্গে হাততালি।

'এতে চলবে না,' ওমর সন্তুষ্ট নয়। 'ইঞ্জিনরুমে ঢোকাতে হবে, কিংবা পাশে এমন জায়গায় ছিদ্র করে দিতে হবে, যাতে পানি ঢোকে। দেখি, এসো।' আরেকটা কামানের কাছে এসে বসল সে।

প্রথমটায় গোলা-বারুদ ভরে ফেলেছে বব আর মুসা, দ্বিতীয়টায় ভরতে লেগে গেল। এ-কাজে ওস্তাদ হয়ে গেছে দু'জনে।

কামানের নিশানা ঠিক করল ওমর, তিনটেরই। মুসা আর ববকেও কামান দাগার জন্যে তৈরি হতে বলল।

তিনজনেই তৈরি।

আবার আদেশ দিল ওমর, 'রেডি। ফায়ার!'

কামানের গর্জনে কেঁপে উঠল পাথরের দুর্গ, কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। কালো ধোঁয়া ঢেকে দিল সামনেটা, জাহাজ দেখা যাচ্ছে না। দেখার অপেক্ষা করলও না ওরা, দ্রুতহাতে গোলা-বারুদ ভরতে শুরু করল আবার।

কালো ধোঁয়া সরে গেছে। জাহাজের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল তিন কিশোর, একই সঙ্গে। আনন্দে লাফাচ্ছে।

'মাস্তুল গেছে,' বলল বব।

ঠিকই বলেছে। মাস্তুল ভেঙে পড়েছে সামনে ডান পাশে। আগের দিনের পালের জাহাজ হলে থেমেই যেত, কিন্তু আধুনিক ট্রলার ইঞ্জিনে চলে। থামল না, কিন্তু লক্ষ্য ঠিক রাখতেও পারল না, জাহাজের নাক সোজা রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সারেঙ। কেন গোলমাল হচ্ছে, বুঝতে পারছে জাহাজের লোকেরাও, তিনজন কুড়াল হাতে এসে কোপাতে শুরু করল। মাস্তুলের গোড়ার দিকটা পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি, সেটা কেটে পানিতে ফেলে দেবে মাস্তুলটা। আরও ক্ষতি হয়েছে জাহাজের, মূল কাঠামোর এক জায়গায় লেগেছে আরেকটা গোলা, ভেঙে গেছে। মাস্তুলের ভারে এক পাশে বিশ্রীভাবে কাত হয়ে গেছে ট্রলার।

'মাসকেট!' গর্জে উঠল ওমর। 'যারা মাস্তুল কাটছে, খতম করে দাও। হাল কাজ করছে না মনে হচ্ছে, মাস্তুলটা সরাতে না পারলে করবেও না।'

একনাগাড়ে গুলি চালিয়ে গেল চারজনে। কার গুলি লেগে, বোঝা গেল না, পড়ে গেল তিনজনের একজন। আরেকজন পালাল। তৃতীয়জন বড় বেশি দুঃসাহসী, মারাত্মক গুলি উপেক্ষা করে কুপিয়ে চলল।

মাসকেট ফেলে দিয়ে সুইভেল-গানের মুখ ঘোরাল ওমর। গুলি করল।

ভয়ানক ক্ষতি করল বলের ঝাঁক, কাঠের চিলতের ঝড় উঠল ডেকের একটা অংশে। তৃতীয় লোকটাও পড়ে গেল। কিন্তু দুই এক গড়ান দিয়েই আবার উঠে পড়ল, মরেনি, আহত হয়েছে। ক্রল করে চলে গেল আড়ালে।

আজ দ্বিতীয় দফা অবাক হলো ওমর সুইভেল-গানের প্রচণ্ড ধ্বংস-ক্ষমতা

দেখে। 'বাপরে বাপ, শেলের চেয়ে খারাপ!' বিড়বিড় করল সে।

'ট্রলারের বারোটা বেজেছে,' বলল মুসা।

জাহাজের গতিপথ ঠিক নেই, ইঞ্জিন চালু রয়েছে এখনও, কিন্তু নাক ঘুরে গেছে আরেকদিকে। দাঁড়িয়ে থাকার সাহস নেই সারেঙের, বসে পড়েছে, সেই অবস্থায়ই জাহাজ সামলানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে, পারছে না।

'কামান দাগতে থাকো,' কিশোর আর মুসাকে আদেশ দিল ওমর। 'আমার বলার জন্যে বসে থেকো না। গোলা ভরো আর ছাড়ো। বব, মাসকেটগুলো ভরো তুমি।'

একের পর এক গোলা ছুটল। সুইভেল-গান থেকে গুলি ছুঁড়ছে ওমর। গোলার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে জাহাজের গা, চামড়া ক্ষত করে দিচ্ছে সুইভেল-গানের বল। জাহাজের ডেকে আর পানিতে কাঠের চিলতের ছড়াছড়ি। কিন্তু চেষ্টা করেও সারেঙের গায়ে লাগানো যাচ্ছে না, লোকটার ভাগ্য ভাল। নিরস্তও হচ্ছে না সে। এত গোলাগুলির মাঝেও হাল ছাড়ছে না। নড়াচড়ায় মাস্তুলটা আপনা-আপনি গড়িয়ে পড়ে গেছে পানিতে। ফলে জাহাজের নাক সোজা করে ফেলেছে আবার সারেঙ, এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ওমর। আরেকটু এগোলেই কামানের রেঞ্জের এপাশে চলে আসবে জাহাজ। নোয়াতে নোয়াতে একেবারে চত্বরের সঙ্গে লেগে গেছে নলের মুখ, আর নামানো যাবে না। কোনমতে সিঁড়ির কাছাকাছি জাহাজ আনতে পারলে আর ঠেকানো যাবে না সৈন্যদেরকে, দরকার হলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে আসবে, তারপর উঠে আসবে সিঁড়ি বেয়ে।

তবে, এখনই সব চেয়ে বড় সুযোগ। কামানের আওতায় রয়েছে জাহাজ, খুবই কাছে। কোনমতে একটা গোলা ডেক পার করে যদি ইঞ্জিন রুমে ঢুকিয়ে দেয়া যায়, ব্যস, হয়ে গেল কাজ। ইঞ্জিন তো যাবেই, ডেকে লুকিয়ে থাকা সৈন্যও মরবে বেশ কিছু।

হঠাৎ ডেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল সৈন্যরা। তাদের মাঝে রয়েছে হ্যামার, চেঁচিয়ে সাহস দিচ্ছে সবাইকে, গুলি করতে বলছে।

গুলি শুরু করল সৈন্যরা।

ঘামে ভিজে সপসপ করছে ওমরের গা। টেনে ছিঁড়ে গা থেকে শার্টটা খুলে ফেলে দিল। মরিয়া হয়ে উঠেছে বেদুইন। কিছুতেই পরাজয় বরণ করবে না, যে করে হোক ঠেকাবেই দুশমনকে। 'মাথা নোয়াও, নুইয়ে রাখো!' চেঁচিয়ে বলল সে।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে লাগছে পেছনের দেয়ালে, কোনটা খসে পড়ছে চত্বরে, কোনটা পিছলে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে। মারাত্মক।

সুইভেল-গানটা, সরিয়ে আরেকটু সামনে নিয়ে এল ওমর। ডেক সই করে ছাড়ল আরেক ঝাঁক গুলি। সুইভেল-গান ব্যবহার শেষ, আর নাগাল পাবে না জাহাজের। ছিড়েখুঁড়ে গেল ডেক, দু'জন সৈন্য পড়ে গেল, কিন্তু ইঞ্জিন আগের মতই সচল।

মরিয়া হয়ে উঠেছে তিন কিশোরও। মাসকেট তুলে সারেঙকে লক্ষ্য করে গুলি

করল কিশোর। নিশানা ভাল না, সারেঙের মাথার ওপর দিয়ে গেল গুলি। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলল লোকটা। ববের দিকে বন্দুকটা ছুঁড়ে দিয়ে গুলিভর্তি আরেকটা তুলে নিল কিশোর। আবার গুলি করল সারেঙকে। আর্তনাদ করে উঠে পড়ে গেল লোকটা, আস্তে আস্তে উঠল আবার। এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে রেখেছে, বেকায়দা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে আহত হাতটা। যাক, একটা গুলি অন্তত খেয়েছে।

সুইভেল-গানে গুলি বর্ষণের পর পরই শূন্য হয়ে গেছে ডেক, আবার নিচে গিয়ে লুকিয়েছে সবাই।

'থামো,' আদেশ দিল ওমর। 'আন্দাজে গুলি করো না আর। ভালমত দেখে নিশানা করে তবে। ব্যাটারা বেরোক।'

কিন্তু আর বেরোল না কেউ।

কাছে চলে আসছে ট্রলার, শিগগিরই ঘাটে লাগবে। এখুনি কিছু একটা করতে না পারলে আর সময় পাওয়া যাবে না।

টেনেহিঁচড়ে একটা কামানকে একেবারে কিনারে নিয়ে এল ওমর, তাকে সাহায্য করল অন্য তিনজন। জাহাজটা এসে চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করে দিল ঘাটে বাঁধা নৌকাকে। চত্বরের এক জায়গায় নিচু দেয়াল, ছাতে যেমন আছে, মাঝে মাঝে ফোকর। দেয়ালের নিচেই এখন জাহাজটা। ওমরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল না অন্যেরা। কোন ফোকরে ঢুকিয়েই এখন কামান দাগা যাবে না। তাহলে?

কামানের নল কোন ফোকরে ঢোকাল না ওমর, দেয়াল সই করে দিল বারুদে আগুন ধরিয়ে। বিস্ফোরণের গরম ঝাপটা যেন ছ্যাঁকা দিয়ে গেল অভিযাত্রীদের, কালো ধোঁয়া ঢেকে দিল সামনেটা। ধোঁয়া সরে যেতে দেখা গেল, দেয়ালের বড় একটা অংশ ধসে গিয়ে পড়েছে জাহাজের ডেকে। চেঁচামেচি আর গোঙানিতে ভরে গেছে বাতাস, মাঝে মাঝে রাইফেল গর্জে উঠছে, পাথরে বাড়ি খেয়ে শিস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট।

লড়াইয়ের উন্মাদনায় পাগল হয়ে উঠেছে বব, তার জীবনে এত উত্তেজনা আর কখনও আসেনি। উল্লাসে চেঁচাচ্ছে সে।

ভাঙা দেয়ালটার দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে কিশোর। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ওমরভাই, আসুন!'

কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল ওমর, সে নিজেও একই কথা ভাবছিল। অন্য দু'জনকে ডেকে বলল সাহায্য করতে।

'হেঁইও, হেঁইও,' করে ধাক্কা দিয়ে কামানটাকে ঠেলে দিল ওরা চত্বরের বাইরে।

ক্ষণিকের জন্যে বাতাসে ঝুলে রইল ভারি লোহার তাল, তারপর ডিগবাজি খেয়ে নেমে গেল নিচে। পড়ল গিয়ে জাহাজের ডেকে। ঠেকাতে পারল না ডেক এত ভারি একটা জিনিস, ভোঁতা শব্দ তুলে ছিঁড়ে গেল, যেন তুলোট কাগজ, মস্ত কালো ফোকর সৃষ্টি করে ডেকের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল কামানটা। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল জাহাজ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জনা ছয়েক লোক নিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল হ্যামার। খৈ ফুটছে তার মুখে, বিচ্ছিরি সব গাল দিয়ে চলেছে অনর্গল। সৈন্যদেরকে নিয়ে সিঁড়িতে উঠে পড়ল সে।

'মাসকেট!' চেঁচিয়ে উঠল ওমর। থাবা দিয়ে তুলে নিল হাতের কাছে পড়ে থাকা একটা বন্দুক। হ্যামারকে সই করে দিল ট্রিগার টিপে। গুলি ফুটল না। বারুদ ভরা হয়নি বোধহয় ঠিকমত।

এই সুযোগে সিঁড়ির আধাআধি উঠে চলে এল হ্যামার, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কুৎসিত ভঙ্গিতে—মুখব্যাদান করে রেখেছে যেন একটা জানোয়ার, হাতে রিভলভার।

বন্দুকটা ছুঁড়ে মারল ওমর। হ্যামারের হাতে বাড়ি লেগে রিভলভারটা উড়ে গিয়ে পড়ল পানিতে।

থামল না হ্যামার। গাল দিয়ে উঠে এক টানে ছুরি বের করল। দুপদাপ করে লাফিয়ে উঠে আসছে।

সাংঘাতিক একটা মুহূর্ত। কি ঘটে কি ঘটে! এদিক ওদিক তাকাল ওমর, একটা পিস্তল দেখে ছোঁ মেরে তুলেই গুলি চালাল। তাড়াহুড়োয় গুলি লাগাতে পারল না হ্যামারের গায়ে, কিন্তু একেবারে মিস হলো না, তার পেছনের লোকটা আর্তনাদ করে উল্টে পড়ে গেল।

এবার? এবার কি হবে?

ওমরের কানের কাছে গর্জে উঠল পিস্তল, পলকের জন্যে বধির হয়ে গেল সে। এবারও হ্যামারের গায়ে লাগল না, তার পেছনের আরেকটা লোক উল্টে পড়ল, তার ধাক্কায় গড়িয়ে পড়ল আরেকজন।

ফিরেও তাকাল না হ্যামার, উঠে এল ওপরে, তার প্রায় গায়ে গা ঘেঁষেই এল আর দু'জন।

যে কোন একটা অস্ত্রের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ওমর। কামানে আগুন দিয়েছিল যে ভোজালিটা দিয়ে কিশোর, সেটা চোখে পড়তেই তুলে নিতে ছুটল, কিন্তু ধাড়ুম করে উপুড় হয়ে পড়ল একটা পাথরে পা বেধে। বনবেড়ালের মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যামার।

এঁকেবেঁকে পিছলে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ওমর, পারল না, তার বুকের ওপর চেপে বসল হ্যামার। রোদে ঝিক করে উঠল তার হাতের ছুরির তীক্ষ্ণ ধার ফলা। দাঁত বের করে কুৎসিত হাসি হাসল ডাকাতটা, ওমরের গলার ওপর ধীরে ধীরে নামিয়ে আনছে ছুরি, জবাই করবে।

গর্জে উঠল পিস্তল। স্থির হয়ে গেল হ্যামারের হাত, খসে পড়ল ছুরি, ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে এক পাশে টলে পড়তে শুরু করল সে নিজেও। স্লো মোশন ছায়াছবির মত ঘটছে ঘটনা।

ধাক্কা দিয়ে হ্যামারকে গায়ের ওপর থেকে ফেলে উঠে বসল ওমর। ফিরে চেয়ে দেখল, দু'হাতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে কাঁপছে কিশোর, নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ছাই হয়ে গেছে মুখ।

'থ্যাংকিউ, কিশোর,' ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বলল ওমর। পরক্ষণেই ভোজালিটা

তুলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেছে হ্যামারের সঙ্গীসাথীরা। ওমরকে ভোজালি হাতে উঠে দাঁড়াতে দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেল। আক্রমণ আর করল না, নেতার পতন ঘটার পর সাহস আর মনের জোর দুইই হারিয়েছে ওরা। অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওপর থেকেই ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ল সাগরে। ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গেল জাহাজীরাও, বিধ্বস্ত জাহাজটাকে সরিয়ে নিতে শুরু করল। ধুম্‌ম্ ধুম্‌ম্ করে গুলি চালাল মুসা আর বব।

'ব্যস, হয়েছে,' হাত তুলল ওমর। 'গুলি থামাও।'

দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে আছে কিশোর। চুল উসকোখুসকো। হাঁপাচ্ছে আর ঘামছে। পিস্তলটা পড়ে আছে এক পাশে।

মুসার চোখ লাল, ধপ করে বসে পড়ল। আস্তিন দিয়ে রক্ত মুছল গালের একটা কাটা থেকে।

বব যেন নিষ্প্রাণ একটা পুতুল, শূন্য চোখে চেয়ে আছে ট্রলারটার দিকে।

'বেশি কেটেছে?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল ওমর।

'নাহ্,' দুর্বল কণ্ঠে বলল মুসা। 'একটা গুলি পাথরে বাড়ি খেয়ে এসে লেগেছিল।'

জাহাজটার দিকে ফিরে চাইল ওমর, পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে নাক ঘোরাচ্ছে তীরের দিকে। 'শিক্ষা হয়েছে ব্যাটাদের।' একটা ডাব এনে ভোজালি দিয়ে কেটে মুসার দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'নাও, খেয়ে নাও, ভাল লাগবে।'

'এক ডাবে কি হবে এক বালতি পানি দরকার,' ডাবটা হাতে নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'এত পিপাসা জীবনে লাগেনি। নৌকাটা কোথায়?'

'আমাদেরটা? ডুবে গেছে। ধাক্কা দিয়ে চ্যাপ্টা করে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। জাহাজটা তীরের দিকে যাচ্ছে, পানি উঠছে হয়তো। উঠুক আর না উঠুক, আজ আর আসছে না। ···মাথা অত উঁচিও না, নোয়াও, গুলি করে বসতে পারে।···আচ্ছা, সিডনি বারডুকে দেখলাম না-তো। তোমরা দেখেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

বব আর মুসা জানাল, ওরাও দেখেনি।

'প্লেনটা দখল করতে না পারলে লাভ হবে না কিছু,' চিন্তিত হয়ে পড়ল ওমর। ছাতে উঠল গিয়ে। ল্যাগুনে বিমানটা আছে কিনা দেখবে। সাগরের দিকে একটা নড়াচড়া দৃষ্টিগোচর হতেই ঝট করে ঘুরল ভালমত দেখার জন্যে। 'হায় আল্লাহ্!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

আরও বিপদ আসছে মনে করে ছাতে উঠে এল অন্যেরা। বড় জোর মাইল খানেক দূরে, দ্বীপের দিকে মুখ করে ছুটে আসছে লম্বা একটা বড় জাহাজ।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল বব। 'ডেস্ট্রয়ার। ওটা হামলা চালালে আর ঠেকাতে পারব না।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে হঠাৎ হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'না না, আক্রমণ করবে না। আমেরিকান। নেভির শিপ, বুঝতে পারছ না?···কিন্তু এখানে

এল কেন? জলদস্যুতা শেষ হয়ে গেছে অনেক বছর আগে, টহল দিচ্ছে না জাহাজটা। দেখি, কি করে।'

'ইস, যদি আমাদের তুলে নিত,' বলল মুসা। 'এক প্লেট ডিম ভাজা আর রুটি যদি খেতে দিত, আর কিছু পনির, একটা মুরগী, কলা···'

'বোলো না আর,' দু'হাত নাড়ল বব, 'বোলো না।'

ববের কথার ধরনে হেসে ফেলল সবাই। জানে, বিপদ পুরোপুরি কাটেনি এখনও, দোদুল্যমান অবস্থা, কিন্তু জাহাজটা দেখে হালকা হয়ে গেছে সবার মন। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওটা শত্রুপক্ষের নয়।

'কোনভাবে জানাতে পারি না, আমরা এখানে আছি?' প্রস্তাব দিল মুসা।

'হ্যাঁ, ঠিক,' সায় দিল ওমর। 'এসো, চেঁচাই সবাই মিলে···'

এক সঙ্গে জোরে চিৎকার করে ডাকল ওরা, কিন্তু কোন সাড়া এল না।

'কালা নাকি সব?' গোঁ গোঁ করল মুসা। ডিম ভাজার চিন্তায় বিমর্ষ। 'আবার ডাকি?'

চিৎকার করে আবার ডাকল ওরা। সাড়া মিলল না এবারেও। তবে থামতে শুরু করল ড্রেস্ট্রয়ার। বোট নামাল। ঝিলিক দিয়ে উঠল ছয় জোড়া ভেজা দাঁড়, দ্রুত গতিতে ছুটে এল নৌকাটা উপদ্বীপের দিকে। গলুইয়ের কাছে বসে আছে শাদা পোশাক পরা একজন অফিসার।

ছাদ থেকে চত্বরে নেমে এল অভিযাত্রীরা। ছুটে এসে দাঁড়াল ভাঙা নিচু দেয়ালের ধারে। নৌকা কাছে আসতেই ডেকে বলল ওমর, 'ওদিক দিয়ে ঘুরে আসুন। সিঁড়ি আছে।'

স্পষ্ট আদেশ শোনা গেল। উপদ্বীপের এক পাশ ঘুরে সিঁড়ির কাছে এসে থামল নৌকা। পানিতে ভাসছে খানিক আগের খণ্ডযুদ্ধের আলামত। অবাক হয়ে দেখছে অফিসার। অভিযাত্রীদের দিকে চেয়ে হাসল কয়েকজন নাবিক।

হালকা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে চত্বরে উঠে এল অফিসার। আদিম কামান-বন্দুকগুলোর দিকে চেয়ে থমকে গেল। একে একে তাকাল চারটে বারুদে-মাখামাখি শরীরের দিকে। 'কি ব্যাপার? ডাকাত পড়েছিল নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ওমর। 'আরেকটু হলেই দিয়েছিল শেষ করে। অনেক কষ্টে বেঁচেছি। লড়াই করে।'

'এগুলো দিয়ে?'

'খেলনা ভাবছেন নাকি? একেকটা গোলা যে কাণ্ড করেছে, যদি দেখতেন···সুইভেল-গানটার কথা বাদই দিলাম।'

কালো পতাকাটার দিকে চোখ পড়তে ভুরু কোঁচকালো লেফটেন্যান্ট। 'জলদস্যু?'

'আধুনিক জলদস্যু।'

'আপনারা?'

'আমরা ট্রেজার আইল্যাণ্ডের গুপ্তধন-সন্ধানী,' পরিবেশ হালকা করার জন্যে নাটকীয় ভঙ্গিতে বাউ করল ওমর। 'ধরে নিন, আমি ক্যাপ্টেন স্মলেট। আর এই যে

ইনি স্কয়ার ট্রেলনী, ইনি ডক্টর লিভসী, আর ও জিম হকিনস। আর এই যে,' বাঁকা হয়ে পড়ে থাকা হ্যামারের লাশটা দেখাল, 'এ হলো লঙ জন সিলভার।'

'মারা গেছে?'

'উপায় ছিল না। না মারলে আমরা মরতাম।'

আদিম কামান-বন্দুক, জলদস্যুর কালো পতাকা, অভিযাত্রীদের পোশাক-আশাক আর অবস্থা দেখে বোকা হয়ে গেছে যেন অফিসার, ব্যাপারটাকে কি ভাবে নেবে বুঝতে পারছে না। তবে তার হাবভাবে মনে হলো, অভিযাত্রীদের পাগল ভাবছে সে। 'তা গুপ্তধন মিলল?'

'নিশ্চয়ই। নইলে এত খুনখারাপী কেন?' মোহরের স্তূপ দেখাল ওমর। 'ওই যে। চাইলে দু'একটা নিতেও পারেন, স্যুভনির রাখবেন।'

হাঁ হয়ে গেল অফিসার। এগোবে কিনা ভাবতে ভাবতেই চোখ পড়ল হ্যামারের পাশে পড়ে থাকা একটা মোহরের দিকে। নিচু হয়ে সেটা তুলতে গেল।

হাঁ-হাঁ করে উঠল ওমর। 'ওটা না ওটা না। নিলে মরবেন।' লাফিয়ে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। চকিতের জন্যে সোনালি একটা ধনুক সৃষ্টি করে উড়ে গেল ডাবলুনটা, পড়ল পানিতে। হারিয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'অভিশপ্ত। অনেক মানুষের প্রাণ নিয়েছে।'

কিছু না বুঝেই মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট। 'চলুন, জাহাজে চলুন। ক্যাপ্টেনকে সব খুলে বলবেন।'

'খুব ভাল কথা, চলুন,' খুশি হলো ওমর।

অফিসারের পিছু পিছু নেমে এল ওরা বোটে।

দশ

'ভাগ্য ভাল আমাদের, আপনারা এসেছেন,' লেফটেন্যান্টের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল ওমর। 'কেন এসেছিলেন?'

হাসল অফিসার। 'কেন? যে কাণ্ড করেছেন আপনারা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অর্ধেকটা কাঁপিয়ে দিয়েছেন। বিশ মাইল দূর থেকে গোলার আওয়াজ শুনেছি, কালো ধোঁয়া দেখেছি। আমরা তো ভাবছিলাম, দ্বীপপুঞ্জগুলো যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে। এরপরেও দেখতে আসব না?'

'অ।' হাসল ওমর। জাহাজের কাছে চলে এসেছে বোট। রেলিঙে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৌতূহলী দর্শক, তাদের দিকে তাকাল সে।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল বব। ফিরে চেয়ে দেখল ওমর, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ববের। ফেকাসে চেহারা।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল ওমর। 'ব্যথা লেগেছে কোথাও?'

'না, কিছু না,' মাথা নাড়ল বব।

'কিছু তো বটেই। কি?'

'মনে হলো…মনে হলো, বাবাকে দেখলাম! ডেকে,' নিচু গলায় বলল সে।'

ঝট করে মুখ ফিরিয়ে রেলিঙের কাছে দর্শকদের দেখল আরেকবার ওমর। 'কই,

কোথায়?'

ববের কথা অফিসারের কানেও গেছে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ববের দিকে। 'তুমি কলিনস না তো?'

'হ্যাঁ, কলিনস, বব কলিনস,' অবাক হলো বব, তার নাম জানল কি করে লোকটা?'

'তাহলে ঠিকই দেখেছ,' মাথা কাত করল লেফটেন্যান্ট। 'তোমার বাবা-ই। এক বন্দরে আমাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন তাকে আগে থেকেই চিনতেন। অদ্ভুত এক গল্প শোনাল কলিনস, গুপ্তধনের গল্প। সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করল ক্যাপ্টেনকে। এমনভাবে বলল, যাচাই করে দেখতে রাজি হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন, তাছাড়া এদিক দিয়েই যাওয়ার কথা আমাদের। কলিনসকে জাহাজে তুলে নিলেন তিনি।'

কিন্তু ববের কানে অফিসারের কথা ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। রেলিঙের দিকে চেয়ে রয়েছে সে। আরেকজন মধ্যবয়েসী দর্শক এসে দাঁড়িয়েছে, ববের মতই চুলের রঙ, একজন সিভিলিয়ান।

জাহাজের গা ছুঁল বোট। সিঁড়ি নামানো হলো। কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে গেল বব। সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিভিলিয়ান লোকটার বাড়ানো দুই হাতের মাঝে।

উঠে গেল ওমর, কিশোর আর মুসা। বব আর তার বাবার তখন মুখে হাসি, চোখে পানি। দর্শকরা ঘিরে ধরল অভিযাত্রীদেরকে।

'সাড়া ফেলে দিয়েছি মনে হচ্ছে,' কিশোরের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল ওমর।

মাথা ঝোঁকাল শুধু কিশোর।

জাহাজের পেছন দিকে ডেকে একটা কাঠের সামিয়ানার তলায় অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন। অভিযাত্রীদের তাঁর কাছে নিয়ে এল লেফটেন্যান্ট, পেছন পেছন এল কৌতূহলী দর্শকের দল।

ক্যাপ্টেনের বয়েস অল্প, তরুণ। বিচিত্র পোশাক পরা অভিযাত্রীদের দেখে একই সঙ্গে কৌতূহল, সন্দেহ আর বিস্ময় ফুটল তাঁর চোখে। ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন তাদেরকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'দলপতি কে?'

'ইনি,' ওমরকে দেখিয়ে দিল কিশোর।

'কি হয়েছিল?' আবার প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

'সবই বলব,' ওমর বলল, 'কিন্তু তার আগে পানি খাওয়ান আমাদের। গোসলও করতে হবে। হাতমুখের যা অবস্থা।' হাসল সে।

পানি আনতে বললেন ক্যাপ্টেন। 'আর?'

'দ্বীপের ধারে একটা ল্যাগুনে আমাদের প্লেন আছে, শত্রুরা দখল করে নিয়েছে, ওটা ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠান, প্লীজ। আর আপনার লেফটেন্যান্ট সাহেব আমাদেরকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন, অনেক মোহর আছে ওখানে, ওগুলোও আনা দরকার। তাড়াতাড়ি না করলে লুট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিছু ডাকাত

দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। মোহর নিয়ে প্লেনে করে পালাতে পারে।'

স্থির দৃষ্টিতে ওমরের মুখের দিকে চেয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। 'তার মানে, বলতে চাইছেন সত্যিই গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছেন আপনারা?'

'একটা দুটো নয়, হাজার হাজার।'

'তাই?'

'বলেছিলাম না, স্যার, মোহর আছে, অনেক মোহর,' বলে উঠল ববের বাবা।

'শুধু মোহর না,' ওমর বলল, 'আরও অনেক মূল্যবান জিনিস আছে দ্বীপে।'

'নিশ্চয় গ্যালিয়নটা খুঁজে পেয়েছেন আপনারা? কলিনস যেটার কথা বলছিল?'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে গেলে দেখাতেও পারি। কিন্তু আগে আমাদের পানি আর খাওয়া...'

উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে ঠাণ্ডা হয়ে নিন, তারপর বলবেন সব কিছু। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি দ্বীপে।'

গায়ে সাবান মাখতে মাখতে বাবার সঙ্গে কথা বলছে বব। জানা গেল, হ্যামারের ছুরি খেয়ে সেদিন মরেনি কলিনস, দমটা ছিল কোনমতে। যমে-মানুষে টানাহেঁচড়া করে শেষে ডাক্তাররা বাঁচিয়েছে তাকে। অনেক সময় লেগেছে সুস্থ হতে। ভাল হয়েই আরেকটা চিঠি লিখেছে ববের কাছে, কিন্তু পায়নি বব, সে তখন বেরিয়ে পড়েছে গুপ্তধনের সন্ধানে। জ্যামাইকার কিংসটন বন্দরে চলে গেছে এরপর কলিনস, ওখানেই দেখা ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। প্রাচীন গ্যালিয়ন আর মোহরের কথা কৌতূহলী করে তুলেছে তরুণ ক্যাপ্টেনকে। বিশ্বাস করার আরও কারণ ছিল, কলিনস যে এলাকার কথা বলেছে, ওখানে আগেও কয়েকটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তাছাড়া ওই এলাকাটা এককালে ছিল জলদস্যুদের স্বর্গরাজ্য। ভেবেচিন্তে শেষে কলিনসকে জাহাজে তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন।

জানা গেল, মাত্র আগের দিন বিকেলে বেতারে একটা মেসেজ পেয়েছেন ক্যাপ্টেন, ম্যারাবিনার প্যান-আমেরিকান রেডিও স্টেশন মেসেজটা পাঠিয়েছে, চারজন আমেরিকানকে নিয়ে একটা বিমান নিখোঁজ হয়েছে দক্ষিণ সাগরের কোথাও। গুপ্তধন নয়, বিমানটাকেই খুঁজছিল ডেস্ট্রয়ার। কামানের গোলার শব্দ কানে আসতেই দ্রুত গতিতে ছুটে এসেছে খোঁজ নিতে। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে বব আর ববের বাবা, দু'জনের কেউ কাউকে আশা করেনি এখানে।

এক ঘণ্টা পর। বেশ ভাল একটা ভূরিভোজন শেষে চার অভিযাত্রীকে আবার নিয়ে আসা হলো সামিয়ানার নিচে। সিকরস্কিটাকে উদ্ধার করে এনে ডেস্ট্রয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। মৃদু ঢেউয়ে দুলছে ওটা স্বচ্ছ নীল পানিতে। ক্যাপ্টেনের চেয়ারের পাশে স্তূপ করে রাখা হয়েছে মোহর।

চেয়ারে বসল অভিযাত্রীরা।

ওমরকে বললেন ক্যাপ্টেন, 'এবার শুরু করুন আপনার কাহিনী। তাড়াহুড়োর দরকার নেই, খুলেই বলুন সব।'

কফির কাপ টেনে নিল ওমর। তারপর শুরু করল গল্প। একেবারে গোড়া থেকে, কিছুই গোপন করল না, মাঝে মাঝে কথা যোগ করল তিন কিশোর। রুদ্ধশ্বাসে

শুনলেন ক্যাপ্টেন আর তাঁর অফিসারেরা।

'অবিশ্বাস্য,' ওমরের কথা শেষ হলে বললেন ক্যাপ্টেন। 'চোখের সামনে প্রমাণ রয়েছে, তা-ও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।...তো, আপনাদের এখন কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে?'

'দেশে।'

'হ্যাঁ, তাই যেতে হবে। আপনাদেরকে ছাড়তে পারছি না এখন, সরি, যেতে হবে আমাদের সঙ্গেই। একটা কোর্ট অভ ইনকয়্যারী হবে, তারপর আদালত থেকে যা রায় হয়, হবে। হাজার হোক, মানুষ খুন করেছেন আপনারা।'

'কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে করেছি। আর কোন উপায় ছিল না।'

'বুঝতে পারছি। মাননীয় আদালতও নিশ্চয় বুঝবেন। কিছু হবে না আপনাদের। এই একটা রুটিন শুনানী, তারপর খালাস দিয়ে দেয়া হবে। তবে মোহর সব পাবেন না আপনারা, আইন অনুযায়ী অর্ধেক নিয়ে নেবে স্টেট।'

'নিক। তার পরেও যা থাকবে, অনেক টাকার জিনিস,' হাসল ওমর। 'আর মোহর! প্রাণে যে বেঁচেছি এইই যথেষ্ট। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।'

'ও হ্যাঁ,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'ট্রলারে একজন সিভিলিয়ান ছিল। লাশের পকেটের কাগজপত্র ঘেঁটে তার নাম জানা গেছে, সিডনি...'

'...বারডু,' বলে উঠল ওমর। 'ও-ই পাইলট, আমাদের বিমান চোরদের একজন। ম্যারাবিনা থেকে চুরি করেছিল। হ্যামারের সঙ্গে ওর থাকার কথা, তাই ভাবছিলাম, বারডু গেল কোথায়? বোধহয় ডেকের নিচে থাকতেই আমাদের গুলি লেগে মরেছে।'

'গোলা লেগে,' শুধরে দিলেন ক্যাপ্টেন। 'শরীরের অর্ধেকটা উড়ে গেছে, যেন শেলের আঘাতে...'

'গোলাও নয়,' হাসল ওমর। 'আদিম সুইভেল-গানের কাণ্ড।'

'হুঁ। আচ্ছা, চলুন এখন দ্বীপে যাই। গ্যালিয়নটা দেখাল আমাদের। দুর্গটাও। এসব প্রাচীন জিনিসের প্রতি আমার ভারি কৌতূহল। যাবেন?'

'সানন্দে। আসলে, আমরাও ভালমত দেখতে চাই জাহাজটা। সেদিন তাড়াহুড়ো ছিল, তাছাড়া অন্ধকার, দেখতে পারিনি সব।'

বাকি দিনটা দ্বীপে কাটাল অভিযাত্রীরা, কখনও একা, কখনও দল বল নিয়ে। রাজকীয়-গ্যালিয়নের ভেতরে বাইরে যতখানি দেখা সম্ভব, দেখল। দ্বীপটা ঘুরে দেখল। সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল নৌ-বাহিনীর একজন গার্ড। যখন অন্ধকার হলো, আর কিছু দেখা গেল না, তখন ফিরে এল ওরা জাহাজে। দুর্গ থেকে লুই ডেকেইনির কালো পতাকাটা খুলে নিয়ে এসেছে বব, বন্ধুদের অনুমতি নিয়ে রেখে দিয়েছে ওটা তার কাছে, ট্রফি।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার পর ছাড়ল ডেস্ট্রয়ার। রাতের বেলায়ই বেতারে কিংসটনে আমেরিকান নৌ-ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ক্যাপ্টেন, তাঁর ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলেছেন। সোজা ওখানে গিয়ে রিপোর্ট করার আদেশ

পেয়েছেন ক্যাপ্টেন।

ক্রেন দিয়ে টেনে তুলে ডেকে বহাল তবিয়তে ক্যানভাসের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সিকরস্‌কিটাকে। ডেক চেয়ারে বসে কফি খেতে খেতে কথা বলছে ওমর আর ববের বাবা।

বব, কিশোর আর মুসা দাঁড়িয়ে আছে রেলিঙের ধারে। নোঙ্গর তোলা দেখছে। রাতের বেলায়ই কয়েকটা ডলফিন এসে জমা হয়েছে জাহাজের ধারে, ফেলে দেয়া খাবারের টুকরো-টাকরার লোভে। স্বচ্ছ পানিতে খেলা জুড়েছে ওগুলো। কখনও তাড়া করে যাচ্ছে একে অন্যকে, বোতলের মুখের মত নাক দিয়ে গুঁতো মারছে পেটে, কখনও লাফিয়ে শূন্যে উঠে ডাইভ দিয়ে পড়ছে। সূর্যের সোনালি আলোয় অপরূপ সুন্দর লাগছে জীবগুলোকে।

জাহাজ ছাড়ল। ডলফিনের দলও চলল সঙ্গে সঙ্গে। কোথা থেকে এসে হাজির হলো একটা শাদা অ্যালবেট্রস, উড়ে চলল জাহাজকে অনুসরণ করে।

'অভিশপ্তটা মারা গেছে, প্লেনে বাড়ি খেয়ে,' পাখিটাকে দেখতে দেখতে বলল মুসা।

'কে বলল তোমাকে?' ঘুরল কিশোর।

'কেন, মরেনি? তাহলে অ্যাকসিডেন্টটা করল কে?'

'অ্যালবেট্রসই, এটার মতই সাধারণ আরেকটা পাখি। অভিশাপ-টভিশাপ কিচ্ছু না, ঝড়ের তাড়া খেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, ধাক্কা লাগিয়েছিল প্লেনের সঙ্গে।'

'মোহরের অভিশাপ তাহলে বিশ্বাস করো না তুমি?' বলল বব।

'অভিশাপ না কচু। সব মনের ভয়।'

'তাহলে এই যে, এতগুলো অঘটন ঘটল? মোহরটা যে-ই ছুঁলো, মরল?' প্রতিবাদ করল মুসা।

'তুমি মরেছ? আমি, বব, কিংবা ওমরভাই মরেছে? ববের বাবা মরেছেন, আসলে যা ঘটার এমনিতেই ঘটত। হ্যামার আর অন্যরা যারা মরেছে, মোহরের লোভে মরেছে, অভিশাপে নয়। ঠাণ্ডা মাথায় ভালমত বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখো কোন দ্বিধা থাকবে না আর।'

'তুমি বলতে চাইছ, ওমরভাই খামোকাই অভিশপ্ত মোহরটা ফেলেছে? না ফেললেও চলত?' বব আফসোস করল। 'আহ্‌হা, তাহলে তো ভুল হয়ে গেছে। স্যুভনির রাখতে পারতাম।'

'ওটাই যে সেই মোহরটা, কি করে জানলে?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'গর্তে পেয়েছ, আরও তো মোহর ছিল। সবই একরকম। কোনটা তুলতে কোনটা তুলে পাথরে রেখেছ, শিওর হচ্ছ কি করে?'

'তাই তো!'

'যাক ওসব কথা। দেশে ফিরে এত টাকা দিয়ে কি করবে বলো দেখি?'

'আমি আর কি করব? ভাল হোস্টেলে থেকে ভাল ইসকুলে পড়ালেখা করব, ব্যস। তবে বাবা বোধহয় ভাল দেখে একটা জাহাজ কিনবে,' হঠাৎ কিশোরের হাত চেপে ধরল বব। 'কিশোর, আমার একটা কথা রাখবে? তিন গোয়েন্দায় শরিক করে

নাও না আমাকে, চার গোয়েন্দা করে ফেলো। প্লীজ।'

হাসল কিশোর। কৌশলে এড়িয়ে গেল অনুরোধটা, বলল, 'কেন, গোয়েন্দা হতে চাও কেন? ভাল একটা পালের জাহাজ বানিয়ে জলদস্যু হয়ে যাও না? টাকা তো আছেই।'

'আহা, তা যদি হতে পারতাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বব। নীল পানিতে ডলফিনের খেলা দেখতে দেখতে স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেল সে, বোধহয় লুই ডেকেইনির কথাই ভাবছে। এক সময় মুখ তুলে বলল, 'জলদস্যু হই আর না হই, নাবিক হবই। জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব খোলা সাগরে। এতদিন মনে মনে দোষ দিয়েছি বাবাকে, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, কিসের নেশায় ঘর ছেড়েছে বাবা। এই খোলা আকাশ, খোলা বাতাস, নীল সাগর···আহা!' আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল সে।

— o —

সবুজ ভূত

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ১৯৮৭

তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে চমকে উঠল রবিন মিলফোর্ড আর মুসা আমান।

পুরানো ড্রাইভ ওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, চারপাশে আগাছার জঙ্গল। চোখ মস্ত এক পোড়ো বাড়ির দিকে। এক পাশ থেকে ভেঙে ফেলা শুরু হয়েছে, নতুন বাড়ি করা হবে। চাঁদের আলোয় কেমন যেন অবাস্তব, রহস্যময় মনে হচ্ছে ভাঙা বাড়িটাকে।

রবিনের কাঁধে ঝোলানো একটা পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার, চালু করে দিয়ে পরিবেশ আর দৃশ্যাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছে জোরে জোরে, টেপ করে নিচ্ছে। চিৎকার শুনে চুপ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্যে। মুসার দিকে ফিরে বলল, লোকে বলে, ভূতুড়ে বাড়ি। ভূতের চিৎকার না তো?'

যেন তার কথার জবাব দিতেই আবার শোনা গেল টানা চিৎকার ঃ ইইইইইই-আআআআহ্‌হ্‌! মানুষ না, যেন কোন জানোয়ারের কণ্ঠ। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেল ছেলেদুটোর।

'ভূতই!' ঢোক গিলল মুসা। চাপা কণ্ঠে বলল, 'চলো, পালাই।'

'দাঁড়াও,' ঘুরে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা রোধ করল রবিন। দ্বিধা করছে মুসা, তার দিকে চেয়ে বলল, 'দেখি আর কোন শব্দ হয় কিনা। রেকর্ড করে নেব। কিশোর হলে তা-ই করত।'

গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা আসেনি ওদের সঙ্গে।

'কিন্তু…,' থেমে গেল মুসা। ভল্যুম কন্ট্রোল ঠিক করে মাইক্রোফোন বাড়ির দিকে বাড়িয়ে ধরেছে রবিন, যদি আর কোন আওয়াজ না হয়।

হলো। আবার সেই আগের মতই টানা চিৎকারঃ ইইইইইই-আআআআহ্‌হ্‌।

'আর না, চলো ভাগি!' ঘুরে ছুটতে শুরু করল মুসা।

একা দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না রবিনের, মুসার পিছু নিল সে-ও, পার্ক করে রাখা সাইকেলের দিকে।

হঠাৎ জোর করে ধরে তাদের থামিয়ে দিল কেউ।

'আউউ!' লম্বা এক লোকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মুসা। ববকে ধরেছে বেঁটে আরেকজন।

বেশ কয়েকজন লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে, গায়ে পড়ার আগে খেয়ালই করেনি দুই গোয়েন্দা। চিৎকার শুনে বোধহয় দেখতে এসেছে লোকগুলো,

কি হচ্ছে বাড়িতে।

'তুমি তো মিয়া ফেলেই দিয়েছিলে আমাকে,' মুসাকে বলল লম্বা লোকটা।

'কিসের চিৎকার?' জিজ্ঞেস করল বেঁটে লোকটা রবিনকে। 'দেখলাম দাঁড়িয়েছিলে, তারপরই দৌড় দিলে।'

'জানি না,' বলল মুসা, 'ভূত ছাড়া আর কি?'

'ভূত? বোকা কোথাকার। মানুষের চিৎকার। কেউ বিপদে পড়েছে।'

একই সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল পাঁচ-ছয়জন লোক, মুসা আর রবিনের উপস্থিতি ভুলেই গেল। নানারকম মন্তব্য করছে ওরা। সব ক'জনই ভদ্রলোক, অন্তত পোশাকে আশাকে তা-ই মনে হচ্ছে। বোধহয় প্রতিবেশী, রাতের বেলা পোড়ো বাড়িতে চিৎকার শুনে তদন্ত করে দেখতে এসেছে।

'চলুন, ঢুকে দেখি,' প্রস্তাব দিল একজন। অস্বাভাবিক ভারি কণ্ঠ, জোরে জোরে কথা বলে। চাঁদের দিকে পেছন করে রয়েছে, লোকটার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেল না রবিন, তবে গোঁফ আছে দেখা যাচ্ছে। 'বাড়ি ভাঙা হচ্ছে শুনে দেখতে এসেছিলাম। পুরানো বাড়ি, যদি কিছু বেরোয়-টেরোয়? ...চিৎকার শুনেছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইঁট খসে পড়েছে কারও মাথায়।'

'পুলিশকে খবর দেয়া দরকার,' বলল আরেকজন। কণ্ঠে দ্বিধা। পরনে চেককাটা স্পোর্টস জ্যাকেট। 'ওরা ঢুকে দেখুক কার কি হয়েছে।'

'নিশ্চয় কেউ ব্যথা পেয়েছে,' বলল ভারি কণ্ঠ। 'চলুন দেখি সাহায্য করতে পারি কিনা। পুলিশের জন্যে দেরি করলে মরেও যেতে পারে।'

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিল ভারি লেন্সের চশমা পরা একজন। 'চলুন, আগে আমরাই গিয়ে দেখি।'

'আপনারা যান, আমি পুলিশ ডেকে আনছি,' বলল চেক-জ্যাকেট।

একজনের সঙ্গে ছোট এক কুকুর, কুকুরের গলার চেন ধরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছিল এতক্ষণ বাড়িটাকে। চেক-জ্যাকেটকে ডেকে বলল, 'আরে কই যাচ্ছেন, সাহেব? পেঁচার ডাকও হতে পারে। শেষে লোক হাসাবেন তো। থামুন।'

থেমে গেল চেক-জ্যাকেট, দ্বিধা করল, ঘুরল। 'ঠিক আছে...'

নেতৃত্ব দিল বিশালদেহী একজন লোক, কৌতূহলী জনতার সব ক'জনের মাথাকে ছাড়িয়ে গেছে তার মাথা, সেই অনুপাতে শরীর। বলল, 'আসুন, সবাই। ছ'সাতজন আমরা, টর্চও আছে। ঢুকে দেখি, তেমন কিছু দেখলে পুলিশ ডাকা যাবে। এই যে ছেলেরা, বাড়ি যাও, তোমাদের আসতে হবে না।'

পাথরে তৈরি পথ ধরে গটগট করে হেঁটে চলল সে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে অনুসরণ করল অন্যেরা। কুকুরের মালিক আর চেক-জ্যাকেট রয়েছে সবার পেছনে, নির্ভয় হতে পারছে না।

'এসো,' রবিনের হাত ধরে টানল মুসা, 'বাড়ি চলে যাই।'

'কিসের শব্দ না জেনেই?' রবিন যেতে চাইছে না। 'কিশোর কি ভাববে? তার পিন-মারা সইতে পারবে? আমরা গোয়েন্দা, এভাবে চলে যাওয়া উচিত না। তাছাড়া এখন আর ভয় কি? অনেক লোক।'

লোকগুলোর পেছনে রওনা হলো রবিন। মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুসা তার পিছু নিল।

বাড়ির মস্ত সদর দরজায় এসে দাঁড়াল লোকগুলো। এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। অবশেষে দরজায় ঠেলা দিল বিশালদেহী লোকটা। খুলে গেল পাল্লা। ওপাশে গাঢ় অন্ধকার।

'টর্চ জ্বালান,' বলল নেতা। 'দেখি কি আছে।'

নিজের হাতের টর্চ জ্বেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। অন্ধকার চিরে দিল আরও তিনটে উজ্জ্বল আলোক রশ্মি। লোকগুলো সব ঢোকার পর ওদের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে ভেতরে পা রাখল দুই গোয়েন্দা।

বিরাট এক হলরুম। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখতে লাগল লোকেরা। বিবর্ণ সিল্কের কাপড়ে দেয়াল ঢাকা, কাপড়ে আঁকা প্রাচ্যের নানারকম দৃশ্যের রঙও চটে গেছে জায়গায় জায়গায়।

হলের এক জায়গা থেকে উঠে গেছে সুদৃশ্য সিঁড়ি, তাতে আলো ফেলল একজন।

'ওটা থেকে পড়েই বোধহয় পঞ্চাশ বছর আগে ঘাড় ভেঙেছিল চীনা বুড়ো ফারকোপার কৌন,' বলল যে লোকটা সিঁড়িতে আলো ফেলেছে সে। 'উঁহ্, গন্ধ! পঞ্চাশ বছরে ঘর খোলেনি নাকি কেউ?'

'কে খুলতে যাবে ভূতের বাড়ি?' বলল আরেকজন। 'এমন জায়গা, ভূত থাকা বিচিত্র নয়। এসে এখন দেখা না দিলেই বাঁচি।'

'যত্তোসব বাজে বকবকানি,' বিড়বিড় করল নেতা। 'আসুন, নিচতলা থেকেই খুঁজতে শুরু করি।'

বড় বড় একেকটা ঘর। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হতে লাগল। আসবাবপত্র নেই, মেঝেতে পুরু ধুলো। এক প্রান্তের ঘরে পেছনের দেয়াল অনেকখানি নেই, ওখান থেকেই ভাঙা শুরু করেছে শ্রমিকেরা।

কোন ঘরেই কিছু পাওয়া গেল না। শূন্য বাড়ি। কথা বললেই প্রতিধ্বনি উঠছে, ফলে জোরে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছে সবাই, ফিসফিস করে বলছে। এ-প্রান্তে কিছু নেই, বাড়ির অন্য প্রান্তের দিকে চলল ওরা। বড়সড় একটা পারলারে চলে এল। এক প্রান্তে বড় ফায়ারপ্লেস, আরেক প্রান্তে উঁচু জানালা। গুটি গুটি পায়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে এসে দাঁড়াল লোকেরা, অস্বস্তি বাড়ছে।

'আমাদের দিয়ে হবে না,' নিচু কণ্ঠে বলল একজন। 'পুলিশ...'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' হুঁশিয়ার করল আরেকজন, বরফের মত জমে গেল যেন সবাই। 'শব্দ!'

'ইঁদুর-টিদুর, ফিসফিস করে বলল তৃতীয় আরেকজন। 'আলো নেভান। অন্ধকারে নড়ে কিনা দেখি।'

নিভে গেল সব ক'টা টর্চ। ঘন কালো অন্ধকার গিলে নিল যেন মানুষগুলোকে। ধুলোয় ঢাকা ময়লা কাচের শার্সি দিয়ে চাঁদের আলো আসছে এত ম্লানভাবে, অন্ধকার একটুও কাটছে না।

'দেখুন!' বলে উঠল একজন, গলা টিপে ধরা হয়েছে যেন তার। 'দরজার

কাছে!'

একসঙ্গে ঘুরল সবাই। দেখল।

যে দরজা দিয়ে ওরা ঢুকেছে, ওটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক সবুজ মূর্তি। শরীর থেকে আবছা দ্যুতি বেরোচ্ছে, কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। রবিনের মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। ওটা কি? লম্বা একজন মানুষই তো, নাকি? গায়ে সবুজ ঢোলা আলখেল্লা?

'ভূত!' শোনা গেল দুর্বল কণ্ঠে চিৎকার। 'বুড়ো ফারকোপার কৌন!'

'আলো!' চেঁচিয়ে আদেশ দিল বিশালদেহী লোকটা। 'টর্চ জ্বালুন।'

আলো জ্বালার আগেই নড়তে শুরু করল সবুজ মূর্তিটা। দেয়ালের ধার ধরে যেন বাতাসে ভেসে চলল, বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে। তিনটে আলোর রশ্মি ছুটে গেল মূর্তিটার দিকে, চোখের পলকে নেই হয়ে গেল ওটা।

'আমি মরে গেছি, দোজখে আছি এখন!' রবিনের কানে কানে বলল মুসা। 'ওটা দোজখের দারোয়ান।'

'গাড়ির আলো হতে পারে,' নিস্তেজ কণ্ঠে বলল একজন। 'জানালা দিয়ে এসেছে। চলুন তো, ওপাশের ঘরে গিয়ে দেখি।'

দল বেঁধে এসে ঢুকল সবাই পাশের বড় ঘরে, আরেকটা হলরুম। আলো ঘুরিয়ে দেখল। কিচ্ছু নেই। আলো নেভানোর পরামর্শ দিল একজন, তাহলে 'ভূতটা' আবার আসতে পারে।

অন্ধকারে অপেক্ষা করে আছে ওরা। চাপা গোঁ গোঁ করছে ছোট্ট কুকুরটা।

এইবার মুসা দেখল সবার আগে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সবাই। মুসাও তাকাচ্ছে, হঠাৎ চোখ পড়ল সিঁড়ির দিকে। 'ওই যে! আল্লাহ্‌রে খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'সিঁড়িতে!'

সবাই দেখল। সিঁড়ির ধাপগুলোর ওপর দিয়ে যেন বাতাসে ভেসে উঠে গেল মূর্তিটা দোতলায়।

'ধরো!' বলে উঠল বিশালদেহী লোকটা। 'বোকা বানাচ্ছে আমাদের। ধরো, ব্যাটাকে।'

দুপদাপ করে উঠতে শুরু করল সবাই। দোতলায় কেউ নেই। সবুজ মূর্তি গায়েব।

'হুম্‌ম্‌, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়,' কিশোরের ভঙ্গি নকল করে বলল রবিন। ঘুরে একজন আলো ফেলল তার মুখে। সবাই ফিরে তাকাল। 'এক কাজ করতে পারি। যে রকম ধুলো, নিশ্চয় পায়ের ছাপ ফেলেছে। ওই ছাপ অনুসরণ করে ধরে ফেলতে পারব ব্যাটাকে। আমরা এখনও ওদিকে যাইনি, ছাপ পড়লে শুধু ওটারই পড়বে।'

'ঠিক বলেছে, ছেলেটা,' সায় দিল কুকুরের মালিক। 'আলো ফেলুন। আলো ফেলে দেখুন।'

প্রচুর ধুলো আছে, কিন্তু তাতে পায়ের ছাপ নেই, অথচ ওদিকেই গেছে মূর্তিটা, স্পষ্ট দেখেছে সবাই।

'নেই!' বলল কুকুরের মালিক। 'অদ্ভুত কাণ্ড! কি দেখলাম তাহলে?'

কেউ জবাব দিল না। সবাই ভাবছে। প্রত্যেকে যেন পড়তে পারছে প্রত্যেকের মনের কথা।

'আবার আলো নিভিয়ে দেখা যাক তো,' বলল আগের বার যে পরামর্শ দিয়েছিল সে।

'চলুন কাটি এখান থেকে,' বলল আরেকজন, কিন্তু তার কথা ঢাকা পড়ে গেল অন্যদের সমর্থনে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আলো নিভিয়ে দেখা যাক।'

ভয় পাচ্ছে ঠিক, কিন্তু সেটা দেখাতে চাইছে না অনেকেই।

আলো নিভে গেল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। নিচে হলের দিকে চেয়ে আছে রবিন আর মুসা, এই সময় বলে উঠল কেউ, 'ওই, ওই যে। বাঁয়ে।'

একটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষেরই আকার, সবুজ, স্পষ্ট হয়েছে আরও। মনে হচ্ছে যেন বুড়ো ফারকোপারই সবুজ আলখেল্লা পরে দাঁড়িয়ে আছে।

'ভয় পাবেন না,' ফিসফিস করে বলল কেউ। 'দেখি কি করে।'

নীরবে অপেক্ষা করে রইল দর্শকরা।

নড়তে শুরু করল মূর্তিটা। হলের দেয়ালের ধার ঘেঁষে আস্তে আস্তে ভেসে গেল এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। কোণের কাছে গিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

'চলুন, দেখি কোথায় গেল?' বিড়বিড় করল এক দর্শক। 'পালানোর তো চেষ্টা করে না।'

'এবার ছাপ দেখা যাক,' বলে উঠল রবিন। 'ওই দেয়ালের কাছে কেউ যায়নি। দেখি, পায়ের ছাপ আছে কিনা।'

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল দুটো টর্চ। দেয়ালের নিচের মেঝেতে ফেলল আলো।

'নেই!' ভারিকণ্ঠ বলল। 'কিচ্ছু নেই ধুলোতে, কোন দাগই নেই। ওটা যা-ই হোক, বাতাসে ভেসে চলে, মাটিতে পা রাখে না!'

'শেষ না দেখে ফিরছি না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বিশালদেহী নেতা। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

হলের কোণে চলে এল সবাই, এখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে মূর্তিটা। এক পাশে দরজার পরে করিডর, শেষ মাথা গিয়ে মিশেছে আরেক ঘরের আরেকটা দরজার সঙ্গে। দুটো দরজাই খোলা। আলো ফেলে সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না।

আলো নিভিয়ে দিয়ে আবার অপেক্ষায় রইল ওরা। খানিক পরেই একটা দরজায় দেখা দিল মূর্তি। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল হলের আরেক প্রান্তের দিকে। শেষ মাথায় গিয়ে থামল। তারপর ধীরে, অতি ধীরে আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল। রবিনের মনে হলো, দেয়ালে মিশে গেল ওটা।

এবারেও পায়ের ছাপ বা বালিতে কোনরকম দাগ পাওয়া গেল না।

পুলিশ ডাকতেই হলো। দলবল নিয়ে নিজেই এসে হাজির হলেন লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ-প্রধান ইয়ান ফ্লেচার। কিছুই পেল না পুলিশও। আহত কোন মানুষ কিংবা জানোয়ার, কিচ্ছু না।

পোড়-খাওয়া পুলিশ অফিসার ইয়ান ফ্লেচার, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না, ভূত দেখেছে লোকে, কিন্তু আটজন সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের কথা উড়িয়েই দেন কিভাবে? যা-ই হোক, একজন পুলিশকে পাহারায় রেখে দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি।

গভীর রাতে তাঁকে ফোন করল এক গুদামের দারোয়ান, সবুজ একটা জ্বলন্ত মূর্তিকে দেখতে পেয়েছে সে। গুদামের দরজার কাছে নড়াচড়া করছিল, সে এগোতেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে।

সে-রাতেই থানায় ফোন করল এক মহিলা। গভীর রাতে গোঙানির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় তার। একটা রহস্যময় সবুজ জ্বলজ্বলে মূর্তিকে দেখেছে সে তার বাড়ির বারান্দায়। যেই আলো জ্বেলেছে মহিলা, সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেছে মূর্তিটা। দু'জন ট্রাক-ড্রাইভার রিপোর্ট করল, তাদের গাড়ির কাছে সবুজ জ্বলন্ত মূর্তি দেখেছে।

শেষ রিপোর্ট এল পুলিশের একটা পেট্রল-কার থেকে। রেডিওতে খবর পাঠাল দুই অফিসার, রকি বীচের গ্রীন হিল গোরস্থানে একটা সবুজ মূর্তি দেখেছে ওরা। দ্রুত সেখানে এসে পৌঁছুলেন ফ্লেচার। বিরাট লোহার গেট ঠেলে ঢুকলেন গোরস্থানে। শাদা লম্বা একটা স্তম্ভে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন একটা সবুজ মূর্তিকে। তাঁকে এগোতে দেখেই যেন ধীরে ধীরে মাটিতে মিশে গেল মূর্তিটা।

টর্চ জ্বেলে দেখলেন ফ্লেচার। কিন্তু আর কিছুই চোখে পড়ল না। দ্রুত এসে দাঁড়ালেন স্তম্ভের কাছে। স্মৃতি-স্তম্ভ। মৃতের নাম, জন্ম-মৃত্যুর তারিখ আর কিভাবে মারা গেছে, লেখা রয়েছে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না অভিজ্ঞ পুলিস-প্রধান। কবরটা বুড়ো ফারকোপার কৌনের। পঞ্চাশ বছর আগে সিঁড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে যে মরেছিল।

দুই

ইইইইইইই-আআআআহ্‌হ্‌! শোনা গেল ভূতুড়ে চিৎকার, কিন্তু আঁতকে উঠল না মুসা আর রবিন, কারণ শব্দটা আসছে টেপ রেকর্ডারের স্পীকার থেকে।

লোহালক্কর আর বাতিল মালের জঞ্জালের তলায় লুকানো মোবাইলহোমের হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। আগের রাতে রবিনের রেকর্ড করে আনা টেপটা গভীর আগ্রহে শুনছে কিশোর পাশা।

'এই শেষবার, আর চিৎকার করেনি,' বলল রবিন। 'এরপর সামান্য কিছু কথাবার্তা, লোকের। বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে সুইচ অফ করে দিয়েছিলাম, আর কিছু রেকর্ড হয়নি।'

কথাবার্তা যা যা রেকর্ড হয়েছে, গভীর মনোযোগে শুনল কিশোর। রেকর্ডিংয়ের সময় মাইক্রোফোনের ভল্যুম বাড়িয়ে দিয়েছিল রবিন, ফলে স্পষ্ট আওয়াজ, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সব। টেপ শেষ হতেই সুইচ টিপে মেশিন থামিয়ে দিল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়েছে।

'মানুষের গলার মতই লাগল,' আনমনে বলল কিশোর। 'যেন সিঁড়ি থেকে

গড়াতে গড়াতে পড়ছে লোকটা, শেষ মাথায় পড়ে হঠাৎ থেমে গেছে। বোধহয় চেঁচানোর ক্ষমতা ছিল না আর।'

'ঠিক বলেছ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'তা-ই ঘটেছিল পঞ্চাশ বছর আগে। সিঁড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরেছিল কারকোপার বুড়ো। পড়ার সময় নিশ্চয় ওরকমভাবে চেঁচিয়েছে।'

'এক মিনিট,' আঙুল তুলল মুসা। 'সে তো পঞ্চাশ বছর আগের কথা। এতদিন পর কেন শোনা গেল?'

'হয়তো,' হালকা গলায় বলল কিশোর, 'পঞ্চাশ বছর আগের চিৎকারটা জমেছিল বাতাসে, এতদিন পর শব্দ হয়ে বেরিয়েছে।'

'দূর, ঠাট্টা কোরো না। পঞ্চাশ বছর আগের শব্দ কি করে শোনা গেল?'

'জানি না। রবিন, খোঁজখবর নিশ্চয় করেছ। শোনাও তো কৌন প্রাসাদের ইতিহাস,' প্রাসাদ শব্দটা বাংলায় বলল কিশোর।

'প্রাসাদ?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বাংলা। বড় বড় বাড়িকে বলে। হ্যাঁ, বলো, কৌন ম্যানশন সম্পর্কে কি কি জানলে?'

লম্বা দম নিল রবিন, তারপর শুরু করল, 'বাড়িটা ভেঙে ফেলা হচ্ছে শুনে গতকাল মুসাকে নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, পুরানো বাড়ির ওপর ভাল একটা ফিচার করে স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপতে দেব। সেজন্যেই টেপরেকর্ডার নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে, যা যা দেখব, খুঁটিনাটি সব রেকর্ড করে রাখব, পরে লেখার সুবিধে হবে ভেবে।

'চাঁদের আলোয় কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল বাড়িটা। ঢোকার পর বড় জোর পাঁচ মিনিট কাটল, তারপরই শোনা গেল প্রথম চিৎকার। মাইক্রোফোনের ভল্যুম বাড়িয়ে দিলাম। তুমি আগ্রহ দেখাবে জানতাম।'

'খুব ভাল করেছ,' বলল কিশোর। 'এতদিনে সত্যিকার গোয়েন্দার মত ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ করেছ। টেপে শুনেই বাড়িটা কত বড়, আশেপাশে আগাছার জঙ্গল কেমন, বুঝে গেছি। লোকের কথাবার্তাও শুনেছি। ওসব আর বলার দরকার নেই, বাড়ির ভেতরে ঢোকার পর কি কি ঘটল, বলো।'

বিস্তারিত জানাল সব রবিন, কিভাবে বাড়িতে ঢুকে ঘরের পর ঘর খুঁজেছে, কোথায় কিভাবে উদয় হয়েছে সবুজ ভূত, গায়েব হয়ে গেছে, সব।

'এবং ভূতের পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি,' যোগ করল মুসা। 'রবিনের মনেই প্রথম প্রশ্নটা জেগেছিল। বলতেই টর্চ নিয়ে খোঁজা শুরু করল সবাই।'

'ভাল,' বলল কিশোর। 'তা কতজন লোক সবুজ জিনিসটাকে দেখেছে, মানে, তোমাদের সঙ্গে ক'জন ছিল?'

'ছ'জন,' জানাল মুসা।

'না, সাত,' হাত নাড়ল রবিন।

চোখে চোখে তাকাল দু'জন।

'ছয়,' আবার বলল মুসা, 'আমি শিওর। বিশালদেহী নেতা, ভারিকণ্ঠ, কুকুরের

মালিক, মোটা লেন্সের চশমা পরা লোকটা, আর, আর দু'জন, তাদের দিকে ভালমত খেয়াল দিইনি।'

'কি জানি,' নিশ্চিত হতে পারছে না রবিন। 'তিনবার গুণেছি আমি। একবার গুণেছি ছয়জন, আর দু'বার সাতজন।'

'কতজন, সেটা বড় কথা না,' নিজের নীতিবাক্য নিজেই ভুলে গেল কিশোর—রহস্যভেদের কাজে কোন ব্যাপারকেই ছোট করে দেখা উচিত নয়, সে যত তুচ্ছই হোক। 'যাক, বাড়ির ইতিহাস বলো এখন।'

'বলছি,' শার্টের গলার কাছের একটা বোতাম খুলে দিল রবিন। 'আজকের কাগজে বাড়িটার সম্পর্কে অনেক কথা ছাপা হয়েছে। লাইব্রেরিতে কোন বইয়ে কিছু পাইনি। কৌন ম্যানশন অনেক আগে তৈরি হয়েছে। রকি বীচে শহর গড়ে ওঠারও অনেক আগে।

'খবরের কাগজে লিখেছে, আশি-নব্বই বছর আগে বুড়ো ফারকোপার তৈরি করেছিল বাড়িটা। চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে, নিশ্চয় খুব ঘোড়েল লোক ছিল। ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি, তবে যতটা জানা গেছে, চীনে নাকি কি এক গোলমাল পাকিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল এক অপরূপ সুন্দরী চীনা-রাজকুমারীকে। শোনা যায়, প্রথমে এসে উঠেছিল স্যান ফ্রানসিসকোয়, ভাইয়ের বাড়িতে। ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় রাগ করে চলে এসেছিল এই রকি বীচে।

'কেউ কেউ বলে, আসলে চীন-রাজবংশের উচ্চপদস্থ কারও সঙ্গে লেগেছিল ফারকোপার কৌন, হয়তো স্ত্রীর ভাই বা বাপ, বা ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে, সেই লোক নাকি প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। তাই রকি বীচে এসে বাড়ি করে লুকিয়েছিল বুড়ো। জানো তো, এদিকটায় তখন বসতি গড়ে ওঠেনি, বুনোই ছিল।

'কৌন ম্যানশনে বেশ রাজকীয় হালে বাস করেছে ফারকোপার। এক গাদা চাকর-বাকর ছিল। চীনের মানচু রাজবংশের লোকের মত আলখেল্লা পরতে পছন্দ করত সে, তার প্রিয় রঙ ছিল সবুজ। খাবার আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে আনিয়ে নিত ওয়াগনে করে, হপ্তায় একবার। একদিন এসে বাড়িটা খালি পেল ওয়াগনের ড্রাইভার। শুধু হলের সিঁড়ির গোড়ায় পড়েছিল বুড়ো ফারকোপারের লাশ। ঘাড় ভাঙা।

'পুলিশ এল। তাদের সন্দেহ, অতিরিক্ত মদ খেয়ে সামলাতে না পেরে সিঁড়ি থেকে পড়ে মরেছে বুড়ো। ভয়ে পালিয়েছে চাকর-বাকরেরা। এমনকি বুড়োর বৌ-ও।

'অনেক খোঁজ-খবর করল পুলিশ, কিন্তু এমন কাউকে পেল না যে কিছু জানাতে পারে। এমনিতেই চীনারা বাইরের লোকের কাছে গোপন কথা ফাঁস করে না, তখনকার দিনে আরও বেশি মুখ বুজে থাকত। কাছেপিঠে যে কয়েকজন চীনা ছিল, তাদের মুখ থেকে একটা শব্দও বের করতে পারেনি পুলিশ। বুড়োর চাকরদের কাউকে পায়নি। হয় চীনে পালিয়ে গিয়েছিল, নয়ত লস অ্যাঞ্জেলেসের চায়না টাউনে গিয়ে দেশোয়ালী ভাইদের মাঝে লুকিয়েছিল।

'যা-ই হোক, পুরো ব্যাপারটা একটা রহস্য। জানামতে বুড়োর একমাত্র আত্মীয় তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী, আইনত তিনিই পেলেন বাড়িটা। ভারড্যান্ট ভ্যালিতে আঙুরের খেত ছিল তাঁর। কৌন ম্যানশন বিক্রির প্রস্তাব পেয়েছেন মহিলা অনেকবার, কিন্তু বিক্রি করতে রাজি হননি। বাড়িটায় এসে থাকেনওনি কোনদিন। তিনি মারা যাওয়ার পরেও ঠিক একই রকমভাবে পড়ে থাকল বাড়িটা, পড়ে পড়ে নষ্ট হলো। তারপর, এই এ-বছর মহিলার মেয়ে, মিস দিনারা কৌন বিলডিং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর কাছে বাড়িটা বিক্রি করতে রাজি হয়েছেন। তারাই গতকাল থেকে বাড়ি ভাঙা শুরু করেছে, নতুন বাড়ি তুলবে। ব্যস, এই জানি।'

'হুঁ,' সোজা হয়ে বসল কিশোর। 'কাগজগুলো দেখা যাক এবার।'

কয়েকটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে এক এক করে টেবিলে বিছাল গোয়েন্দাপ্রধান। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা আর স্যান ফ্রানসিসকোর একটা কাগজেও খবরটা ছাপা হয়েছে, স্থানীয়গুলোতে তো হয়েছেই—বড় বড় হেডলাইন দিয়ে। লিখেছেও অনেক জায়গা নিয়ে। কেউ হেডিং দিয়েছে ঃ 'চেঁচানো ভূতের ভাঙা বাড়ি পরিত্যাগ, রকি বীচে আতঙ্ক'; কেউ 'পোড়ো বাড়ি ভাঙা শুরু, রকি বীচে সবুজ ভূতের উৎপাত'; কেউ বা আবার লিখেছে, 'পুরানো আস্তানা ধ্বংসপ্রাপ্ত, নতুন আস্তানার খোঁজে বেরিয়েছে সবুজ ভূত'।

যার যা কলমের মাথায় এসেছে লিখেছে, বানানো, রঙ চড়ানো, নানাজনের নানা মন্তব্য খুব রস দিয়ে সাজিয়েছে। তবে, আসল তথ্য সব কাগজেই প্রায় এক, রবিন একটু আগে যা বলেছে। যারা যারা ভূত দেখেছে, তাদের কথাও লেখা হয়েছে, বাদ পড়েছে শুধু পুলিশ-প্রধান ইয়ান ফ্লেচার আর তার দুই সহকারী অফিসারের কথা। ইচ্ছে করেই খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে নিজেদের কথা চেপে গেছে তারা, হাসির পাত্র হতে চায়নি।

'রকি বীচ নিউজ' কাগজটায় হাত রেখে বলল কিশোর, 'এতে লিখেছে, একটা গুদামের বাইরেও দেখা গেছে ভূতটাকে, তারপর এক মহিলার বাড়ির বারান্দায়, এরপর দেখেছে দু'জন ট্রাক-ড্রাইভার। পুরানো একটা হোটেলে তখন খাচ্ছিল ড্রাইভাররা, এই সময়ই বাইরে ট্রাকের কাছে ভূতটাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে তারা। তারমানে, বোঝাতে চাইছে, পুরানো আস্তানা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ভূতটা, নতুন আস্তানার খোঁজে আছে।'

'হ্যাঁ,' খুব জোর দিয়ে বলল মুসা, 'এমনও হতে পারে, রকি বীচ থেকে চলে যাওয়ার তালে আছে সে, ট্রাকে চড়ে, তাই ট্রাকের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল।'

'ভূত তো এমনিতেই যেখানে খুশি যেতে পারে, চোখের পলকে, তার যানবাহনের দরকার হবে কেন?'

'আমি কি জানি?' দু'হাত উল্টাল মুসা।

হাসল কিশোর। 'যা-ই হোক, খুব রহস্যময় কাণ্ড। আরও তথ্য না পেলে, কিংবা নতুন কিছু না ঘটলে...' বাধা পেয়ে থেমে গেল সে।

বাইরে থেকে ডাকছেন মেরিচাচী। 'রবিন, এই রবিন, জলদি এসো।'

তিন

রবিনের বাবা হঠাৎ করে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে?

তাড়াহুড়ো করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা।

দুই সুড়ঙ্গ মানে, একটা লম্বা লোহার মোটা পাইপ। এক মুখ কায়দা করে যোগ করে দেয়া হয়েছে মোবাইল—হোমের মেঝের একটা গর্তের সঙ্গে। আরেক মুখ জঞ্জালের বাইরে, একটা লোহার পাত ফেলে সেটা ঢেকে রাখা হয় সারাক্ষণ। হামাগুড়ি দিয়ে চলাচল করতে যাতে অসুবিধে না হয়, সেজন্যে পুরু কার্পেট পেতে দেয়া হয়েছে পাইপের ভেতরে।

বাইরে বেরোল তিন গোয়েন্দা। জঞ্জালের বেড়ার পাশ দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে এল স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাচে-ঢাকা ছোট্ট অফিসঘরের সামনের আঙিনায়।

অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে লম্বা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন মেরিচাচী। বাদামী গোঁফে আঙুল বুলিয়ে উজ্জ্বল চোখের তারা নাচিয়ে বললেন ভদ্রলোক, 'এই যে, এসে গেছে আপনার তিন আসামী। রবিন, তোমার সঙ্গে ফ্লেচার কথা বলতে চায়। মুসা, তোমার সঙ্গেও।'

ঢোক গিলল মুসা। পুলিশ-প্রধান তার সঙ্গে কথা বলতে চান? আগের রাতে যা যা দেখেছে-শুনেছে, দ্রুত গুছিয়ে নিতে শুরু করল মনে।

ঝাঁকড়া চুলে আঙুল বোলাল কিশোর। 'আংকেল, আমি আসব?'

'এসো,' হাসলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এসো, বাইরে গাড়িতে বসে আছে চীফ।'

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো সিডান। স্টিয়ারিং হুইলে এক হাত রেখে বসে আছেন ইয়ান ফ্লেচার। মোটাসোটা মানুষ, মাথার সামনের দিকটায় টাক, হাসিখুশি। ববের বাবার দিকে চেয়ে হাসলেন। 'বাড়িতেই পেয়েছ তাহলে। এসো, গাড়িতে ওঠো। দেখো রজার, আগে থেকেই বলে দিচ্ছি, আমাকে বাঁচাবে জোঁকগুলোর হাত থেকে। আরিব্বাপরে বাপ! রিপোর্টার তো না একেককটা…এসো, গাড়িতে ওঠো।'

'আমিও তো খবরের কাগজের লোক,' গাড়িতে উঠে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'সেজন্যেই তো বলছি। তুমি আমার প্রতিবেশী, সহায়তা করবে আর কি, একটু। যেভাবে প্রশ্ন শুরু করে ওরা, মুখ ফসকে কি বলতে কি বলে ফেলি, দেবে ছেপে। যাবে আমার এত বছরের ক্যারিয়ার।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, ভেব না,' হাত তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এক কাজ করি। কৌন ম্যানশনে যেতে যেতেই শুনি ওরা কি কি দেখেছে।'

'আরও কয়েকজনের মুখে শুনেছি অবশ্য,' ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে বললেন ফ্লেচার, 'তবু আরেকবার শোনা যাক। বলো তোমরা।'

সংক্ষেপে সব বলল রবিন, মাঝে মাঝে কথা যোগ করল মুসা। চুপচাপ গাড়ি চালাতে চালাতে শুনলেন পুলিশ-প্রধান। তারপর বললেন, 'অন্যেরাও এই একই

কথা বলেছে। অনেকেই দেখেছে। তবু বিশ্বাস করতাম না, যদি...' থেমে গেলেন ফ্লেচার, আরেকটু হলেই দিয়েছিলেন ফাঁস করে।

'যদি?' সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'না, কিছু না।'

'কিছু তো বটেই। ইয়ান, কিছু লুকোচ্ছ তুমি। ভূতটাকে তুমিও দেখেছ, না? এ-কারণেই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিচ্ছ না।'

'হ্যাঁ,' পথের দিকে তাকিয়ে আছেন ফ্লেচার, 'আমি দেখেছি। গোরস্থানে। ফারকোপার কৌনের কবরের কাছে, মারবেলের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি এগোতেই মিশে গেল মাটিতে, যেন কবরে ঢুকে পড়ল।'

পিঠ খাড়া হয়ে গেছে তিন কিশোরের।

আড়চোখে ফ্লেচারের দিকে তাকালেন মিস্টার মিলফোর্ড, মুচকে হাসলেন, 'নোট করে নেব?'

'না না,' আঁতকে উঠলেন ফ্লেচার, ছেলেদের দিকে ফিরলেন। 'এই, কাউকে কিছু বলবে না। তোমরা আছ ভুলেই গিয়েছিলাম। বলবে না তো?'

'না, স্যার, বলব না,' কিশোর মাথা নাড়ল।

'আমি একা নই,' চীফ নিশ্চিন্ত হলেন কিনা বোঝা গেল না, 'আরও অনেকেই দেখেছে, নিশ্চয় কাগজ পড়েছ। দু'জন ট্রাক-ড্রাইভার দেখেছে। এক মহিলা দেখেছে। এক গুদামের দারোয়ান দেখেছে। আমি দেখেছি, আমার দু'জন অফিসার দেখেছে, রবিন আর মুসা দেখেছে।'

'মোট ন'জন,' হিসাব করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'না, পনেরো,' শুধরে দিলেন ফ্লেচার। 'আরও ছ'জন ছিল রবিন আর মুসার সঙ্গে। মোট পনেরো জন দেখেছে ভূতুড়ে মূর্তিটাকে।'

'ছ'জনই ছিল, ঠিক জানেন?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'নাকি সাতজন? মুসা আর রবিন একমত হতে পারছে না।'

'আমি শিওর না। চারজনের রিপোর্ট শুনেছি আমরা। তিনজন বলেছে, তোমরা ছাড়া আরও ছ'জন ছিল। একজন বলেছে সাতজন। অন্য দুই বা তিন, যে-ক'জনই হোক, ওদের রিপোর্ট নেয়া হয়নি। ওরাও আসেনি। বোধহয় পাবলিসিটি চায় না। পনেরো হোক আর ষোলোই হোক, এতগুলো লোক দেখেছে, চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। নিজের চোখে দেখলাম, মাটিতে মিলিয়ে গেল, অবিশ্বাস করি কি করে?'

অযত্নে গজিয়ে ওঠা ঘাসে-ঢাকা ড্রাইভওয়েতে ঢুকল গাড়ি। দিনের আলোয় চমৎকার লাগছে বাড়িটাকে, একটা অংশ ভাঙা অবস্থাতেও। সদর দরজায় পাহারা দিচ্ছে দু'জন পুলিশ। বাদামী স্যুট পরা এক লোক অস্থির ভাবে পায়চারি করছে ওদের সামনে। গাড়িটাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল।

'কে?' বিড়বিড় করল ফ্লেচার। 'আরেকটা জোঁক বোধহয়।'

এগিয়ে এল লোকটা। 'চীফ ফ্লেচার?' খুব মিষ্টি কণ্ঠ। 'আপনি পুলিশ চীফ তো? আপনার অপেক্ষায়ই আছি। আমার মক্কেলের বাড়িতে আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে

না কেন আপনার লোক?'

'আপনার মক্কেল?' ভুরু কুঁচকে গেল পুলিশ-প্রধানের। 'কে আপনি?'

'আমি উলফ টার্নার,' পরিচয় দিল লোকটা। এ-বাড়ি মিস দিনারা কৌনের, আমি তার উকিল, দূর সম্পর্কের ভাইয়ের ছেলে। তার ভালমন্দ দেখাশোনার ভার আমার ওপর। সকালে খবরের কাগজ পড়েই ছুটেছি, স্যান ফ্রানসিসকো থেকে উড়ে এসেছি। আমি ভালমত তদন্ত করতে চাই। পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার কাছে, পাগলের প্রলাপ।'

'অবিশ্বাস্য, ঠিক,' মাথা দোলালেন ফ্লেচার, 'তবে পাগলের প্রলাপ নয়। য়্যাক, আপনি এসেছেন, খুশি হলাম মিস্টার টার্নার। নইলে আসার জন্যে খবর পাঠাতে হত হয়তো। ও হ্যাঁ, পাহারা রেখেছি, কারণ, যখন-তখন যে কেউ ঢুকে পড়তে পারে। আমার নির্দেশ আছে, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়া হয়। তাই আপনাকে ঢুকতে দেয়নি। চলুন, এখন ঢুকি। এই যে, এই ছেলেরাও গতরাতে এসেছিল এখানে, সবুজ মূর্তিটাকে দেখেছে। এজন্যেই এখন নিয়ে এসেছি। কোথায় কোথায় দেখা গেছে, দেখাবে আমাদের।'

তিন কিশোর আর মিস্টার মিলফোর্ডের সঙ্গে টান্যারের পরিচয় করিয়ে দিলেন ফ্লেচার। তারপর সদর দরজার দিকে রওনা হলেন। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল প্রহরীরা। বিরাট হলে ঢুকলেন তিনি, সঙ্গে অন্য পাঁচজন। আবছা আলো হলে, গা ছমছমে পরিবেশ। রবিন আর মুসা দেখাল, ঠিক কোথায় প্রথম উদয় হয়েছিল মূর্তিটা।

মুসা ওদেরকে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল। 'এই সিঁড়ির ওপর দিয়ে ভেসে হলে নেমেছিল মূর্তিটা,' জানাল সে।

'ভেসে বলছ কেন?' প্রশ্ন করলেন পুলিশ-প্রধান।

'মাটিতে পায়ের ছাপ দেখা যায়নি, সবাই খুঁজেছি। উড়ে না নামলে কি করে নামল? ছাপ খোঁজার কথা রবিনের মনে হয়েছিল। সবাই খুঁজেছি, কিন্তু ছাপ-টাপ দেখিনি।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'উড়ে হলের ওই যে, ওখানটায় চলে গেল,' হাত তুলে দেখাল মুসা, 'দেয়ালের কাছে। এক সময় দেয়ালের ভেতর দিয়ে ঢুকে মিলিয়ে গেল।'

'আঁমমন্,' ভ্রূকুটি করলেন ফ্লেচার, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে উকিল। 'বুঝতে পারছি না কিছু? ভূতুড়ে বাড়ির কিস্সা অনেক শুনেছি। আমার বিশ্বাস হয় না ওসব।'

'কি বিশ্বাস হয়?' ভুরু নাচালেন ফ্লেচার। 'কি ছিল বলে আপনার ধারণা?'

চোখ মিটমিট করল উকিল। 'আমি কি করে জানব?'

'সেটা জানার জন্যেই এসেছি আমরা। আপনি আসাতে কেন খুশি হয়েছি, জানেন?'

'কেন?'

'আজ সকালে মইয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির এক জায়গায় প্লাস্টার ভাঙছিল এক শ্রমিক।

এই যে, আমরা যেখানে রয়েছি, তার নিচের তলারই একটা সাইড। কিছু একটা দেখে কাজ থামিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে।'

'কী?' সামনে ঝুঁকে এল টার্নার। 'কি দেখলে?'

'ও শিওর না। তবে ওই যে দেয়ালটা,' যেটা গলে ভূত অদৃশ্য হয়েছে বলেছে মুসা, সেদিকে দেখিয়ে বললেন ফ্লেচার, 'লোকটার ধারণা, ওটার ওপাশে। একটা গোপন কুঠুরিমত আছে। আপনার অনুমতি পেলে ভেঙে ঢুকতে পারি আমরা।'

কপাল ডলল টার্নার। মিস্টার মিলফোর্ডের দিকে তাকাল, তিনি তখন নোটবইয়ে নোট লিখতে ব্যস্ত। 'গোপন কুঠুরি?' রীতিমত অবাক হয়েছে উকিল। 'কই, এ বাড়িতে তেমন কোন কুঠুরি আছে বলে তো শুনিনি।'

প্রচণ্ড উত্তেজনা কোনমতে দমিয়ে রেখেছে তিন কিশোর।

উকিলের অনুমতি পেয়ে কুড়াল আর শাবল নিয়ে এল দুই পুলিশ।

দেয়ালের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন ফ্লেচার, 'ভাঙো।'

প্রচণ্ড বিক্রমে দেয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ দু'জন। একটা ফোকর করে ফেলল। বোঝা গেল, ওপাশে ফাঁপা জায়গা রয়েছে, অন্ধকার, দেখা যায় না কি আছে। আরও বড় করা হলো ফোকর, মানুষ ঢুকতে পারবে। হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেললেন ফ্লেচার।

অস্ফুট স্বরে কিছু বললেন, তারপর ফোকর গলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। ঢুকবে কিনা দ্বিধা করছে উকিল, কিন্তু ফ্লেচারের পেছনে মিস্টার মিলফোর্ডকে যেতে দেখে সে-ও ঢুকল। বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের উত্তেজিত কথা শুনতে পেল তিন গোয়েন্দা।

ফোকর দিয়ে উঁকি দিল কিশোর, তারপর দুই সহকারীর দিকে একবার চেয়ে সে-ও ঢুকে পড়ল। মুসা আর রবিনও ঢুকল।

ছোট একটা কক্ষ, ছয় বাই আট ফুট। দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে আলো আসছে, আস্তর খসানোর সময়ই নিশ্চয় ফেটেছে।

ঘরে আর কিছু নেই, শুধু একটা কফিন।

চকচকে পালিশ করা নিচু কাঠের টেবিলে রাখা আছে কফিনটা, জায়গায় জায়গায় চমৎকার খোদাইয়ের কাজ। ডালা তোলা। ভেতরের কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ফ্লেচার আর অন্য দু'জনের।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ছেলেরাও উঁকি দিল কফিনের ভেতরে। চমকে উঠল।

একটা কঙ্কাল। পুরোটা দেখা যাচ্ছে না। দামী আলখেল্লায় ঢেকে আছে। এক সময় খুব সুন্দর ছিল কাপড়টা, এখন অনেক জায়গায় নষ্ট হয়েছে দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে থেকে।

সবাই নীরব। অবশেষে কথা বললেন মিস্টার মিলফোর্ড, 'দেখো, প্লেটটা দেখো!' কফিনের গায়ে আটকানো রূপার একটা পাত দেখালেন। তাতে ইংরেজিতে লেখা ঃ ফারকোপার কৌনের প্রিয় স্ত্রী শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন এখানে।

'ফারকোপারের চীনা স্ত্রী।' খসখসে শোনাল চীফের কণ্ঠ।

'অথচ লোকে ভেবেছে, বুড়ো মারা যাওয়ার পর চীনে পালিয়েছে মহিলা,' বিড়বিড় করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'লোকের কথা। দেখুন দেখুন,' কফিনের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল উকিল।

জিনিসটা বের করে আনল টার্নার। একটা মালা। গোল গোল পাথরের মত কিছু দিয়ে তৈরি হয়েছে। টর্চের আলোয় ভোঁতা ধূসর আভা বিকিরণ করছে।

'এটাই বোধহয় সেই বিখ্যাত গোস্ট পার্লস,' বলল উকিল। 'আমাদের পারিবারিক অলংকার, চীন থেকে নিয়ে এসেছিল মিস্টার ফারকোপার কৌন। অনেক দামী জিনিস। মিস্টার কৌন ঘাড় ভেঙে মরল, তার স্ত্রী নিখোঁজ হয়ে গেল। আমরা ভেবেছিলাম, হারটা নিয়ে আবার দেশে ফিরে যাওয়ার পথে কোনভাবে লাপাত্তা হয়ে গেছে মহিলা। অথচ এখানে, এই বাড়িতেই ছিল এতগুলো বছর!'

চার

হেডকোয়ার্টারে কাজে ব্যস্ত মুসা আর রবিন। সবুজ ভূত সম্পর্কে খবরের কাগজে যা যা লেখা বেরিয়েছে, সবগুলোর কাটিং কেটে দিচ্ছে মুসা; আঠা দিয়ে বড় একটা খাতায় সেগুলো সেঁটে রাখছে রবিন।

সবুজ ভূত সম্পর্কে লোকের আগ্রহ কমে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ করে পোড়ো বাড়িতে গোপন কুঠুরি, কফিনের ভেতরে বুড়ো ফারকোপারের চীনা স্ত্রীর মৃতদেহ আর মুক্তোর মালা আবার নতুন করে সাড়া জাগাল রকি বীচের লোকের মনে। প্রথম পাতায় বড় বড় হেডিং দিয়ে ছাপা হলো সেই খবর।

ফারকোপার কৌনের অতীত ইতিহাস আরও গভীরে খুঁড়ে বের করার জন্যে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল রিপোর্টারেরা। জানা গেল, চীনা জাহাজে ক্যাপ্টেনের চাকরি করেছে কিছু দিন ফারকোপার। দুর্ধর্ষ নাবিক নাকি ছিল সে, ভয়াবহ ঝড়কেও পরোয়া করত না, জাহাজ নিয়ে ঢুকে পড়ত ঝড়ের মাঝে। বেশ কয়েকজন মানচু রাজবংশীয় ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তার, প্রায়ই নানারকম মূল্যবান জিনিস তাকে উপহার দিত তারা। তবে গোস্ট পার্ল তাকে উপহার দেয়া হয়নি, ওটা সে চুরি করেছে, তারপর তাড়াহুড়ো করে স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছে, আর কোনদিন চীনে যাওয়ার আশা ত্যাগ করে। তারপর, বাকি জীবনটা কৌন ম্যানশনে লুকিয়ে কাটিয়েছে।

'ভাবো একবার,' হাত থামিয়ে বলে উঠল হঠাৎ রবিন, 'এমন একটা লোক এই রকি বীচেই ছিল এতদিন, আর কি কাণ্ডটাই না ঘটাল। বাবা আর চীফ কি ভাবছে জানো?'

ধাতব শব্দ হতেই থেমে গেল রবিন। দুই সুড়ঙ্গের মুখের লোহার পাত সরানোর আওয়াজ। চাপা খসখস শব্দ হলো কিছুক্ষণ, তারপর ট্রেলারের মেঝেতে লাগানো ট্র্যাপডোরে টোকা পড়ল।

দরজার হুড়কো সরিয়ে দিল মুসা।

গর্তের মুখে বেরিয়ে এল কিশোরের মাথা। 'হুফ্ফ্!' মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল সে, উঠে এল। যা গরম পড়েছে। ...ভাবছি।'

'সাবধান, কিশোর,' হেসে বলল মুসা, 'ভাবাভাবিটা এখন একটু কমাও। নইলে মগজের বেয়ারিং জ্বলে গিয়ে শেষে আমাদের মতই ভোঁতামাথাদের একজন হয়ে

যাবে।'

শব্দ করে হাসল রবিন।

কিশোরের মগজ সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা মুসার, কিন্তু সুযোগ পেলেই সেটা নিয়ে বন্ধুকে খোঁচা মারতেও ছাড়ে না সে। কিন্তু সাবধানী ছেলে কিশোর, এড়িয়ে যায়। মেজাজ শান্ত রাখার ক্ষমতা তার অপরিসীম।

মুসার কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, এমনি ভঙ্গিতে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল তার সুইভেল চেয়ারে। 'ভাবছি,' আবার বলল সে। 'ভাবায় লাভও হচ্ছে অবশ্য। অনেক-বছর আগে কৌন ম্যানশনে কি ঘটেছিল, অনুমান করতে পারছি।'

'তোমার কষ্ট না করলেও চলত, কিশোর,' রবিন বলল। 'বাবা আর চীফও এ-নিয়ে অনেক ভেবেছেন…'

'আমার ধারণা,' রবিনের কথা কানে তুলল না কিশোর।

'বাবা আর চীফের ধারণা,' কিশোরকে কথা শেষ করতে দিল না রবিন। সে যা যা জানে, সেটা তার আগেই কিশোর বলে ফেলুক, এটা হতে দিল না। 'রোগে ভুগে মারা গেছে ফারকোপারের স্ত্রী। সুন্দর একটা কফিনে ভরে তাকে তখন বাড়িরই ছোট্ট একটা ঘরে রেখে দিল বুড়ো নাবিক, প্রিয়তমা স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে দিতে মন সায় দেয়নি হয়তো, মৃত্যুর পরও তাই কাছে কাছে রেখেছে। সম্ভবত করিডর দিয়ে কফিনটা সেই ঘরে ঢুকিয়েছে বুড়ো, তারপর জানালা দরজা ভেঙে ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছে ফোকর। তার ওপর প্লাস্টার করে দিয়েছে। বাইরে থেকে দেখে আর বোঝার উপায় ছিল না, একটা গোপন কুঠুরি আছে ওখানে।

'তারপর কতদিন বেঁচে ছিল ফারকোপার, জানা যায়নি। এক রাতে সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে পড়ে মরল সে।

'চাকরেরা বুড়োর লাশ দেখে ভয়ে রাতেই পালাল। স্যান ফ্রানসিসকোর চীনা-পল্লীতে ঠাঁই নিয়েছিল, না দেশে পালিয়েছিল, জানা যায়নি। কারণ, স্বদেশীদের ব্যাপারে আমেরিকান পুলিশের কাছে মুখ খোলেনি চীনা-পল্লীর চীনারা।

'যতদূর জানা যায়, আত্মীয় বলতে একজনই ছিল ফারকোপারের, তার ভাইয়ের স্ত্রী। স্যান ফ্রানসিসকোর ভারড্যান্ট ভ্যালিতে আঙুরখেত…'

'এসব পুরানো কথা,' হাত তুলল কিশোর, 'জানি।'

'শেষ পর্যন্ত শোনোই না,' বলে চলল রবিন। 'এত কাছেই থাকে, অথচ মহিলা কোন দিন ফারকোপারের বাড়িতে আসেনি। তার মেয়ে দিনারা কৌনও না। মায়ের মৃত্যুর পর আঙুরের খেত আর কৌন ম্যানশনের মালিক হয়েছে মেয়ে।

'পুরানো বাড়িটাকে এতদিন কেন বিক্রি করেনি ওরা, সেটা এক রহস্য। কেন এভাবে ফেলে রেখেছিল, সেটাও। এই এতদিন পরে বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয়েছে মিস দিনারা কৌন।'

'তারপর,' মুসা যোগ করল, 'বাড়ি ভাঙা শুরু হতেই বিরক্ত হয়ে উঠল সবুজ ভূত। গোপন কুঠুরি থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে সাবধান করল। ভূত অবশ্য বুঝতে পেরেছে, যত যা-ই করুক, ওই বাড়িতে আর থাকতে পারবে না সে, তাই নতুন আস্তানার খোঁজে বেরিয়েছে।'

'তোমার তাই ধারণা,' কিশোর বলল। 'ওটা ফারকোপার বুড়োর ভূত, এতেও নিশ্চয় কোন সন্দেহ নেই।'

'তোমার আছে? ওটা যদি ভূত না হয়, আমার নাম বদলে রাখব।'

'নামটা শেষে সত্যিই না বদলাতে হয়...'

কিশোরের কথায় বাধা দিল রবিন। 'তোমার কি মনে হয়, ভূত না ওটা? অন্য কিছু ভেবে থাকলে গিয়ে বলো চীফকে, হয়তো পুরস্কার দিয়ে দেবেন।'

'মানে?' চোখ মিটমিট করল কিশোর।

'কেন, কাল শোনোনি? সবার সামনেই তো চীফ বলেছেন, ভূতটাকে তিনিও দেখেছেন। পরে বাবাকে বলেছেন, ভূতে বিশ্বাস করেন না তিনি, কিন্তু এই ব্যাপারটাকে অবিশ্বাসও করতে পারছেন না। তাই জোর গলায় হুকুম দিতে পারছেন না সহকারীদের যে, সবুজ জিনিসটাকে ধরে এনে দাও। এখন যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে ওটা ভূত নয়, তাকে পুরস্কার দেবেন না?'

'হুম্‌ম্‌,' মাথা দোলাল কিশোর, খুশি মনে হচ্ছে তাকে। 'তাহলে সবুজ ভূতের কেসটা নিতে পারি আমরা, অন্তত পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করার জন্যে হলেও। যত সহজ ভাবছ, ব্যাপারটা তত সহজ না-ও হতে পারে। এর পেছনে অনেক গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে, আমি শিওর।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল মুসা। 'পুলিশ আমাদের সাহায্য চায়নি, এক নম্বর। দুই নম্বর, ওই ভূতপ্রেতের ব্যাপারে নাক গলাতে ব্যক্তিগতভাবে আপত্তি আছে আমার।'

বব আপত্তি করল না, চুপ করে রইল।

'কেন, আপত্তি কেন?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'তিন গোয়েন্দার নীতিই তো হলো, যে-কোন জটিল রহস্য সমাধানের চেষ্টা করা। ভূতরহস্য কি রহস্য নয়? ভূত বিশ্বাস করি না মোটেও, কিন্তু যদি সত্যিই থেকে থাকে, আর একটাকে পাকড়াও করতে পারি, কি রকম সাড়া পড়বে, ভেবেছ?' রবিন আর মুসার দিকে তাকিয়ে নিল একবার করে। 'হ্যাঁ, গোড়া থেকে শুরু করি। গতরাতে আবার দেখা গিয়েছিল ভূত?'

'কাগজে তো কিছু লেখেনি,' বলল রবিন। 'চীফকে জিজ্ঞেস করেছিল বাবা। চীফ জানিয়েছেন, নতুন কোন রিপোর্ট আসেনি থানায়।'

'সে-রাতে কৌন ম্যানশনে যে ক'জন ভূতটাকে দেখেছে, সবার সঙ্গে কথা বলেছেন তোমার বাবা?'

'নাহ্। চারজনের সঙ্গে বলেছে। বিশালদেহী লোকটা, কুকুরের মালিক, আর কৌনের দুই প্রতিবেশী।'

'বাকি দু'জন?'

'কারা ছিল, সেটাই জানা যায়নি। বাবার ধারণা, ওরা পাবলিসিটি চায় না, বন্ধুদের হাসির খোরাক হতে নারাজ। আমি শিওর, দু'জন নয়, তিনজনই।'

'ঠিক আছে, ধরে নিলাম সাত জনই। কৌন ম্যানশনে আসার সাধ জেগেছিল কেন হঠাৎ?'

'জ্যোৎস্নায় হাঁটাহাঁটি করছিল ফারকোপারের প্রতিবেশীরা, এই সময় দু'জন লোক এসে তাদেরকে প্রস্তাব দিল, চাঁদের আলোয় ভাঙা পোড়ো বাড়ি কেমন লাগে, দেখতে যাওয়ার। লোকগুলোকে চেনে না প্রতিবেশীরা। তবে প্রস্তাবটা তাদের মনে ধরল। ড্রাইভওয়েতে ঢুকেই চিৎকার শুনতে পেল ওরা। তারপর কি হয়েছে, সব জানো।'

'বাড়ি ভাঙা বন্ধ হয়েছে?'

'আপাতত। গোপন আরও কুঠুরি আছে কিনা, খুঁজেছে পুলিশ। পাওয়া যায়নি। এখনও বাড়িটাকে কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছে। বাবা বলছে, ওখানে নতুন বাড়ি করলেও আর বিশেষ সুবিধে হবে না, ভাড়াটে পাওয়া মুশকিল হবে। ভূতের ভয়ে আসতে চাইবে না লোকে।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর, ধ্যানমগ্ন হয়ে রইল যেন কয়েক মিনিট, দৃষ্টি ছাতের দিকে। অবশেষে মুখ নামিয়ে রবিনকে বলল, 'টেপরেকর্ডারটা নাও, শুনি আবার ক্যাসেটটা।'

রেকর্ডারের সুইচ টিপে দিল রবিন। কানে আঘাত হানল তীক্ষ্ণ বিকট চিৎকার। তারপর লোকের কথাবার্তা। শুনতে শুনতে ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'কিছু একটা রয়েছে টেপে, ঠিক বুঝতে পারছি না, বের করে আনতে পারছি না। আচ্ছা, কুকুরের আওয়াজ যে শুনলাম, কি জাতের কুকুর?'

'কুকুরের জাত দিয়ে কি হবে?' হাত নেড়ে বলল মুসা।

'হতেও পারে। কোন কিছুকেই ছোট করে দেখা উচিত হবে না।'

'ফক্স্ টেরিয়ার,' বলল রবিন, 'রোমশ। ছোট্ট কুকুর। কিছু বুঝলে?'

বোঝেনি, বলতে বাধ্য হলো কিশোর। আবার বাজিয়ে শুনল টেপটা, আবার। কি যেন একটা ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু ধরতে পারছে না সে। টেপরেকর্ডার বন্ধ করে খবরের কাগজের কাটিং পড়ায় মন দিল।

'শহরের বাইরে চলে গেছে সবুজ ভূত,' বলল মুসা, 'এতে কোন সন্দেহ নেই। বাড়ি ভাঙা শুরু হতেই সটকে পড়েছে।'

জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। ফোন বেজে উঠেছে। রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো?'

ফোনের সঙ্গে কায়দা করে আটকানো লাউড-স্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠল। সবাই শুনতে পেল কথা। 'লঙ ডিসট্যান্স্ কল,' বলল মহিলাকণ্ঠ। 'রবিন মিলফোর্ডকে চাই।'

একে অন্যের দিকে তাকাল ছেলেরা।

'রবিন, তোমার,' বলে রিসিভার বাড়িয়ে ধরল কিশোর।

'হ্যাল্লো, রবিন মিলফোর্ড বলছি,' উত্তেজনায় গলা মৃদু কাঁপছে তার।

'হ্যাল্লো, রবিন,' বলল এক মহিলাকণ্ঠ, বৃদ্ধা, আওয়াজেই বোঝা গেল। 'আমি দিনারা কৌন। ভারড্যান্ট ভ্যালি থেকে বলছি।'

দিনারা কৌন! ফারকোপার কৌনের ভাইঝি।

'হ্যাঁ, বলুন?'

'আমার একটা উপকার করবে?' অনুনয় করলেন মহিলা। 'তুমি আর তোমার বন্ধু, মুসা আমান, দয়া করে আসবে একবার ভারড্যান্ট ভ্যালিতে?'

'ভারড্যান্ট ভ্যালিতে! কেন?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরী। আমার চাচাকে দেখেছ তোমরা···ইয়ে, মানে, তাঁর ভূত দেখেছ। দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে সব শুনতে চাই। ভূতটা কেমন, কি করেছে, সব···,' চুপ হয়ে গেলেন দিনারা, বোঝা যাচ্ছে, দ্বিধা করছেন। শেষে বলেই ফেললেন, 'জানো, আমি···আমিও গতরাতে দেখেছি, এই ভারড্যান্ট ভ্যালিতে। আমার ঘরে।'

পাঁচ

কিশোরের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রবিন।

'হ্যাঁ,' বলে দেয়ার জন্যে মাথা ঝুঁকিয়ে ইঙ্গিত করল কিশোর।

'হ্যাঁ নিশ্চয় আসব, মিস কৌন,' টেলিফোনে বলল রবিন। 'মুসাও আসবে হয়তো! অবশ্য যদি আমাদের বাবা-মার কোন আপত্তি না থাকে।'

'তা-তো বটেই, তা-তো বটেই,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মহিলা। 'সে-জন্যেই আগে তোমাদের বাড়িতে ফোন করেছি। তোমার মা'র আপত্তি নেই, মুসার মা-ও রাজি হয়েছেন। ভারড্যান্ট ভ্যালি খুবই সুন্দর জায়গা, বুঝেছ? আর তোমাদের বয়েসী এক নাতি আছে আমার, রিচার্ড মিঙ কৌন, তোমাদের সঙ্গ দিতে পারবে। প্রায় সারাজীবনই চীনে কাটিয়েছে।'

কিভাবে কখন যেতে হবে, বিস্তারিত জানালেন মিস কৌন। ছ'টার প্লেন ধরতে হবে রবিন আর মুসাকে, স্যান ফ্রানসিসকোয় যাবে। এয়ারপোর্টে তাদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি, গাড়িতে করে নিয়ে যাবেন ভারড্যান্ট ভ্যালির বাড়িতে। আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।

'দারুণ হলো!' আনন্দে জ্বলজ্বল করছে রবিন। 'ভাল একখান জার্নি করে আসা যাবে।' হঠাৎ মনে পড়ল তার, 'কিন্তু তোমাকে তো যেতে বলেনি, কিশোর?'

আহত হয়েছে কিশোর অবশ্যই, কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না। 'আমি ভূত দেখিনি, তোমরা দু'জন দেখেছ, তোমাদেরকেই তো বলবে। বললেও অবশ্য আমি এখন যেতে পারতাম না, জরুরী কাজ আছে। বড় ট্রাকটা নিয়ে কাল চাচা-চাচীর সঙ্গে স্যান ডিয়েগো যেতে হবে। নেভির বাতিল মালের একটা লট আছে, দেখেশুনে আনা দরকার।'

'যা-ই বলো, তোমাকে ছাড়া যেতে ভাল লাগছে না,' মুসা আন্তরিক দুঃখিত। 'আর ধারেকাছে যদি ভূত থাকে তাহলে তো কথাই নেই। তুমি ছাড়া গতি নেই আমাদের।'

মুসার কথায় মনে মনে খুশি হলো কিশোর। বলল, 'হয়তো এটা ভালই হলো। ভারড্যান্ট ভ্যালিতে ভূত দেখা গেল, তোমরা তদন্ত চালাতে পারবে। এদিকে, খোঁজখবর করে রহস্য সমাধানের চেষ্টা করব আমি। টীম ওয়ার্ক করছি আমরা, ঠিক, কিন্তু তিনজনকে একই সঙ্গে একই জায়গায় থেকে কাজ করতে হবে, এটা কোন

যুক্তি নয়। একই কাজের জন্যে দরকার পড়লে তিন জনকে তিন জায়গায় যেতে হবে না?'

অকাট্য যুক্তি, কিন্তু মুসা আর রবিনের মন খুঁত খুঁত করতেই থাকল। জোর করে ওদেরকে তুলে বাড়ি পাঠাল কিশোর, তৈরি হওয়ার জন্যে।

মুসা আর রবিনের মা সুটকেস গুছিয়েই রেখেছেন। ছেলেরা বাড়তি কিছু জিনিস নিল, একটা করে টর্চ, কিছু চক—রবিন সবুজ রঙের, মুসা নীল—দরকারের সময় দেয়ালে বা অন্য কোন জায়গায় তিন গোয়েন্দার আশ্চর্যবোধক চিহ্ন এঁকে সংকেত রাখার জন্যে।

লস অ্যাঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে তাদেরকে তুলে দিতে গেলেন রবিনের মা গাড়ি নিয়ে, সঙ্গে গেল কিশোর।

'ফোনে যোগাযোগ রাখবে আমার সঙ্গে,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'কিছু ঘটলে জানাবে। ভূতটা যদি ওখানে আবার দেখা যায়, তেমন বুঝলে আমিও চলে আসব পরে।'

বার বার ছেলেকে হুঁশিয়ার করে দিলেন রবিনের মা, 'সাবধানে থাকবে। আর দেখো, মহিলার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার কোরো না।'

'ও তো কারও সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করে না, আন্টি,' প্রতিবাদ করল কিশোর।

'জানি,' হাসলেন মিসেস মিলফোর্ড, 'তবু বলছি।'

প্লেন ছাড়ল। আকাশে উঠল বিশাল জেট, উড়ে চলল উত্তরমুখো। বেশি না, মাত্র এক ঘণ্টার ভ্রমণ, এরই মাঝে ডিনার আছে, তাই সময়টা আরও কম মনে হয়।

দেখতে দেখতে স্যান ফ্রানসিসকোয় পৌঁছে গেল বিমান, ল্যাণ্ড করল।

লাউঞ্জে মুসার বয়েসী, প্রায় তাঁর সমান লম্বা, চওড়া কাঁধ, এক কিশোরের সঙ্গে পরিচয় হলো তাদের। এগিয়ে এসে স্বাগত জানাল, চলন-বলন-চেহারায় পাক্কা আমেরিকান ছাপ, চোখ দুটো শুধু চীনা, তা-ও পুরোপুরি নয়।

পরিচিত হলো রিচার্ড কৌন, মিঙ নামটাই তার পছন্দ, তাই ওটা ধরে ডাকতেই অনুরোধ জানাল নব পরিচিত বন্ধুদের। স্বল্প সময়েই জানিয়ে দিল, তার রক্তের চার ভাগের এক ভাগ চীনা, তবে বয়েসের চার ভাগের তিন ভাগ কাটিয়েছে চীনে, হংকং এ। মালপত্র বইতে মুসা আর রবিনকে সাহায্য করল সে, পথ দেখিয়ে বের করে নিয়ে এল বিমানবন্দর থেকে। ব্যস্ত রাস্তা পার হয়ে এসে দাঁড়াল বিরাট পার্কিং লটে।

একটা স্টেশন ওয়াগন অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে, ছোটখাট একটা বাস বললেই চলে। ড্রাইভিং সীটে বসা এক তরুণ মেকসিকান।

'হুগো,' লোকটাকে বলল মিঙ, 'এরাই আমাদের মেহমান। ও রবিন মিলফোর্ড, আর ও মুসা আমান। চলো, সোজা বাড়ি চলো। প্লেনে কি খেয়েছে না খেয়েছে, নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।'

'সি, সিনর মিঙ,' দরজা খুলে লাফিয়ে নামল হুগো। দু'হাতে দুটো ব্যাগ তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়ির পেছনের সীটে রাখল। ফিরে এসে বসল আবার ড্রাইভিং সীটে।

তার ঠিক পেছনেই উঠে বসল ছেলেরা, তিনজন একই সীটে পাশাপাশি। গাড়ি ছাড়ল হুগো।

স্যান ফ্রানসিসকো শহরটা ভালমত দেখার ইচ্ছে ছিল মুসা আর রবিনের, কিন্তু হতাশ হতে হলো। শহরের ভেতরে গেল না গাড়ি, মোড় নিয়ে বেরিয়ে এল এক প্রান্ত দিয়ে। উঠে পড়ল হাইওয়েতে। পথের দু'ধারে কোথাও পাহাড়, কোথাও খোলা জায়গা।

'অনেক বড় আঙুরের খেত তোমার দাদীর, না?' এক সময় জিজ্ঞেস করল মুসা।

'অনেক বড়,' বলল মিঙ। 'গেলেই দেখবে। মদ চোলাইয়ের কারখানাও আছে। দাদীমা বলে, সব আমাকে দিয়ে যাবে। কিন্তু আমার কেন জানি নিতে ইচ্ছে করে না।'

আগ্রহ প্রকাশ করল রবিন আর মুসা। অনেক কথাই জানাল মিঙ যেতে যেতে।

জানা গেল, ফারকোপার কৌনের প্রপৌত্র মিঙ কৌন। চীনা রাজকুমারী ছিল ফারকোপারের দ্বিতীয় স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিয়ে করেছিল।

যেখানেই যেত, প্রথম স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেত ফারকোপার, জাহাজে যখন সে দূর সাগরে পাড়ি জমাত, তখনও কাছছাড়া করত না। এমনি এক ভ্রমণের সময়েই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেল মহিলা। সদ্যপ্রসূত ছেলেকে নিয়ে মুশকিলে পড়ল ফারকোপার, হংকং থেকে রওনা হয়েছিল, তাড়াতাড়ি ফিরে গেল আবার ওখানেই।

শিশুর দেখাশোনা কে করবে? ফারকোপারের পক্ষে সম্ভব নয়। হংকঙের এক আমেরিকান মিশনারিতে ছেলেকে রাখার ব্যবস্থা করল। এর কিছুদিন পরেই রাজবংশের লোকের সঙ্গে গোলমাল বাধল তার, সুন্দরী রাজকুমারীকে বিয়ে করা নিয়ে। আর থাকা যাবে না চীনে, বুঝে ফেলল। শেষে গোস্ট পার্ল চুরি করে বৌকে নিয়ে পালিয়ে এল আমেরিকায়। তার ছেলে রয়ে গেল হংকঙেই।

সেই ছেলে, রবার্ট কৌন বড় হলো, লেখাপড়া শিখল, কিন্তু আমেরিকায় আর ফিরল না। মিশনারির ডাক্তার হিসেবে থেকে গেল হংকঙেই, বিয়ে করল এক চীনা তরুণীকে। এক ছেলে হলো তাদের, জেমস। কয়েক বছর পরেই পীত জ্বরে প্রায় একই সঙ্গে মারা গেল জেমসের বাবা-মা, এতিম ছেলেটাকে নিয়ে এল মিশনারি। বড় হতে লাগল ছেলে, বড় হয়ে বাবার মতই ডাক্তার হলো সে-ও। চীনেই থেকে গেল। বিয়ে করল এক ইংরেজ মিশনারির মেয়েকে। তাদেরই ছেলে মিঙ। মিঙের যখন কয়েক বছর বয়েস, পীত নদীতে নৌকাডুবিতে মারা গেল তার বাবা-মা। এতিম শিশুর দায়িত্ব নিতে হলো আবার মিশনারির।

এ-পর্যন্ত বলে থামল মিঙ। দীর্ঘশ্বাস চাপল।

চুপ করে রইল রবিন আর মুসা।

সামলে নিয়ে আবার কথা শুরু করল মিঙ, 'নৌকায় আমিও ছিলাম। কিন্তু বেঁচে গেলাম, বাঁচাল জেলেরা। ওরাই পৌঁছে দিয়েছে মিশনারিতে। আমার দাদা আর বাবা যেখানে বড় হয়েছে, সেখানে নয়, অন্য এক মিশনারিতে কয়েক বছর গেল। আমি কে, বাড়ি কোথায় কিছুই জানি না তখন। জানার জন্যে পাগল হয়ে উঠলাম।

শেষে মিশনারি স্কুলের একজন শিক্ষককে বললাম। আমার বাবা আর মায়ের ডাকনাম শুধু জানি, 'আর জানি আমার বাবা ডাক্তার ছিল। আর দুজনেই যে মিশনারির লোক ছিল, একথা জেলেরাই জানিয়ে গেছে, আমাকে দিয়ে যাওয়ার সময়। পুরানো রেকর্ড ঘেঁটে অনেক কষ্টে আমার পরিচয় বের করলেন স্যার। কিভাবে কিভাবে খোঁজ করে দাদীমার নাম-ঠিকানা জোগাড় করলেন তিনি, চিঠি পাঠালেন তাঁর কাছে।

'দাদীমাই আমাকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছে। তারপর তার সঙ্গেই আছি। আমাকে খুব ভালবাসে। এতদিন ভালই ছিলাম আমরা, হঠাৎ করে আমার দাদার বাবার ভূত এসে গোলমাল করে দিয়েছে সব। খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে দাদীমা। ডলফ-আংকেল অবশ্য তাকে শান্ত করার যথেষ্ট চেষ্টা করছে। আমিও দাদীমাকে সাহায্য করতে চাই, তার ভাল চাই।'

'ভূতের ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়?' প্রশ্ন করল রবিন।

'বুঝতে পারছি না।'

এরপর আর বিশেষ কোন কথা হলো না। উত্তেজনায় ভরা দিন গেছে। ঢুলুঢুলু হয়ে এসেছে মুসার চোখ, রবিনও হাই তুলছে। নরম গদিতে আরামে হেলান দিয়ে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল রবিন। উঁচু পাহাড়ের ওপাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। পাথর আর কাঠে তৈরি বিশাল এক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। দু'পাশে পাহাড়। ছোট্ট একটা উপত্যকায় বাড়িটা। আশপাশে তাকিয়ে দেখল সে। ইতিমধ্যেই পাহাড়ের গোড়ায় অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মাইলের পর মাইল বিছিয়ে থাকা খেত, কালো ছোট ছোট ঝোপ, নিশ্চয় আঙুর লতার ঝাড়।

'মুসা, ওঠো,' ধাক্কা দিল রবিন।

চোখ মেলল মুসা। মুখের কাছে হাত নিয়ে এসে হাই তুলল বড় করে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

মেহমানদের পথ দেখাল মিঙ। চওড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বাড়ির এক পাশের ছোট্ট আঙিনায়।

'এটাই দাদীমার বাড়ি,' বলল মিঙ। 'চলো, আগে তার সঙ্গে দেখা করি।'

রেডউডের প্যানেল করা বিরাট এক হলরুমে এসে ঢুকল ওরা। লম্বা, সম্ভ্রান্ত চেহারার এক মহিলা এগিয়ে এলেন হাসিমুখে, স্বাগত জানালেন ছেলেদের।

'কোন অসুবিধে হয়নি তো?' জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। 'তোমরা এসেছ, খুব খুশি হয়েছি।'

কোন রকম অসুবিধে হয়নি, জানাল রবিন আর মুসা।

তাদেরকে ডাইনিং রুমে নিয়ে চললেন মহিলা।

'জানি, খিদে পেয়েছে তোমাদের,' বললেন দিনারা কৌন, 'বসো, চেয়ারে বসো। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। তাছাড়া সারাদিন খুব কাজের চাপ গেছে। কাল তোমাদের সঙ্গে কথা বলব, হ্যাঁ?' ব্রোঞ্জের ছোট একটা ঘণ্টা বাজালেন তিনি।

মাঝবয়েসী এক চীনা পরিচারিকা এসে ঢুকল।
'ছেলেদের খাবার দাও, সুই,' নির্দেশ দিলেন মিস কৌন। 'মিঙ, তোরও নিশ্চয় খিদে পেয়েছে?'
মিঙ জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল সুই, 'জিজ্ঞেস করার দরকার কি? ওই বয়েসে ছেলেদের খিদে পাবেই। এটাই তো খাওয়ার বয়েস।' তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল পরিচারিকা।
উল্টো দিকের একটা দরজা দিয়ে একজন লোক ঢুকল ঘরে। দেখামাত্র চিনল দুই গোয়েন্দা। ডলফ টার্নার। উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাকে।
'এই যে ছেলেরা, এসে গেছ,' হালকা, মিষ্টি গলায় বলল টার্নার। 'কাল কল্পনাও করিনি, আজই তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে। তো আছ কেমন? ভাল?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'কি যে কাণ্ড শুরু হয়েছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউই পারছে না।'
'তোমরা বসো,' রবিন আর মুসাকে বলল মিস কৌন। 'আমি গিয়ে শুয়ে পড়িগে। তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না। মিঙ আছে, সব দেখবে। ডলফ, খুব খারাপ লাগছে। সিঁড়ি বেয়ে যেন উঠতে পারব না, একটু ধরবে আমাকে?'
'নিশ্চয়ই,' দ্রুত এসে মিস কৌনের বাহু ধরল টার্নার। সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল মহিলাকে।
হঠাৎ করেই অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। সুইচ টিপে আলো জ্বালল মিঙ। 'পাহাড়ী এলাকা, হঠাৎ করেই রাত নামে।'
টেবিলে খাবার সাজাল সুই।
'শুরু করো,' বলল মিঙ।
'হ্যাঁ, শুরু করো,' সুই বলল। 'খাওয়ার সময় কথা বেশি বলবে না। পেট পুরে খাও। কোন রকম লজ্জা কোরো না।'
'খাওয়ার ব্যাপারে আমার কোন লজ্জা নেই,' হাত নাড়ল মুসা। প্লেনে কি খেয়েছে না খেয়েছে কখন হজম হয়ে গেছে তার। হাবভাবে মনে হচ্ছে, গত তিন দিন কিছু খায়নি।
জহুরী জহর চেনে। ভোজন রসিককে চিনে নিল অভিজ্ঞ পরিচারিকা। খাবার সরবরাহ করতে লাগল সেভাবেই।
গরুর মাংসের ঠাণ্ডা রোস্ট, গরম রুটি, নানারকম আচার, আলুর সালাদ, আর আরও কয়েক রকম ঠাণ্ডা খাবার, চেহারা আর গন্ধে রবিনের খিদেও বেড়ে গেল।
খাওয়া শুরু করতে যাচ্ছে, এই সময় বাধা পড়ল।
দোতলা থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।
'দাদীমা!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মিঙ। 'নিশ্চয় কিছু হয়েছে।'
পড়িমড়ি করে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল সে। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা। তাদের পেছনে সুই, আর আরও কয়েকজন চাকর—চোখের পলকে কোথা থেকে জানি উদয় হয়েছে ওরা।
ওপরে সিঁড়ির পাশে আরেকটা হল, শেষ মাথায় একটা দরজা খোলা।

সেদিকেই দৌড় দিল মিঙ।

বিছানায় চিত হয়ে পড়ে আছেন মিস কৌন। তার ওপর ঝুঁকে আছে টার্নার। হাতের তালু ডলছে, আর উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছে কিছু। সুইকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'স্মেলিং সল্ট! জলদি।'

ছুটে গিয়ে বেডরুম সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকল সুই, বেরিয়ে এল একটা শিশি হাতে। মুখ খুলে ধরল মিস কৌনের নাকের কাছে।

একটু পড়েই নড়েচড়ে উঠলেন মিস কৌন, আস্তে করে চোখ মেললেন। ভিড় দেখে লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'ছেলেমানুষী করে ফেলেছি, না? জীবনে এই প্রথমবার বেহুঁশ হলাম।'

'কি হয়েছিল দাদীমা?' ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে মিঙ। 'চিৎকার করলে কেন?'

'ভূতটাকে আবার দেখেছি,' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন মহিলা। 'ডলফকে গুড নাইট জানিয়ে বেডরুমে ঢুকলাম। আলো জ্বালতে যাব, এই সময় দেখলাম ওটাকে।'

'কোথায়?'

'ওই জানালাটার ধারে। স্পষ্ট। কড়া চোখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। পরনে সবুজ আলখেল্লা, ঠিক যেমনটি পরত ফারকোপার চাচা। চেহারাটা স্পষ্ট নয়, তবে চোখগুলো পরিষ্কার, লাল টকটকে।' গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আমার উপর রেগে আছে। থাকবে, জানতাম। মা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল তার মৃত্যুর পর বন্ধ রাখবে কৌন ম্যানশন, কখনও খুলবে না। কখনও ওখানকার শান্তি নষ্ট করবে না। অথচ আমি কি করেছি? মায়ের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করেছি, বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয়েছি। তার স্ত্রীর শান্তি নষ্ট করেছি, ফারকোপার চাচা রাগ তো করবেই আমার ওপর।'

ছয়

দিনারা কৌনকে শান্ত করে আবার এসে খাবার টেবিলে বসল রবিন, মুসা আর মিঙ। খাওয়া চলল উত্তেজিত কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে।

কমলার রস খাইয়ে মিস কৌনকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে সুই। মনিবানীর কাছেই রয়েছে। যে হারে ধমক-ধামক মেরেছে চাকর-বাকরকে, তাতে স্পষ্ট বুঝে গেছে দুই গোয়েন্দা, এ-বাড়িতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ওই চীনা মহিলার।

ওপর তলা থেকে নেমে এল টার্নার, গম্ভীর।

'ভূতটা আপনি দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা নাড়ল টার্নার, 'আন্টিকে ঘরের দরজায় পৌঁছে দিয়ে ফিরেছি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন। লাফ দিয়ে গিয়ে ঢুকলাম। সুইচে হাত রেখে টিপছেন, এই সময় দেখেছেন ভূতটাকে। আমি ঢুকতেই আলো জ্বলে উঠল, ঢলে পড়তে শুরু করলেন তিনি। ধরলাম তাকে, বিছানায় শোয়ালাম। এত তাড়াহুড়োর মাঝে ভূত দেখার সময় কোথায়?' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপাল ডলল সে।

'চাকর-বাকরের মুখ বন্ধ রাখা যাবে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল আবার টার্নার।

'ঠেকানো যাবে না কিছুতেই। কাল সকাল হতে না হতেই সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে গুজব।'

'খবরের কাগজকে নিয়ে ভাবনা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'খবরের কাগজওলারা যা ক্ষতি করার করে ফেলেছে। আমি আমাদের শ্রমিকদের কথা ভাবছি। গতরাতেও যে আন্টি ভূত দেখেছেন, ফোনে বলেছেন তোমাদেরকে?'

মাথা ঝোঁকাল মুসা আর রবিন।

'এ-বাড়ির দু'জন চাকরানীও দেখেছে,' বলল টার্নার। 'ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল। অনেক বলেকয়ে বুঝিয়েছি ওদের, খবরটা গোপন রাখতে। বিশেষ কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। সারাদিনে ছড়িয়ে পড়েছে গুজব, রকি বীচের ভূত এসে ঠাঁই নিয়েছে ভারড্যান্ট ভ্যালিতে। ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুষো করছে শ্রমিকরা।'

'শ্রমিকরা ভয় পাবে ভাবছেন?' বলল মিঙ।

'পাবে মানে? সর্বনাশ হয়ে যাবে!' উত্তেজনা দমন করল টার্নার। প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'যাকগে, মেহমানদের অস্থির করে দেয়াটা উচিত হচ্ছে না।' রবিন আর মুসাকে বলল, 'তোমরা এসব নিয়ে কিচ্ছু ভেব না। তো, গোস্ট পার্লের ব্যাপারে আগ্রহ আছে? গতকাল তো ভালমত দেখোনি, আজ দেখতে চাও?'

একই সঙ্গে মাথা কাত করল মুসা আর রবিন।

খাওয়ার পর দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল টার্নার। ডাইনিং রুমের লাগোয়া মাঝারি একটা হল পেরিয়ে ছোট একটা অফিসঘরে ওদেরকে নিয়ে এল সে। চকচকে পালিশ করা বড় একটা টেবিল, টেলিফোন, কয়েকটা ফাইলিং কেবিনেট, আর ঘরের কোণে পুরানো একটা আয়রন সেফ রয়েছে।

ঝুঁকে বসে সেফের ডায়াল ঘোরাতে শুরু করল টার্নার। ক্লিক শব্দ করে খুলে গেল তালা। কার্ডবোর্ডের ছোট একটা বাক্স হাতে ফিরে এল আবার ছেলেদের কাছে। টেবিলে বাক্সটা রেখে ডালা খুলল। নেকলেসটা বের করে রাখল একটা সবুজ ব্লটিং পেপারের ওপর।

ঝুঁকে এল মুসা আর রবিন, তাদের পাশে মিঙ। বড় বড় মুক্তো, একেকটার আকার একেক রকম, ধূসর রঙ। কেমন জানি মুক্তোগুলো। রবিনের মায়ের একটা মুক্তোর হার আছে, মুক্তোগুলোর কিছু লাল, কিছু শাদা, চকচকে, মসৃণ, কিন্তু এই মুক্তোগুলো ওরকম নয়। আঙুল বুলিয়ে দেখল, কেমন খসখসে।

'এমন মুক্তো আর দেখিনি,' বলল মুসা।

'এজন্যেই এগুলোর নাম রাখা হয়েছে গোস্ট পার্ল,' বলল টার্নার। 'এগুলো তোলা হয়েছিল ভারত মহাসাগরের একটা ছোট উপসাগর থেকে। প্রাচ্যের ধনীরা এগুলোর খুব দাম দেয়, কিন্তু আমি বুঝি না কেন। যেমন বাজে চেহারা, তেমনি রঙ। এখনও নেকলেসটার দাম দশ-পনেরো লাখ ডলারের কম না।'

'আরিব্বাবা, তাই নাকি?' ভুরু কুঁচকে গেল মিঙের। 'তাহলে তো সমস্যা মিটে গেল। এটা বিক্রি করেই সমস্ত ঋণ শোধ করতে পারবে দাদীমা, বেঁচে যাবে আঙুরের খেত। নেকলেসটা নিশ্চয় দাদীমা পাবে?'

'কিছু অসুবিধে আছে,' মাথা নেড়ে বলল টার্নার। 'ফারকোপার কৌন নেকলেসটা তার চীনা স্ত্রীকে দান করে দিয়েছিলেন। আইনত এখন ওটা মহিলার কোন নিকট আত্মীয়ের পাওনা।'

কিন্তু তাঁর পরিবার তাঁকে ত্যাগ করেছে,' অবাক হয়ে বলল মিঙ। 'তাছাড়া চীনের বিপ্লব আর যুদ্ধের সময় তাঁর পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেউ বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ।'

'আছে,' ভুরুর ওপরে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল টার্নার। স্যান ফ্রানসিসকোতে এক চীনা উকিল আছে, সে চিঠি দিয়েছে আমাকে। চীনা মহিলার বোনের ঐক বংশধর নাকি বেঁচে আছে। নেকলেসটা সাবধানে রাখতে বলেছে, যে কোন সময় ওটা নিতে আসতে পারে। তবে এত সহজে দিচ্ছি না। কেস করবে, করুক। কে পাবে ওটা, সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে রায় দিতে দিতে কয়েক বছর লেগে যাবে আদালতের।'

কপাল কুঁচকে গেল মিঙের। মুখ খুলতে গিয়েও পায়ের শব্দ শুনে থেমে গেল। তাড়াহুড়ো করে কে জানি আসছে। দরজায় জোরে ধাক্কা দিল কেউ।

'কে? এসো,' ডাকল টার্নার।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লম্বা চওড়া, মাঝবয়েসী, কালো এক লোক। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ছেলেদের যেন দেখতেই পেল না, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মিস্টার টার্নার, এক নম্বর প্রেসিং হাউসের কাছে ভূত দেখা গেছে। তিনজন মেকসিকান শ্রমিক দেখেছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ওরা। আপনার যাওয়া দরকার।'

'সর্বনাশ!' গুঙিয়ে উঠল টার্নার। 'এখুনি যাচ্ছি, চলো।' তাড়াতাড়ি নেকলেসটা সেফে ভরে দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর তিন কিশোরকে নিয়ে কাল লোকটার পেছনে পেছনে ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। জীপ অপেক্ষা করছে। চড়ে বসল তাতে। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। দু'পাশের হাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে অন্ধকার উপত্যকা ধরে ছুটে চলল গাড়ি।

পথ খুব খারাপ, উঁচুনিচু, এবড়োখেবড়ো, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ, তাই রক্ষা। নিচু একটা পাকা বাড়ির সামনে এসে থেমে গেল জীপ। কংক্রিট আর ইঁটের তৈরি মজবুত দেয়াল, হেডলাইটের আলোয় দেখল দুই গোয়েন্দা। বাড়িটা নতুন।

লাফিয়ে জীপ থেকে নামল সবাই। আঙুরের রসের তীব্র সুবাসে বাতাস ভারি, সদ্য পিষে বের করা হয়েছে রস।

'ও মিস্টার মরিসন,' কালো লোকটার পরিচয় দিল মিঙ, 'ফোরম্যান। খেত লাগানো আর আঙুর তোলার দায়িত্ব তার।'

বাড়ির অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে এল এক তরুণ, পরনের কাপড়ে বালি আর ময়লা।

হেডলাইট নিভিয়ে দিল মরিসন। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাক, আমি যাওয়ার পর আর কিছু দেখা গেছে?'

'না, স্যার, আর কিছু দেখা যায়নি,' জবাব দিল জ্যাক।

'ওই তিন ব্যাটা কোথায়?'

'কি জানি। আপনি যাওয়ার পরই ভেগেছে। দৌড়ে,' হেসে উঠল জ্যাক, 'সে কি দৌড়। বোধহয় কাফেতে গিয়ে ঢুকেছে,' হাত তুলে উপত্যকার শেষ প্রান্তে এক গুচ্ছ আলো দেখল সে। 'ভূত দেখার গল্প বলছে সবাইকে।'

'মেরেছে!' মরিসনের কণ্ঠে শংকা। 'যেতে দিলে কেন?'

'ঠেকানোর চেষ্টা করেছি। রাখতে পারিনি। এমনই ভয় পেয়েছে।'

'হুঁ, আগুনে কেরোসিন পড়ল!' তিক্ত হয়ে উঠেছে মরিসনের কণ্ঠস্বর। 'ব্যাটারা এখানে অন্ধকারে কি করছিল?'

'আমিই আসতে বলছিলাম, এখানে দেখা করতে বলেছিলাম আমার সঙ্গে। ভূতের কিচ্ছা ওরাই ছড়াচ্ছিল, তাই ধমকে দিতে চেয়েছিলাম, বেশি শয়তানী করলে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেব। আমার আসতে দেরি হয়ে গেল, ওরা অপেক্ষা করেছিল এখানে অন্ধকারে। তখনই নাকি কি একটা দেখেছে, আমার বিশ্বাস হয় না।'

'আমারও না। কল্পনা, স্রেফ কল্পনা। ভূত নিয়ে এত বেশি আলাপ আলোচনা করেছে, ছায়া দেখলেই ভূত ভাবে এখন।'

'কল্পনাই হোক আর যাই হোক, ক্ষতি যা করার করে ফেলেছে,' এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনছিল টার্নার। 'যাও, গাঁয়ে গিয়ে দেখো, বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করতে পার কিনা শ্রমিকদের। মনে হয় না খুব একটা লাভ হবে।'

'হবে না। বাড়ি দিয়ে আসব আপনাকে?' বলল মরিসন।

'হ্যাঁ...হায় হায়,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে কপালে চাপড় মারল টার্নার। 'মিঙ! নেকলেস রেখে সেফে তালা লাগিয়েছিলাম? মনে আছে?'

'কি জানি, খেয়াল করিনি,' বলল মিঙ।

'আমার মনে হয়,' স্মৃতির আনাচে-কানাচে হাতড়ে বেড়াল মুসা, 'আমার মনে হয়...হ্যাঁ, নেকলেসটা রেখে জোরে দরজা বন্ধ করেছিলেন, হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু ডায়াল ঘুরিয়েছিলাম?'

ভাবল মুসা। মনে করতে পারছে না। 'না, বোধহয়। দরজা লাগিয়েই তো ছুটলেন...'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেছে টার্নারের কণ্ঠ। 'শ্রমিকেরা ভূত দেখেছে শুনে এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, তালা লাগানোর কথাও মনে হয়নি। মরিসন, জলদি, জলদি বাড়ি নিয়ে চলো আমাকে। ছেলেরা থাক এখানেই। ফিরে এসে নিয়ে যেয়ো।'

'ঠিক আছে। মিঙ, এই যে, আর টর্চটা রাখো,' শক্তিশালী একটা টর্চ মিঙের হাতে গুঁজে দিয়ে জীপে গিয়ে উঠল মরিসন। টার্নার আগেই উঠে বসেছে। স্টার্ট নিয়ে চলে গেল জীপ। জ্যাক চলে গেল গ্রামের দিকে।

'কি কাণ্ড!' ইঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে বলল রবিন। 'প্রথমে বাড়িতে ভূত, তারপর এখানে। কিন্তু মিঙ, ভূত দেখা নিয়ে সবাই এত উতলা হয়ে উঠেছে কেন?'

নীরব অন্ধকারে নিজেদের অজান্তেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এসেছে তিন কিশোর।

পরিবেশ আরও ভয়াবহ করে তুলেছে পোকামাকড়ের একটানা কর্কশ চিৎকার।

'এখন আঙুর তোলার পুরো মৌসুম,' মিঙ বলল। 'রোজই আঙুর পাকছে, তুলে এনে প্রেসিং মেশিনে ফেলছে শ্রমিকরা। রস বের করে রাখা হচ্ছে। ঠিক সময়ে তোলা না হলে বেশি পেকে যাবে, কিংবা পচে যাবে, ভাল মদ আর তৈরি হবে না ওগুলো দিয়ে।' থেমে অন্ধকারেই এদিক ওদিক তাকাল। 'আঙুর তুলতে অনেক লোকের দরকার, কিন্তু সারা বছর এই কাজ হয় না। তাই মৌসুমের সময়ই শুধু আসে শ্রমিকেরা, তারপর চলে যায় অন্য কোথাও। অনেক দেশের লোক আছে। মেকসিকান আর এশিয়ানই বেশি, আমেরিকানও আছে কিছু। দরিদ্র লোক ওরা, কর্মঠ, কুসংস্কারে বোঝাই ওদের মন,' বলে গেল মিঙ। 'রকি বীচে ভূত দেখা যাওয়ার খবর শুনেই শ্রমিকেরা বিচলিত হয়ে উঠেছিল। এখানেও দেখা গেছে শুনলে আর থাকবে না, কোন কিছুর বিনিময়েই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, পালাবে। খেতে আঙুর পচে নষ্ট হবে, তুলে না আনা গেলে রসও হবে না, যাবে এ বছরের ফসল। অনেক টাকা গচ্চা দিতে হবে দাদীমাকে। এমনিতেই সময় এখন ভাল যাচ্ছে না তার, অনেক টাকা ঋণ, তার ওপর ফসল নষ্ট হলে···সে-জন্যেই এত ভেঙে পড়েছে দাদীমা।'

'হুঁ, মুশকিল,' সহানুভূতির স্বরে বলল মুসা। 'সব দোষ তোমার দাদার বাবার। ওর ভূত বাইরে বেরোনোই তো যত গণ্ডগোল।'

'না,' জোর দিয়ে বলল মিঙ, 'আমি বিশ্বাস করি না। দাদার বাবা আমাদের ক্ষতি করতে পারে না, হাজার হোক তার রক্ত আমরা। ওটা অন্য কোন শয়তান লোকের ভূত।

এত প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটা বলল মিঙ, রবিনের ইচ্ছে হলো বিশ্বাস করে ফেলে। কিন্তু কৌন ম্যানশনে ভূতটাকে দেখেছে সে, দেখেছে ঢোলা সবুজ আলখেল্লা। যদি ওটা ভূত হয়, বুড়ো ফারকোপার ছাড়া আর কারও না।

এক মুহূর্ত নীরব রইল তিনজনেই। কি বলবে ভাবছে। অবশেষে বলল রবিন, 'দেখতে পারলে শিওর হতাম রকি বীচ আর এখানকারটা একই ভূত কিনা।'

'শিওর হলে কি হবে? ভূত ভূতই, তা যার ভূতই হোক,' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'ইস, কিশোরটা যদি থাকত এখন।'

'এই ভূতটা এখনও কারও কোন ক্ষতি করেনি,' বলল মিঙ। 'শুধু দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। ভয়ের কিছু নেই। আর যদি দাদার বাবার ভূত হয়ই, তাহলে তো আরও ভয় নেই, আমাদের ক্ষতি করতেই পারে না। রবিন, চলো না এক নম্বর প্রেসিং হাউসে দেখি, এখনও আছে কিনা।'

রবিন আর মুসাকে নিয়ে বিল্ডিংটার চারপাশে একবার চক্কর দিল মিঙ। জায়গাটা তার ভালমত চেনা, টর্চ জ্বালার প্রয়োজনই বোধ করল না। আলো জ্বালল না আরও একটা কারণে, অন্ধকারে ছাড়া দেখা দেয় না ভূতটা।

চেয়ে চেয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল ওরা, কিন্তু ভূতের দেখা নেই, শুধু অন্ধকারে বাড়িটার কালো ছায়া, বিরাট আরেকটা ভূতই যেন। হাঁটতে হাঁটতেই মিঙ জানাল, আঙুর এনে এখানে বড় বড় ট্যাংকে রাখা হয়। মেশিনের সাহায্যে

চিপে রস বের করা হয়, সেই রস গড়িয়ে গিয়ে জমা হয় অন্য ট্যাংকে। সেখান থেকে পাম্পের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হয় মদ চোলাইয়ের কারখানায়। সে এক এলাহি কাণ্ড। পাহাড়ের বিরাট গুহার ভেতরে ছোট পুকুর কাটা হয়েছে, তাতে জমা হয় আঙুরের রস, বিশেষ পদ্ধতিতে মদ তৈরি হতে থাকে। সারা বছরই উত্তাপ আর আর্দ্রতা এক রকম থাকে গুহার ভেতরে, মদ বানানোর জন্যে এটা খুব দরকার।'

মিঙের কথায় বিশেষ মন নেই রবিনের। সে ভূতটাকে খুঁজছে।

'চলো ভেতরে যাই,' বলল মিঙ। 'মেশিন আর ট্যাংকগুলো দেখাব। একেবারে নতুন, মাত্র গত বছর কেনা হয়েছে। কিনে এনেছে ডলফ-আংকেল। বাকিতে। অনেক টাকা। কি করে শোধ করবে ভাবছে দাদীমা। তার ধারণা, এত টাকা কোনদিনই শোধ করতে পারবে না।'

হেডলাইটের আলো দেখা গেল। খানিক পরেই ছেলেদের পাশে এসে থামল জীপ।

'এসো, ওঠো,' ডাকল মরিসন, 'বাড়িতে দিয়ে আসি। কাজ আছে আমার। গাঁয়ে গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে তিন হারামজাদাকে। শ্রমিকদেরও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করা দরকার।'

'হ্যাঁ, খুব জরুরী কাজ,' বলল মিঙ। 'আপনি চলে যান না। মাত্র তো মাইলখানেক, আমরা হেঁটেই চলে যেতে পারব। এই যে, আপনার টর্চ। চাঁদ উঠেছে, অসুবিধে হবে না আমাদের।'

'ঠিক আছে,' মাথা কাত করল মরিসন। 'এতক্ষণে ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের ভাগিয়ে দিয়েছে কিনা হারামজাদারা, কে জানে।'

ইঞ্জিনের গর্জন তুলে পাহাড়ী পথ ধরে উপত্যকার শেষ প্রান্তের আলোকগুচ্ছের দিকে চলে গেল ট্রাক।

'ইস্সি, চলে যেতে যে বললাম,' বলল মিঙ, 'তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না তো?'

'না না, অসুবিধে কিসের,' তাড়াতাড়ি বলল রবিন, 'হাঁটতে বরং ভালই লাগবে। দেখতে দেখতে যাব।'

ধুলো আর পাথরের কুচিতে ভরা আঁকাবাঁকা পথ, জ্যোৎস্নার আলোয় ধূসর। বাতাসে পাকা আঙুরের গন্ধ।

চলতে চলতে বলল মিঙ, 'ব্যবসায় লাল বাতি জ্বালিয়ে ছাড়বে ওই ভূত। শ্রমিকদের ঠেকানো যাবে না, চলে যাবেই। অনেক টাকা গচ্চা দিতে হবে দাদীমাকে, মেশিনের টাকা শোধ করতে পারবে না। খেত খামার সব তার কাছ থেকে নিলাম করে নেবে ব্যাংক।' একটু চুপ থেকে বলল, 'একটাই উপায় আছে এখন। মুক্তোর মালাটা। ওটা যদি পাওয়া যেত, বিক্রি করে ঋণ শোধ করে দেয়া যেত।'

কেউ কোন জবাব দিল না। কি বলবে? নেকলেস কে পাবে, সেটা কৌন পরিবারের ব্যক্তিগত সমস্যা, আদালত নিষ্পত্তি করবে, এ-ব্যাপারে রবিন আর মুসা কি সাহায্য করতে পারবে?

এরপর আর কোন কথা হলো না। তিনজনেই চিন্তিত, চুপচাপ হাঁটতে থাকল। বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ আলোই নিভানো, কয়েকটা শুধু জ্বলছে। আশপাশটা বড় বেশি শান্ত।

সিঁড়ি বেয়ে আঙিনায় উঠল ওরা। কারও সাড়া না পেয়ে অবাক হলো মিণ্ড। বিড়বিড় করল, 'গেল কোথায় সব? চাকরবাকরেরা না হয় ঘুমাতে গেছে, কিন্তু ডলফআংকেল? তার তো এ-সময়ে হলে থাকার কথা। অফিসে?'

অফিসরুমে রওনা হলো মিণ্ড, পেছনে দুই গোয়েন্দা। দরজা ভেজানো। টোকা দিল মিণ্ড। জবাবে গোঙানি শোনা গেল, আর ঘষার আওয়াজ।

সতর্ক হয়ে উঠল মিণ্ড, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা। মেঝেতে পড়ে আছে টার্নার, হাত পা বাঁধা। বাদামী একটা কাগজের ঠোঙা মাথার উপর দিয়ে টেনে এনে মুখ ঢেকে দেয়া হয়েছে।

'আংকেল!' চেঁচিয়ে উঠে ছুটে গেল মিণ্ড।

মাথার ঢাকনাটা খুলতে শুরু করল আগে সে, রবিন আর মুসা তাকে সাহায্য করল। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন টার্নারের। কথা বলতে পারছে না, মুখে কাপড় বাঁধা।

'দাঁড়ান, আগে বাঁধন কেটে নিই,' হাত তুলল মিণ্ড, 'তারপর সব শুনব।'

পকেট নাইফ বের করে আগে মুখের কাপড় কাটল সে, তারপর হাত পায়ের বাঁধন খুলতে শুরু করল। জোরে জোরে দম নিচ্ছে টার্নার। বাঁধন কাটা হতেই কব্জি আর গোড়ালি ডলতে শুরু করল।

'কি হয়েছিল?' জানতে চাইল মুসা।

'বাড়িতে ফিরে অফিসে ঢুকলাম। দরজার আড়ালে লুকিয়েছিল ব্যাটা। পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল, কোথা থেকে আরেকটা এসে হাজির হলো। দু'জনে মিলে আমাকে মেঝেতে ফেলে বেঁধে ফেলল। তারপর ঠোঙাটা টেনে দিল মাথায়। সেফের দরজা খোলার শব্দ···সেফ!' লাফ দিয়ে আয়রন সেফটার দিকে ছুটে গেল সে।

ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে আছে পাল্লা। ঝটকা দিয়ে একটানে খুলে ফেলল পুরোটা। খোঁজাখুঁজি করল। ঘুরল ধীরে ধীরে। মুখ ফেকাসে।

'নেকলেসটা,' ফিসফিস করে বলল সে, 'নেই!'

সাত

বসার ঘরে চুপচাপ বসে আছে কিশোর, একা। চাচা-চাচী বাড়ি নেই। গভীর ভাবনায় ডুবে আছে সে, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। হঠাৎ সোজা হলো, ঠোঁটের কাছ থেকে সরে এল হাত। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, যত জোরে পারে। অপেক্ষা করতে লাগল।

বারান্দায় পায়ের আওয়াজ হলো। খানিক পরেই দরজায় উঁকি দিল বোরিস, বিশালদেহী দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, ইয়ার্ডের কর্মচারী। তার ভাই রোভার গেছে মেরিচাচী আর রাশেদ চাচার সঙ্গে, স্যান ডিয়েগোতে।

'কি হয়েছে, কিশোর?' বোরিস উদ্বিগ্ন।
'শোনা গেছে তাহলে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।
'যাবে না? বাড়ি ফাটিয়ে ফেলেছ। তোমার জানালা খোলা, আমার জানালা খোলা। কি ব্যাপার, বাড়িটাড়ি মেরেছে?' কিশোরের মাথা আর কাঁধে চোখ বোলাচ্ছে বোরিস।
ফিরে তার ঘরের জানালার দিকে তাকাল কিশোর, খোলা। চোখে ক্ষোভ জমল।
'কি ব্যাপার?' আবার জানতে চাইল বোরিস। 'কিছু হয়েছে বলে তো মনে হয় না।'
'হয়নি, শুধু জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি।'
'তাহলে চেঁচালে কেন?'
'চিৎকার প্র্যাকটিস করছিলাম।'
'কিশোর, তুমি ঠিক আছ?' ভুরু কোঁচকাল বোরিস। 'অসুস্থ নও তো? হোকে (ও কে)?'
'ইয়েস, হোকে,' হাসল কিশোর। 'আপনি যান, ঘুমোনগে। আজ রাতে আর চেঁচাব না।'
'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে,' সন্দেহ যাচ্ছে না বোরিসের। কিন্তু আর কিছু বললও না, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল তার ঘরে। দু'ভাই একই ঘরে থাকে, মূল বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ছোট্ট একটা কটেজে।
যেখানে ছিল সেখানেই বসে রইল কিশোর। মগজে চিন্তার ঘূর্ণিপাক। কি যেন একটা আসি আসি করছে মনে, কিন্তু আসছে না, সবুজ ভূতের ব্যাপারে। ক্ষান্ত দিয়ে শেষে উঠে পড়ল। শোয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।
দোতলায় যাওয়ার জন্যে উঠল। আচ্ছা, রবিন আর মুসা কি করছে?—ভাবল সে। যেন তার প্রশ্নের জবাব দিয়েই বেজে উঠল টেলিফোন। দুই লাফে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল সে। 'কি ব্যাপার রবিন? ভূতটা আবার দেখেছ?'
'না, মিস কৌন দেখেছেন,' উত্তেজিত শোনাল রবিনের কণ্ঠ। 'তারপর যা সব কাণ্ড ঘটল না...'
'বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ,' বাধা দিল কিশোর। 'শান্ত হয়ে বলো সব। কিচ্ছু বাদ দেবে না। যখন যেভাবে ঘটেছে, বিস্তারিত বলো।'
এ-মুহূর্তে কাজটা রবিনের জন্যে বেশ কঠিন। নেকলেস চুরির কথা বলার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু ওভাবে শুনতে চায় না কিশোর, জোর করে নিজেকে শান্ত করল রবিন। এক এক করে বলে গেল, সে আর মুসা ভারড্যান্ট ভ্যালিতে যাওয়ার পর কি কি ঘটেছে। সব শেষে নেকলেস চুরির ঘটনা বলে হাঁপ ছাড়ল।
'হুঁমম,' বলল কিশোর। জোরে জোরে দম নিচ্ছে রবিন, শুনতে পাচ্ছে টেলিফোনেই। 'এটা আশা করিনি। তো, এখন কি হচ্ছে? তদন্তের আয়োজন চলছে?'
'স্থানীয় শেরিফকে ডেকে এনেছে টার্নার, শেরিফ হামফ্রে। তিন কাল শেষ, এক

কালে ঠেকেছে বয়েস, কাজকর্ম কিছু বোঝেটোঝে মনে হয় না। শহর থেকে অনেক দূরে ভারড্যান্ট ভ্যালি, কাছাকাছি থানা নেই, পুলিশ নেই, শেরিফ আর তার সহকারীই ভরসা। সহকারীটাও বসেরই মত, গাল দেয়া ছাড়া আর কিছু জানে না।

'শেরিফের ধারণা, কাগজে নেকলেসটার খবর পড়ে শহর থেকে চোর এসে চুরি করে নিয়ে গেছে। ওরা যখন সেফ খুলছিল, টার্নার তখন ঘরে ঢুকেছে। তাকে বেঁধে হারটা নিয়ে পালিয়েছে চোর আর তার সহকারী। শেরিফ বলছে, ইতিমধ্যে অর্ধেক পথ চলে গেছে চোরেরা। স্যান ফ্রান্সিসকোর পুলিশকে ফোন করবে, কিন্তু ভাবছে কোন লাভ হবে না।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। একেবারে অযৌক্তিক কথা বলেনি শেরিফ। কিন্তু কিশোর বিশ্বাস করতে পারছে না। সবুজ ভূতের সঙ্গে এই হার চুরির কোন সম্পর্ক নেই তো?

'তুমি আর মুসা চোখ খোলা রেখো,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'আমি ওখানে থাকতে পারলে ভাল হত। কিন্তু যেতে পারছি না। চাচা চাচী বাড়ি নেই, আরও একদিন থাকবে স্যান ডিয়েগোতে, রোভারও নেই, বোরিস একা সামলাতে পারবে না। যোগাযোগ রেখো। যখন যা ঘটে, ফোনে জানিও।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

নতুন করে আবার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার লোভ জাগছে, কিন্তু জোর করে দমন করল ইচ্ছেটা। ঘুমাতে চলল।

নানারকম স্বপ্ন দেখল, ঘুমের মধ্যেই একটা কণ্ঠ শুনল চেনা চেনা, কিন্তু চিনতে পারল না।

পরদিন সকালে মনে রইল না, রাতে কি স্বপ্ন দেখেছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মনেপ্রাণে আশা করল কিশোর, যাতে কাজ বেশি না থাকে ইয়ার্ডে, ক্রেতা না আসে, তাহলে হার চুরির ব্যাপারটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারবে।

কিন্তু ঘটল উল্টো। একের পর এক খরিদ্দার আসতেই থাকল, দরকষাকষি করতে লাগল, তর্ক করল, দু'এক জন তো জিনিস আর দর নিয়ে আরেকটু হলে ঝগড়াই বাধিয়ে দিত। হিমশিম খেয়ে গেল কিশোর আর বোরিস, ঘেমে সারা। একটা মিনিট চুপ করে বসতে পারল না কিশোর, ভাববে কখন? পাঁচটার সময় অফিস বন্ধ করে দিল সে। বিক্রি বন্ধ। দম ফেলার অবকাশ পেল এতক্ষণে।

সুযোগ মিলতেই ভাবতে বসে গেল কিশোর। ধীরে ধীরে একটা ধারণা রূপ নিতে শুরু করল মনে।

'বোরিস,' চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর, 'আপনি থাকুন। আমি চললাম।'

কিশোরের স্বভাব বোরিসের জানা। পাল্টা কোন প্রশ্ন করল না। বলল, 'ঠিক আছে, যাও। আমি আছি। কোথায় যাচ্ছ?'

'তদন্ত করতে,' বোরিসকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। দ্রুত চালিয়ে শহরের প্রান্তে ছোট একটা জলাশয়ের ধারে জংলা জায়গায় চলে এল, এখানেই কৌন ম্যানশন। ড্রাইভওয়েতে ঢুকে

দেখল, বাড়ির সামনে পুলিশের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরকে দেখে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করল একজন পুলিশ। আগের দিন সকালে চীফের সঙ্গে যখন এসেছিল তখন এই লোকটাকে এখানে দেখেছিল কিশোর।

'সাইকেল ঘোরাও, খোকা,' বলল লোকটা। 'কৌতূহলী দর্শকদের তাড়ানোর জন্যেই পাহারায় আছি এখানে। উফ্ফ্, সারাটা দিন···আর ভাল্লাগছে না এখন।'

স্ট্যাণ্ডে সাইকেল তুলে পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। 'আরও অনেকে এসেছিল?'

'এসেছে মানে?' মুখ বাঁকাল লোকটা। 'পাগল করে দিয়েছে আমাকে। সুভনির শিকারিদের জ্বালায়···উফ্ফ্, বদ্ধ পাগলের দেশ এটা। বেশি কথা বলতে পারব না, খোকা, চলে যাও।'

'আমি সুভনিরের জন্যে আসিনি,' এগিয়ে এল কিশোর। 'গতকাল দেখেছেন আমাকে, মনে নেই? আপনাদের চীফের সঙ্গে এসেছিলাম।'

ভাল করে তাকাল পুলিশম্যান। 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ···সেজন্যেই চেনা চেনা লাগছিল। তা কি ব্যাপার?'

তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বাড়িয়ে ধরল কিশোর, 'আমি কিশোর পাশা।'

কার্ড পড়ে হাসতে গিয়েও থেমে গেল পুলিশম্যান, কি জানি, চীফের সঙ্গে এসেছিল যখন, ফেলনা না-ও হতে পারে। 'গোয়েন্দা, না? চীফের হয়ে কাজ করছ?'

'তাঁর হয়ে করছি না, তবে আমি যা করব, সফল হতে পারলে খুব খুশি হবেন চীফ। আগেও অনেক কাজ করেছি।' এখন কি করতে চায়, জানাল কিশোর।

মাথা ঝোঁকাল পুলিশম্যান। 'ঠিক আছে। যাও।'

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির বারান্দায় উঠল কিশোর, ভেতরে ঢুকল। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে সব। যেদিক থেকে ভাঙা শুরু হয়েছে, সেখানে এসে দাঁড়াল। পরীক্ষা করে দেখল, দেয়াল খুব পুরু।

আর কোন গোপন কুঠরি খোঁজার চেষ্টা করল না কিশোর, পুলিশই ভালমত খুঁজেছে, অহেতুক সময় নষ্ট করা হবে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে। এক মিনিট অপেক্ষা করে নিচে নেমে বড় হলো রুমটায় ঢুকে আবার চিৎকার করল। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। পুলিশম্যানের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু শুনেছেন?'

'চিৎকার শুনেছি। একবার একেবারে ক্ষীণ, আরেকবার একটু জোরে। দরজা বন্ধ ছিল তো।'

'ভূত যে-রাতে চেঁচিয়েছে, তখনও দরজা বন্ধ ছিল,' বলল কিশোর। এদিক ওদিক তাকাল। বাড়ির এক কোণে একটা বড় সাজান ঝোপ দেখে তার ভেতরে এসে ঢুকল। চেঁচিয়ে উঠল জোরে। বেরিয়ে আবার পুলিশম্যানের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'এবার?'

'অনেক জোরে,' জবাব দিল লোকটা, 'স্পষ্ট। কিন্তু কি প্রমাণের চেষ্টা করছ?'

'কোথা থেকে চেঁচিয়েছিল ভূতটা। নিশ্চয় বাইরে ছিল। বাড়ির ভেতরে থেকে

চেঁচিয়ে থাকলে স্বীকার করতেই হবে, ব্যাটার ফুসফুসের জোর অসাধারণ।'

'ভূতের ফুসফুস আছে কিনা তাই বা কে জানে,' হাসল পুলিশম্যান।

কিন্তু কিশোর হাসল না। 'এটাই পয়েন্ট।'

বুঝতে না পেরে মাথা চুলকাল লোকটা। বোঝাল না তাকে কিশোর, সাইকেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

'খোকা,' ডাকল পুলিশম্যান, 'কার্ডে এই আশ্চর্যবোধগুলো কেন?'

হেসে ঘুরে চাইল কিশোর। 'লোকের কৌতূহল জাগানোর জন্যে। তাছাড়া সব রকম আশ্চর্য, উদ্ভট রহস্যের সমাধান করতে চাই আমরা, চিহ্নগুলো দেয়ার সেটা আরেক কারণ।'

সাইকেলে উঠে আরেকবার ফিরে তাকাল কিশোর, তখনও মাথা চুলকাচ্ছে পুলিশম্যান। মুচকি হেসে বেরিয়ে এল ড্রাইভওয়ে ধরে।

কিন্তু বেশি দূরে গেল না কিশোর। কৌন ম্যানশন থেকে কয়েক ব্লক দূরে এসে থামল। আধুনিক মডেলের কয়েকটা বাড়ি এখানে, ফা'রকোপারের মধ্যযুগীয় বাড়িটার সঙ্গে বেমানান। সঙ্গে করে স্থানীয় পত্রিকার কিছু পেপার কাটিং নিয়ে এসেছে সে। যে চারজন লোক ভূত দেখার কথা রিপোর্ট করেছে থানায়, তাদের নামধাম লেখা আছে। ঠিকানা খুঁজে একটা বাড়ি বের করল সে। ড্রাইভওয়েতে ঢুকল। এই সময় একটা গাড়ি ঢুকল, কিশোরের পাশে থেমে গেল। ড্রাইভারের পাশের দরজা খুলে নামল একজন লোক। জিজ্ঞেস করল, কি চায়। জানাল কিশোর।

লোকটা চারজনের একজন, নাম, হ্যারি পিটারসন। সানন্দে কিশোরের প্রশ্নের জবাব দিল।

জানা গেল, পিটারসন আর তার এক প্রতিবেশী হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছিল সে-রাতে, সিগারেট ফুঁকছিল আর বেসবল নিয়ে আলোচনা করছিল, এই সময় দুজন লোক ডাকে তাদেরকে পেছন থেকে। অচেনা লোক, হ্যারি আর তার প্রতিবেশী মনে করছে, আগন্তুক দুজনও তাদের প্রতিবেশী হবে, হয়তো নতুন এসেছে এ-এলাকায়। নইলে এভাবে যেচে এসে কথা বলবে কেন? জ্যোৎস্না ছিল। চাঁদের আলোয় পোড়ো বাড়িটা কেমন দেখা যায়, দেখতে যাওয়ার কথা তুলল দুই আগন্তুক। ভালই লাগল প্রস্তাব। রাজি হয়ে গেল পিটারসন আর তার প্রতিবেশী বন্ধু। আগন্তুকদের একজনের ভারি কণ্ঠস্বর।

গ্যারেজ থেকে দুটো টর্চ নিয়ে এল পিটারসন, একটা দিল তার বন্ধুকে।

চারজনে চলল কৌন ম্যানশনের দিকে। পথে আরও দুই প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা, তাদেরকেও সঙ্গে যেতে রাজি করিয়ে ফেলল ভারিকণ্ঠ। খুব মজা পাচ্ছিল যেন সে, ভূত নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছিল, তার ধারণা পোড়ো বাড়িতে ভূতের দেখা মিলে যেতে পারে।

'ভূত দেখা যাবেই, জোর দিয়েছিল, একথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝোঁকাল পিটারসন। 'তা দিয়েছিল। তার কথা ফলেছে। একেবারে জলজ্যান্ত ভূত, আশ্চর্য!'

'লোক দু'জনকে চেনেন না বলছেন?'

'নাহ্। তবে একজনকে আগে কোথাও দেখেছি মনে হয়েছিল। অন্যজন একেবারে অচেনা। আশেপাশেই কোথাও থাকে ভেবেছিলাম। অনেক প্রতিবেশী আমাদের, সবাইকে চিনি না, চেনা সম্ভবও নয়। গত এক বছরে অনেক নতুন লোক এসেছে।'

'মোট ক'জন গিয়েছিলেন আপনারা?'

'ছয়,' ভেবে বলল পিটারসন। 'কারও কারও ধারণা, সাতজন, কিন্তু ড্রাইভ-ওয়েতে যখন ঢুকি তখন ছ'জনই ছিল। হতে পারে, পেছন পেছন আরও একজন এসেছিল, তবে আমি দেখিনি। তারপরে যা কাণ্ড শুরু হলো, লোক গোণার কথা মনে থাকে নাকি কারও? তাছাড়া গাঢ় অন্ধকার ছিল। কৌন ম্যানশন থেকে বেরিয়ে অচেনা দু'জন চলে গেল। আমি আর আমার তিন প্রতিবেশী ঠিক করলাম, পুলিশে খবর দিতে হবে। ওই দু'জনের আর কোন খোঁজ পাইনি।'

বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোট রোমশ কুকুর, আদুরে গলায় কুঁইকুঁই করে পিটারসনের পায়ে গা ঘষতে লাগল।

'লক্ষ্মী ছেলে,' নিচু হয়ে কুকুরটার গায়ে হাত বুলোল পিটারসন।

'এই কুকুরটাকেই নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ, হাঁটতে বেরোলেই জিমিকে সঙ্গে নিই, বিশেষ করে বিকেলে। সেরাতেও নিয়েছিলাম।'

কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। জানোয়ারটাও তাকাল তার চোখে চোখে। মুখ হাঁ, জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে, যেন হাসছে তার দিকে চেয়ে! ভুরু কোঁচকাল কিশোর। আবার কিছু একটা মনে আসি আসি করেও আসছে না।

আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল কিশোর, কিন্তু নতুন কিছুই জানাতে পারল না পিটারসন, তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাইকেলে চড়ে বেরিয়ে এল সে।

ধীরে ধীরে প্যাডাল করে চলেছে কিশোর, গভীর চিন্তায় মগ্ন। ইয়ার্ডে পৌঁছে দেখল, বিশাল সদর দরজা বন্ধ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এতক্ষণে খেয়াল হলো, তদন্ত করতে গিয়ে বেশ দেরি করে ফেলেছে।

নিজের ঘরে বসে আরামে পাইপ টানছে বোরিস। কিশোর উঁকি দিতেই ডাকল, 'এসেছ। এসো এসো। খুব ভাবছ মনে হচ্ছে?'

'বোরিস,' ঘরে ঢুকল কিশোর, 'গতরাতে আমার চিৎকার শুনেছেন। কি রকম মনে হয়েছিল?'

'মনে হয়েছিল বাড়ি মেরে কোন শুয়োরের ঠ্যাঙ ভেঙে দেয়া হয়েছে।'

'কিন্তু আমার জানালা যদি বন্ধ থাকত, শুনতে পেতেন?'

'বোধহয় না। কি বোঝাতে চাইছ?'

উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল কিশোরের মুখ। চিৎকারটা সবাই শুনেছে, পিটারসনের ছোট কুকুরটাও। হয়তো কোন সূত্র দিতে পারবে ওটা। শার্লক হোমসকে অনেক সময় অনেকভাবে সাহায্য করেছে কুকুর।

তাড়াহুড়ো করে নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। খুলতে শুরু করেছে কয়েকটা

প্যাচ।

কৌন ম্যানশনে দরজা-বন্ধ ঘরে চিৎকার করেছিল সে, তার চিৎকার স্পষ্ট শুনতে পায়নি পুলিশম্যান। কিন্তু বাইরে এসে ঝোপের ভেতর থেকে যখন চিৎকার করল, স্পষ্ট শুনতে পেল। এটা একটা জোরাল পয়েন্ট।

টেপরেকর্ডার বের করে রবিনের রেকর্ড করে আনা ক্যাসেটটা চালু করে দিল। মন দিয়ে শুনল চিৎকার, কথাবার্তা আর সবরকম আওয়াজ শোনা গেল সব। তারপর চুপচাপ ভাবল কয়েক মিনিট। সেদিন রবিন যা যা বলেছে, আবার পর্যালোচনা করে দেখল মনে মনে। যাচ্ছে, খাপে খাপে বসে যাচ্ছে! কিন্তু অনেকগুলো ব্যাপার এখনও অস্পষ্ট, কিংবা দুর্বোধ্য।

ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালার দরকার মনে করল না কিশোর, হঠাৎ উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল। অনেকক্ষণ পর ওপাশে ফোন তুলল কেউ।

'হ্যালো, রবিনকে দেয়া যাবে?' অনুরোধ করল কিশোর।

'কে, কিশোর পাশা?' মিস দিনারা কৌনের কণ্ঠ, কাঁপছে।

'হ্যাঁ। রবিনকে দরকার, মিস কৌন। কয়েকটা জরুরী কথা…।'

'…রবিন তো নেই।'

'নেই?'

'নেই,' অস্থির কণ্ঠস্বর। 'মুসাও নেই। আমার নাতি মিঙও গায়েব।'

আট

নেকলেস চুরির খবর যে রাতে ফোনে কিশোরকে জানিয়েছে রবিন, তার পরদিন সকালে উঠে নাস্তা সেরে মিঙের সঙ্গে বেরোল সে আর মুসা, ভারড্যান্ট ভ্যালি দেখতে। সেই গুহা দেখতে যাবে, আঙুরের রস গাঁজিয়ে যেখানে মদ তৈরি হয়! মিঙ জানাল, পুকুরটা নতুন কাটা হয়েছে, কিন্তু ওই গুহা আর আশেপাশের সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে অনেক আগে, খনি ছিল ওটা এক সময়।

সারাদিন বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই ছেলেদের, ঘুরবে, দেখবে কি আছে না আছে। বাড়ি গিয়ে কি হবে? নেকলেস চুরির রহস্য ভেদ করতে পারবে না তারা। শেরিফ হামফ্রের ধারণা ঠিক হলে, চোর এতক্ষণে নিশ্চয় স্যান ফ্রানসিসকোতে পৌঁছে গেছে, ওকে ধরা এখন পুলিশের পক্ষেও কঠিন। আরও একটা কারণে রাতের আগে ফেরার ইচ্ছে নেই। রিপোর্টার।

সকাল থেকেই খবরের কাগজের লোকজন আসতে শুরু করেছে, তিন কিশোরের অনুমান, নিশ্চয় এখন বাড়িতে গিজ-গিজ করছে লোকে। ছেঁকে ধরেছে মিস কৌনকে। জবাব দিতে দিতে জান খারাপ হয়ে যাচ্ছে হয়তো মহিলার। ফিরে গেলে তিন কিশোরকেও ওদের মুখোমুখি হতে হবে, ওই ঝামেলার মধ্যে থাকতে রাজি না ওরা।

আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে এসেছে ওরা। ঘোড়ায় চড়তে ওস্তাদ মিঙ, মুসা আর রবিনও পারে—জিনার কাছে শিখেছে, তবে মিঙের মত নয়। জিনা আর মিঙ

প্রতিযোগিতায় নামলে বোঝা যেত, দু'জনের মাঝে কে বেশি দক্ষ।

বিষণ্ণ দেখাচ্ছে মিঙকে। 'শ'খানেক শ্রমিক থাকার কথা ছিল এখন,' বলল সে, 'বেশ কয়েকটা ট্রাক থাকার কথা, আঙুর বোঝাই করে প্রেসিং হাউসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। অথচ দেখো, মোটে বারো-তেরোজন লোক আছে। মাত্র একটা ট্রাক। ভূতের ভয়ে পালিয়েছে সব। দাদীমার সর্বনাশ হয়েই গেল। কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না!'

কোন জবাব জোগাল না রবিনের মুখে।

মিঙকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে মুসা বলল, 'এত ভেঙে পড়ছ কেন? আমাদের কিশোর তো আছে। রকি বীচে ভূতের রহস্য সমাধানে ব্যস্ত এখন সে। অসাধারণ বুদ্ধিমান, দেখো সমাধান করে ফেলবে। ভূতের ভয় না থাকলে আবার ফিরে আসবে শ্রমিকেরা।'

'খুব তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারলে হত,' বলল মিঙ, 'নইলে, অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে নেবে শ্রমিকেরা। আজ সকালে সুই কি বলল জানো? আমিই নাকি সকল অনর্থের মূল, আমি অলক্ষুণে। আমি আসার পর থেকেই নাকি যত গোলমাল শুরু হয়েছে ভারড্যান্ট ভ্যালিতে।'

'বাজে কথা,' জোর গলায় বলল রবিন, 'কুসংস্কার। অলক্ষুণে আবার হয় নাকি মানুষ?'

মাথা নাড়ল মিঙ। 'জানি না। তবে এটা ঠিক, আমি আসার পর থেকেই একটার পর একটা গোলমাল হয়ে চলেছে। এক সঙ্গে অনেক পিপা মদ একবার নষ্ট হয়ে গেল, পিপায় ফুটো হয়ে মদ পড়ে গেল, মেশিনের পার্টস ভাঙল। আরও নানারকম গণ্ডগোল। কিছুই যেন ঠিকমত চলতে চাইছে না।'

'তাতে তোমার কি দোষ?' মুসা বলল।

'কিছু কিছু অলক্ষুণে মানুষ থাকে না।' বলল মিঙ, 'আমিও তেমনি একজন হতভাগ্য হয়তো। আমি হংকঙে ফিরে গেলে হয়তো আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, ভূত চলে যাবে, আবার হেসে উঠবে ভ্যারড্যান্ট ভ্যালি। যদি শিওর হতে পারতাম, কালই চলে যেতাম। দাদীমার কষ্ট আমি সইতে পারি না।'

এই বিষণ্ণতা কাটানো দরকার, নইলে দিনটাই মাটি হবে, ভাবল রবিন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যে বলল, 'এই ভারড্যান্ট ভ্যালি তোমারই হবে, না? আর কোন ভাগবাঁটোয়ারা নেই?' দু'পাশে পাহাড়ের দেয়াল, মাঝে যতদূর চোখ যায় শুধু আঙুরের ঝোপ, সেদিকে তাকিয়ে আছে সে।

'দাদীমা তার সমস্ত সম্পত্তি আমাকেই উইল করে দিতে চায়। কিন্তু আমি ভাবছি, অর্ধেক ডলফ আংকেলকে দিয়ে দেব। এখানকার উন্নতির জন্যে অনেক করেছে সে। খেতখামার বাড়িয়েছে, নতুন মেশিন আনিয়েছে,' আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়ল মিঙ, 'অনেক লাভ হত। এক বছরেই শোধ করে দেয়া যেত ব্যাংকের ঋণ, কিন্তু সব শেষ করে দিল ওই হারামী ভূত।'

সরু পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে এল একটা জীপ, ওটাকে সাইড দেয়ার জন্যে পথের একেবারে কিনারে চলে এল তিন ঘোড়সওয়ার। খুব তেজি একটা

কালো কোল্ট ঘোড়ায় চড়েছে মিঙ, মুসারটা কম বয়েসী ঘোটকী, চঞ্চল, সামলাতে অসুবিধেই হচ্ছে গোয়েন্দাসহকারীর, একটু এদিক ওদিক হলেই উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবে ঘোড়াটা। রবিনেরটাও মাদী ঘোড়া, বয়স্ক, একেবারে শান্ত, যেভাবেই চালানো হচ্ছে, সেভাবেই চলছে।

পাশে এসে থেমে গেল জীপ। মুখ বাড়াল ফোরম্যান মরিসন। 'হেই, মিঙ, অবস্থা তো খুব খারাপ। শ্রমিক নেই, দেখেছ?'

মাথা ঝোঁকাল মিঙ।

'ওই তিন শয়তানের কাণ্ড,' বলল মরিসন, 'ভাগিয়ে দিয়েই ছাড়ল শেষকালে। লোক জোগাড়ের অনেক চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। কেউ আসতে রাজি না।'

চুপ করে রইল মিঙ।

'মিস কৌনকে জানাতে যাচ্ছি। গতিক সুবিধের না।'

জোর করে নিজের বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলল মিঙ। 'যাকগে, যা হওয়ার হবে। ভাগ্যের ওপর তো কারও হাত নেই। চলো, আমাদের কাজ আমরা করি।'

পুরো উপত্যকায় ঘুরে বেড়াল ওরা। মাঝেমধ্যে থেমে এটা-ওটা দেখল। প্রেসিং হাউসগুলো সব দেখাল মিঙ। দুপুরের দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা, খিদেও লেগেছে খুব। সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আর ক্যান্টিনে পানি নিয়ে এসেছে, ব্যাগে করে এনেছে ঘোড়ার খাবার।

'ঠাণ্ডা একটা জায়গা আছে,' জানাল মিঙ, 'আরামে বসে খাওয়া যাবে।' পুরানো একটা বিল্ডিঙের ধার দিয়ে নিয়ে চলল সে দুই গোয়েন্দাকে, পুরানো প্রেসিং হাউস, পরিত্যক্তই বলা চলে, খুব বেশি চাপ না থাকলে এখানে কাজ চলে না আজকাল।

আরও একশো গজ এগিয়ে, পশ্চিমের পাহাড় শ্রেণীর গোড়ায় ছায়া পাওয়া গেল। ঘোড়াগুলোকে ছায়ায় বেঁধে খেতে দেয়া হলো।

পর্বতের গা থেকে ছোট্ট একটা শাখা বেরিয়েছে ওখানে, শাখার গায়ে ঢাল কেটে ভারি একটা দরজা বসানো হয়েছে। দুই গোয়েন্দাকে দরজার সামনে নিয়ে এল মিঙ। 'এটাই সেই গুহা, যেটার কথা বলেছিলাম।' জোরে টান দিয়ে দরজাটা খুলল সে। ভেতরে অন্ধকার। 'আগে খেয়ে নিই, তারপর দেখাব সব কিছু।'

দরজার পাশে বসানো সুইচ বোর্ড, সুইচ টিপে দিল মিঙ। ক্লিক করে শব্দ হলো কিন্তু আলো জ্বলল না। 'ওহ্‌হো, ভুলেই গিয়েছিলাম, ডায়নামো বন্ধ। কাজ না চললে বন্ধই রাখা হয়। টর্চ জ্বালতে হবে।'

কোমরে ঝোলানো টর্চ খুলে নিয়ে জ্বালল মিঙ। লম্বা একটা করিডর দেখা গেল, দু'ধারে পাথরের দেয়াল, ছাত যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্যে কাঠের মোটা মোটা কড়িবর্গা লাগানো হয়েছে, দুই দিকেরই দেয়াল ঘেঁষে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে রাশি রাশি জালা। করিডরের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু লাইন, খানিক দূরে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ফ্ল্যাটকার।

'মদের জালা ফ্ল্যাটকারে তুলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয় দরজার কাছে,' বুঝিয়ে বলল মিঙ। 'লাইনের শেষ মাথায় ট্রাক দাঁড়ায়, তাতে বোঝাই করা হয় জালা।

লাইনের ওপর দিয়ে ফ্ল্যাটকার ঠেলে আনা খুবই সহজ, পরিশ্রম খুবই কম হয়, যত ভারি বোঝাই থাকুক না কেন।'

'বুঝলাম,' হাত তুলল মুসা। 'কথা আর না বাড়িয়ে আগে পেট ঠাণ্ডা করে নিলে কেমন হয়?'

পাথরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল মুসা আর রবিন, মিঙ বসল তাদের মুখোমুখি। লাঞ্চ প্যাকেট খুলল। মাত্র কয়েক ফুট দূরে, দরজার বাইরে অপরাহ্নের কড়া রোদ, তীব্র গরম, অথচ গুহার ভেতরে এখানে বেশ ঠাণ্ডা, যেন এয়ারকুলার লাগানো রয়েছে।

খেতে খেতেই মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে ওরা, পুরানো প্রেসিং হাউসটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, কিন্তু ওখান থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওদেরকে।

খাওয়া শেষ। হাত-পা ছড়িয়ে আরামে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা। নিজের জীবনের কথা বলছে মিঙ। কয়েকটা পুরানো গাড়ি এসে থামল পুরানো প্রেসিং হাউসের কয়েকশো গজ দূরে, নতুন প্রেসিং হাউসের সামনে।

জনা ছয়েক লোক নামল গাড়ি থেকে, সব ক'জনের বিশাল শরীর, শক্তিশালী। এক জায়গায় জমা হলো ওরা। কোন কিছুর অপেক্ষা করছে মনে হচ্ছে।

চুপ হয়ে গেছে মিঙ। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। 'দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? এমনিতেই লোক কম, আঙুর তোলা শুরু করছে না কেন?'

মরিসনের জীপ এসে থামল লোকগুলোর পাশে, লাফ দিয়ে নামল বিশালদেহী ফোরম্যান। প্রেসিং হাউসের দিকে চলল, তাকে অনুসরণ করল ছয়জন। সবাই ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দিল।

'মেশিন চালাবে বোধহয়,' বিড়বিড় করল মিঙ। 'তার ব্যাপার, যা খুশি করুকগে। লোকটাকে পছন্দ করি না, কিন্তু কাজ বোঝে। শ্রমিক সামলাতে তার জুড়ি কম। দুর্ব্যবহারও করে।' কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে আছে সে, রবিন আর মুসার দিকে তাকাল। 'খনির সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ দেখার ইচ্ছে আছে?'

আছে, জানাল দুই গোয়েন্দা। কোমরের বেল্টে ঝোলানো টর্চ খুলে নিল। তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আলগা পাথরে পা পিছলাল মুসা, পতন ঠেকাতে গিয়ে হাত থেকে ছুটে গেল টর্চ পাথুরে মেঝেতে পড়ে ঝনঝন শব্দ তুলল।

টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে রবিনের টর্চের আলোয় দেখল, কাঁচ আর বাল্‌ব্ ভেঙে গেছে! 'ইয়াল্লা। গেছে আমার টর্চ।'

'দুটোতেই চলবে,' বলল মিঙ, 'তবে...' প্রেসিং হাউসের কাছে দাঁড়ানো জীপটার দিকে তাকাল, 'তবে, ইচ্ছে করলে মরিসনের টর্চটা নিতে পারি। গতরাতে যেটা ধার দিয়েছিল আমাকে। তার টুল বক্সে অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে রাখে। রাতের আগে ফেরত দিলেই চলবে। তোমরা থাকো, আমি গিয়ে নিয়ে আসি।'

বাধা দিয়ে মুসা বলল, 'তুমি থাকো, আমিই যাই। আমি ভেঙেছি, আনার দায়িত্ব আমার।'

কি ভাবল মিঙ, মাথা কাত করল, 'ঠিক আছে।' নোটবুক বের করে পাতা ছিঁড়ে তাতে নোট লিখল মরিসনকে, 'টর্চটা ধার নিচ্ছি। রাতের আগে ফেরত

দেব।—মিঙ। কাগজটা মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল। 'কাজের সময় বিরক্ত করা পছন্দ করে না সে। এই নোটটা টুলবক্সে রেখে এসো। যন্ত্রপাতি সব কোম্পানির, আমি লিখে দিয়েছি, কিছু মনে করার নেই তার।'

ঘোড়ায় চড়ে চষা খেতের ওপর দিয়ে চলল মুসা। দুই মিনিটেই পৌঁছে গেল জীপের কাছে। খেয়েদেয়ে আর বিশ্রাম নিয়ে আবার তাজা হয়ে উঠেছে ঘোটকী, চঞ্চলতা বেড়েছে, সামলাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে মুসার। নেমে রাশ ধরে রাখল শক্ত হাতে। আরেক হাতে খুলল জীপে রাখা টুলবক্সের ডালা। টর্চটা দেখা যাচ্ছে না। কয়েকটা যন্ত্রপাতি সরাতেই পাওয়া গেল ওটা, বাক্সের এক কোণে লুকিয়ে ছিল। তুলে নিল। পুরানো ধাঁচের বড় ভারি জিনিস, কালো প্লাস্টিকের খোল, পেছনে রিঙ বা লুপ জাতীয় কিছু নেই কোমরে ঝোলানোর জন্যে, অগত্যা কোমরের বেল্টের ভেতর গুঁজে রাখল সেটা।

নোটটা বাক্সে রাখল, ডালা তোলাই রইল, যাতে এসে প্রথমেই কাগজটা চোখে পড়ে মরিসনের। অনেক কায়দা কসরত করতে হলো ঘোড়ায় চড়তে, কিছুতেই পিঠে নিতে চাইছে না ঘোটকী।

বড় জোর একশো গজ এসেছে, এই সময় পেছনে চিৎকার শুনতে পেল মুসা। ফিরে তাকাল। জীপের কাছে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাত নাড়ছে মরিসন, চেঁচামেচি করছে। টর্চটা দেখাল মুসা, ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল নোট রয়েছে টুলবক্সে, ঘোড়া থামাল না।

লাফিয়ে জীপে উঠল মরিসন। চিৎকার শুনে প্রেসিং হাউস থেকে অন্য লোকগুলো বেরিয়ে এসেছে, দেখছে। আঙুরের ঝোপ দলে খেত মাড়িয়েই ছুটে আসতে লাগল জীপ। দরজা দিয়ে মুখ বের করে চিৎকার করছে ফোরম্যান, হাত নেড়ে থামার ইঙ্গিত করছে মুসাকে।

থামতে চাইছে মুসা, কিন্তু ঘোটকী কথা শুনছে না। চেঁচামেচিতে অস্বস্তি বোধ করছে বোধহয়। 'আরে থাম্ থাম্!' রাশ টেনে ধরল সে।

কাছে এসে থামল জীপ। খানিকটা পাশে সরে গেল ঘোটকী। বন্দুকের নল থেকে গুলির মত ছিটকে বেরিয়ে দৌড়ে এল মরিসন। 'চোর! চোর কোথাকার! ছাল ছাড়াব···।' রাগে বাক্য শেষ করতে পারল না, মুখে আটকে গেল।

ঘোটকী বোধহয় ভাবল, তাকেই গাল দিচ্ছে লোকটা, মারতে আসছে আকাশমুখী বিরাট এক লাফ মারল। আরেকটু হলেই পড়ে গিয়েছিল মুসা, খপ করে চেপে ধরল জিনের সামনের উঁচু শক্ত মাথাটা।'

আবার চেঁচিয়ে উঠল মরিসন।

ঘাবড়ে গিয়ে ছুট লাগাল ঘোটকী, আঙুরের ঝোপ দলে দৌড় দিল পাহাড়ের ঢালের দিকে, অনেক চেষ্টা করেও থামাতে পারল না মুসা। কি আর করবে? দু'হাঁটু ঘোড়ার পেটের সঙ্গে চেপে রেখে, জিন আর রাশ একই সঙ্গে আঁকড়ে ধরে কোনমতে জানোয়ারটার পিঠে উপুড় হয়ে রইল সে।

নয়

দূর থেকেই দেখতে পেল মুসা, পাহাড়ের ঢালে সরু একটা পথ উঠে গেছে, বেশ খাড়া। সোজা সেই পথে এসে উঠল ঘোটকী। গতি সামান্য কমল, এই সুযোগে আরেকটু শক্ত হয়ে বসল মুসা। পড়ে যাওয়ার যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে ফিরে তাকাল একবার। জীপ নিয়ে তাড়া করে আসছে মরিসন। উঁচুনিচু খেতের ওপর দিয়ে সাংঘাতিক ঝাঁকি খেতে খেতে আসছে গাড়ি।

পাহাড়ী পথের গোড়ায় এসে থেমে গেল জীপ। লাফিয়ে নামল মরিসন, ঘুসি পাকিয়ে হাত ঝাঁকাতে লাগল মুসার দিকে।

রবিন আর মিঙকে বেরোতে দেখল মুসা। ঘোড়ায় চড়ল ওরা তাড়াহুড়ো করে, মুসার দিকে ছুটে আসতে শুরু করল। মরিসন আর তার জীপের পাশ কাটিয়ে ছুটে এল দ্রুত গতিতে, মিঙ আগে, রবিন পেছনে। সাংঘাতিক জোরে ছুটছে মিঙের কালো কোল্ট, মুসার ঘোটকীর সঙ্গে দূরত্ব কমছে।

একটা পাথরের পাশ কাটাতে গিয়ে জোরে মোচড় খেলো ঘোটকীর শরীর, কোনমতে দ্বিতীয়বার পতন রোধ করল মুসা। একটা মোটামুটি সমতল জায়গায় এসে আবার গতি বাড়াল ঘোড়া। পেছনে খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। খানিক পরেই মুসার পাশাপাশি হলো মিঙ। ঘোটকীর রাশ ছেড়ে দিয়েছে মুসা, বাতাসে উড়ছে ওটা, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল মিঙ। কোল্টের গতি কমাল ধীরে ধীরে, টানের চোটে ঘোটকীও গতি কমাতে বাধ্য হলো। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পড়ল দুটো ঘোড়া, নাক প্রসারিত, জোরে জোরে শ্বাস টানছে, চামড়া ঘামে ভেজা।

'ধন্যবাদ, মিঙ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুঝি ঘোটকীর বাচ্চা।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে মুসার দিকে চেয়ে আছে মিঙ।

'কি ব্যাপার? অমন করে দেখছ কেন?'

'ভাবছি,' মিঙ বলল, 'তোমার ঘোড়াকে তাড়া করল কেন মরিসন?'

'কি জানি! চেঁচামেচি শুরু করে দিল। চোর বলে গাল দিল। ভীষণ রেগেছে।'

'আসার সময় দেখলাম, ইবলিসের চেহারা হয়ে গেছে। রাগে হাত-পা ছুঁড়ছে। পকেটে রিভলভার আছে, র‍্যাটল সাপ মারার জন্যে দিয়েছে দাদীমা, ওটা প্রায় বের করে ফেলেছিল।'

'বুঝতে পারছি না,' মাথা চুলকাল মুসা। 'পুরানো একটা টর্চের জন্যে এই কাণ্ড কেন করল?' বেল্টে গোঁজা কালো জিনিসটা টেনে খুলে দেখল।

টর্চটার দিকে তাকিয়ে রইল মিঙ। 'ওটা···ওটা মরিসনের টর্চ নয়,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'মানে, টুলবক্সে কখনও দেখিনি এটা। গতরাতে আরেকটা দিয়েছিল।'

'আমি এটাই পেয়েছি। আর কোন টর্চ দেখিনি। তুমি বললে বলেই নিলাম···ও এমন আচরণ করবে জানলে···'

'ভুলই করেছি,' বাধা দিয়ে বলল মিঙ। 'দেখি?' হাত বাড়াল সে।

টর্চটা দিল মুসা। হাতে নিয়ে দেখল মিঙ, ওজন আন্দাজ করল। 'হালকা।

ভেতরে বোধহয় ব্যাটারি নেই।'

'তাহলে তো কোন কাজে আসছে না,' দারুণ বিরক্ত শোনাল মুসার কণ্ঠ। 'এমন একটা জিনিসের জন্যে এই কাণ্ড করল মরিসন? কেন?'

'হয়তো...,' রবিন দেখে থেমে গেল মিঙ।

টলোমলো পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল রবিনের নড়বড়ে বুড়ো ঘোড়া। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে, ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন হাঁপাচ্ছে রবিন। 'উফ্, বেঁচেছি। আরেকটু হলেই গেছিলাম। একবার তো মনে হলো, হাঁটু ভেঙে আমাকে নিয়েই গড়িয়ে পড়বে ঘোড়া।...কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে?'

'এত রাগল কেন মরিসন, তাই ভাবছি,' বলতে বলতে প্যাঁচ ঘুরিয়ে টর্চের পেছনের ক্যাপ খুলে ফেলল মিঙ। ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে বের করে আনল তুলোট কাগজের ছোট একটা প্যাকেট। হাতের তালুতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। খুলল সাবধানে।

'গোস্ট পার্লস!' ভেতরের জিনিসটা দেখে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'মরিসন চুরি করেছিল!' রবিনও চেঁচাল।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল মিঙের। 'তাই তো মনে হচ্ছে। টর্চের ভেতর। বাহ্, চমৎকার বুদ্ধি। পুরানো যন্ত্রপাতির বাক্সে বাতিল টর্চ, কেউ সন্দেহ করবে না। জীপের ভেতর নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কাছছাড়া করার ঝুঁকি নেয়নি।'

'হুঁ, ভাল জায়গায়ই লুকিয়েছিল,' বলল রবিন। 'আমাদের হঠাৎ টর্চের দরকার হবে, কল্পনাও করেনি।'

'ভাবছি, প্রেসিং হাউসে লোকগুলোকে নিয়ে কি করছিল?' মিঙের কণ্ঠে অস্বস্তি। 'এখন তো অনেক কিছুই সন্দেহ হচ্ছে। এই যে একের পর এক দুর্ঘটনা, পিপা ফুটো হওয়া, মেশিন ভেঙে যাওয়া, এসবে তার কোন হাত নেই তো?'

'থাকতেও পারে। চলো, তোমার দাদীমাকে গিয়ে সব খুলে বলি। শেরিফকে ডেকে এনে মরিসনকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন।'

'যত সহজ ভাবছ তত সহজ হবে না,' ধীরে ধীরে বলল মিঙ। 'মরিসন ডেনজারাস লোক। মরিয়া হয়ে উঠলে কি করবে বলা যায় না। আমাদের এখন বাড়ি ফিরতে দিলে হয়।'

'কি করবে?' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রবিন।

সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে বলল মিঙ, 'দেখা যাক কি করে? রবিন, তুমি ঘোড়াগুলো রাখো। আমি আর মুসা গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসি, নিচে কি হচ্ছে।'

তিনটে রাশ হাতে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে রইল রবিন।

মিঙ আর মুসা ফিরে চলল, যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে।

সমতল জায়গাটার কিনারে এসে ঝুঁকে নিচে তাকাল। পথের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক, পাহারায় রয়েছে যেন। ঝাঁকি খেতে খেতে গাঁয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে জীপটা। প্রেসিং হাউসের কাছে দাঁড়ানো দুটো পুরানো গাড়ি স্টার্ট নিয়ে এগিয়ে এল খেতের ওপর দিয়ে, পাহাড়ী পথটাই বোধহয় লক্ষ্য।

সরু পাহাড়ী পথের কয়েকগজ ওপরে এসে থেমে দাঁড়াল আগের গাড়িটা,

পেছনেরটা আড়াআড়ি ভাবে থামল পথের ঠিক গোড়ায়। উদ্দেশ্য বোঝা গেল, পথ রোধ করেছে। ঘোড়া নিয়ে গাড়ি দুটোকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না, যেতে হলে ডিঙিয়ে যেতে হবে, এবং সেটা সম্ভব নয়—আর কোন উপায় নেই!

দম আটকে আসছে যেন মিঙের। নিচু গলায় বলল, 'ঘোড়ার জন্যে গেছে মরিসন। আমরা যাতে পালাতে না পারি, সেজন্যে লোকগুলোকে রেখে গেছে।'

'তারমানে ফাঁদে ফেলেছে?'

'তাছাড়া আর কি? ওপথে ফিরে যেতে পারব না আমরা, এগিয়ে গিয়ে উল্টো পাশে হয়তো নামতে পারব, কিন্তু সহজ হবে না। নিচে হ্যাশনাইফ ক্যানিয়ন, গভীর একটা গিরিসঙ্কট তা-ও বক্স ক্যানিয়ন। এক দিক রুদ্ধ, আরেক দিক খোলা। খোলা দিক দিয়ে বেরোলে সরু একটা পথ পাওয়া যাবে, খুব খারাপ পথ, উঁচুনিচু, স্যান ফ্রানসিসকো যাওয়ার মেইন রোডের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

'কিন্তু ওর পথ ধরে গেলেও বাঁচতে পারব না। সহজেই ধরে ফেলবে আমাদেরকে মরিসন। ইতিমধ্যেও ওই পথের শেষ মাথায় পাহারা পাঠিয়ে দিয়েছি কিনা কে জানে। নেকলেসটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে সে, জানা কথা।'

'কিন্তু এসব করে পার পাবে না,' চেপে রাখা দম ফেলল মুসা। 'নেকলেসটা নিয়ে নেবে, কিন্তু আমরা তো বলে দেব।'

'ওকথা ভাববে না মনে করেছ?' মিঙের অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠ ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বইয়ে দিল মুসার শিড়দাঁড়ায়। 'আমাদের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করবে। যারা যারা এখানে দেখেছে আমাদের, সব মরিসনের লোক, কেউ মুখ খুলবে না।'

চুপ হয়ে গেল মুসা। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। ঢোক গিলল।

'এসো,' মুসার হাত ধরে টানল মিঙ। হঠাৎ হাসি ফুটল মুখে, কালো চোখের তারা উজ্জ্বল। 'একটা ফন্দি এসেছে মাথায়। গাঁয়ে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে ফিরতে মরিসনের সময় লাগবে। ওকে ফাঁকি দেব আমরা। জলদি করতে হবে। চলো।'

দৌড়ে ফিরে এল ওরা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে রবিন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বলল, 'কি ব্যাপার?'

'ফাঁদে আটকেছে আমাদের,' জানাল মুসা। 'নেকলেসটা ফেরত চায় মরিসন, সেইসাথে আমাদের মুখ বন্ধ করে দিতে চায়। লোকগুলো ওর সহকারী।'

'কিন্তু ওকে বোকা বানাব আমরা,' আশ্বাস দিল মিঙ। 'পাহাড়ের চূড়া লম্বালম্বি এগিয়ে গেছে, চূড়ার ওপর দিয়েই বক্স ক্যানিয়নের পাশ কেটে চলে যাব, তারপর নামব। আরেকটা গিরিপথ আছে।'

ঘোড়ায় চাপল আবার তিনজনে। আস্তে আস্তে চলল মিঙ, ঘোড়াগুলোকে ক্লান্ত করতে চায় না। তার পেছনে রইল রবিন, সবার পেছনে মুসা। তরুণ কোল্টের কোনরকম আড়ষ্টতা নেই, স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু নড়বড়ে বুড়িটার নড়ার ইচ্ছে নেই, খালি দাঁড়িয়ে পড়তে চাইছে! মুসার তরুণী মেজাজ মর্জিও বিশেষ সুবিধের নয়। যে কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তবু বাধ্য হয়ে ওগুলোতে চড়েই এগোতে হলো ওদের, যা পথ, পায়ে হাঁটা সম্ভব না।

যা-ই হোক, নিরাপদেই আধ ঘন্টা পর পাথুরে গিরিপথে এসে নামল ওরা।

'হ্যাশনাইফ ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে ওদিকে গেছে পথটা,' হাত তুলে দেখাল মিঙ। 'মরিসনের ধারণা ওই পথ ধরে গিয়ে হাইওয়েতে উঠব আমরা। আসলে করব উল্টোটা।' ঘোড়ার মুখ ঘুড়িয়ে নিল সে, চলতে শুরু করল সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে। দু'পাশে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল। মাথার ওপরে আকাশের একটা অংশ শুধু দেখা যায়।

'দুটো হলুদ পাথরের দেখা পেলে এখন হয়,' বলল মিঙ, 'চিহ্ন। গিরিপথ থেকে বিশ ফুট ওপরে একটা, আরেকটা তার ওপরে।'

মিনিট দশেক একটানা চলল ওরা। তিনজনের মাঝে দৃষ্টি শক্তি বেশি তীক্ষ্ণ মুসার, সে-ই আগে দেখল পাথর দুটো। হাত তুলে বলল, 'ওই দুটো?'

মাথা ঝাঁকাল মিঙ। পাথর দুটোর নিচে এসে ঘোড়া থেকে নামল। 'নামো।'

দুই গোয়েন্দাও নামল। তাদেরকে অবাক করে দিয়ে ঘোড়াগুলোর গায়ে চাপড় মেরে বসল মিঙ। চমকে উঠে পেছন ফিরে দৌড়াতে শুরু করল কোল্ট, অন্য দুটো অনুসরণ করল তাকে।

'হাঁটতে হবে এখন,' বলল মিঙ। 'দরকার পড়লে ক্রলও করতে হতে পারে। গিরিপথ ওদিকে বন্ধ,' পেছনে দেখাল সে। 'এক জায়গায় ছোট একটা ডোবা আছে। পানির গন্ধ শুঁকে এগিয়ে যাবে ঘোড়াগুলো, পানি খেয়ে বিশ্রাম করবে ওটার পাড়েই। মরিসন যখন বুঝতে পারবে আমরা তাকে ফাঁকি দিয়েছি, খুঁজতে আসবে, ঘোড়াগুলো দেখবে, আমরা তখন কয়েক ঘণ্টার পথ দূরে।' ওপর দিকে তাকাল সে। 'ওখান দিয়ে একটা পথ গেছে জানি, অনেকটাই মুছে দিয়েছে পাথরের ধস। আমাদের জন্যে সুবিধেই। আশা করি উঠতে পারব ওখানে,' প্রথম হলুদ পাথরটা দেখল সে।

পাথরের খাঁজে খাঁজে হাত-পায়ের আঙুল বাধিয়ে উঠতে শুরু করল মিঙ। তাকে অনুসরণ করল রবিন। তার নিচে মুসা। এসব ব্যাপারে সে ওস্তাদ। নিজে তো উঠছেই, মাঝেমধ্যে নিচ থেকে ঠেলে উঠতে সাহায্য করছে রবিনকেও। দুই মিনিটেই উঠে এল ওরা হলুদ পাথরের কাছে। তাজ্জব হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, দুটো পাথরের মাঝে একটা বড় ফোকর। দ্বিতীয় পাথরটা আসলে ছাত সৃষ্টি করে রেখেছে গর্তের মুখে, বেশির ভাগটাই পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে প্রায় ঝুলে রয়েছে শূন্যে।

'গুহা,' বলল মিঙ। 'অনেক বছর আগে এক খনি-শ্রমিক স্বর্ণের লোভে খুঁজতে শুরু করে একাই। সুড়ঙ্গ কেটে ঢুকে যায় ভেতরে। ওখানেই ঢুকব আমরা।'

সুড়ঙ্গে নেমে গেল মিঙ। পেছনে নামল রবিন আর মুসা। গাঢ় অন্ধকারে এগিয়ে চলল অন্ধের মত। কিছুই জানে না কোথায় যাচ্ছে, কি আছে সামনে।

দশ

গুহার শেষ প্রান্তে নিয়ে এল দু'জনকে মিঙ। টর্চের আলোয় দেখা গেল বেশ বড় গুহা। এক জায়গায় একটা সুড়ঙ্গমুখ, আসলে পুরানো খনির গ্যালারি, বহু বছর আগে

খোঁড়া হয়েছিল। জায়গায় জায়গায় এখনও ছাত ঠেকা দিয়ে রেখেছে পুরানো কাঠের থাম, তবুও বেশ কিছু পাথর খসে পড়েছে ছাত থেকে।

'আমার প্ল্যান শোনো,' বলল মিগু। 'আরও অনেক গ্যালারি আছে এই পাহাড়ের নিচে। প্রথম যখন এসেছিলাম, দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। এক বুড়ো আছে, ন্যাট বারুচ, এখানকার প্রতিটি ইঞ্চি চেনা তার। সারাটা জীবন এসব খনিতেই কাটিয়েছে, সোনা খুঁজেছে, মাঝে মাঝেই পেয়েছে ছোটখাটো টুকরো।

'বুড়ো এখন হাসপাতালে। বারুচই চিনিয়েছে আমাকে খনিগুলো। এই গুহা থেকে একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে একেবারে সেই গুহাটায়, যেখানে মদ চোলাই করা হয়। যেটাতে বসে খেয়েছি আমরা খানিক আগে।'

'সেরেছে! তাই নাকি?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। গুহার দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেশি করে কানে বাজল সে আওয়াজ। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল সে। 'তারমানে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা? বাহ, কি মজা। ওপরে আমাদেরকে খুঁজছে মরিসন, ঘুণাক্ষরেও ভাবছে না আমরা তার নিচেই রয়েছি।'

'ঠিক তাই,' সায় দিল মিগু। 'এভাবেই বাড়ির মাইলখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা, ওদের অলক্ষ্যে। গুহামুখে পাহারা রাখার কথা ভাববে না ওরা, সুযোগটা নেব আমরা। ওখান দিয়ে বেরিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি চলে যাব। তারপর আর ঠেকায় কে? দেব মরিসনের কীর্তি ফাঁস করে।'

মুক্তির কথা ভেবে আনন্দিত হলো রবিন, কিন্তু অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরে এতখানি যেতে হবে ভাবতেই কেমন জানি লাগছে। যদি আটকে যায়? যদি পাথর পড়ে সামনের পথ বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে? কিংবা যদি পথ হারায় মিগু? তাহলে হয়তো আর কোন দিনই বেরোতে পারবে না মাটির তলায় এই গোলকধাঁধা থেকে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সবুজ চকের অস্তিত্ব অনুভব করল সে।

'চিহ্ন রেখে যাব নাকি?' বলল রবিন। 'তাহলে পথ হারালেও চিহ্ন দেখে আবার ফিরে আসতে পারব।'

'হারাব না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মিগু। 'যদি মরিসন এসে ঢোকে এখানে? চিহ্ন দেখে সব বুঝে গিয়ে আমাদের পিছু নেয়? না, ওসবের দরকার নেই।'

নিজের ওপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস মিগুর। কিন্তু রবিন জানে, মানুষ যা আশা করে না, তাই ঘটে যায় অনেক সময়।

মুসা রবিনের সঙ্গে একমত। বলল, 'আমরা এমন চিহ্ন রেখে যাব খেয়ালই করবে না মরিসন। দেয়ালে চক দিয়ে আশ্চর্যবোধক এঁকে দেব, মাঝে মাঝে তীরচিহ্ন আঁকব, একেকবার একেক দিকে মুখ করে, কেউ বুঝবেই না আমরা কোন্ দিকে গেছি। আশ্চর্যবোধকগুলোকে গুরুত্ব দেবে না, তীরচিহ্ন ধরে একবার এদিক যাবে, একবার ওদিক, ঘুরে মরবে শুধু শুধু।'

'তা করা যেতে পারে,' মাথা দোলাল মিগু। 'তবে এত ভাবনার কিছু নেই। এদিককার খনিগুলো চেনে না মরিসন, জানে না মদ চোলাইয়ের গুহাটার সঙ্গে যে এই গুহার যোগাযোগ আছে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, হুঁশিয়ার থাকা ভাল। বলা তো যায় না, যদি হারিয়ে যাই? তবে এই সুড়ঙ্গের মুখে চিহ্ন দেয়া চলবে না, তাহলে

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে কোনটাতে ঢুকেছি আমরা। ভেতরে ঢুকে তারপর চিহ্ন দেয়া শুরু করব।'

সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল ওরা। সরু পথ, মাঝে মাঝে ছাত এত নেমে এসেছে, মাথা ঠেকে যায়, নিচু হয়ে চলতে হয়। কোথাও কোথাও সুড়ঙ্গটাকে বেদ করে আড়াআড়িভাবে চলে গেছে আরও সুড়ঙ্গ, কিংবা মূল সুড়ঙ্গ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শাখা-সুড়ঙ্গ। ওই সব সুড়ঙ্গমুখে উল্টো পাল্টা তীর চিহ্ন এঁকে দিচ্ছে রবিন, যেটা ধরে যাচ্ছে, সেটার মাঝে মাঝে দেয়ালে আশ্চর্যবোধক আঁকছে, একবার এ পাশের দেয়ালে, একবার ওপাশের। এমনভাবে আঁকছে, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাবে যে কেউ, ওরা নিজেরা বাদে।

একটা জায়গায় খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এল সুড়ঙ্গ, তার ওপর পাথর ধসে পথ প্রায় রুদ্ধ।

থামতে বলল মিঙ। 'ক্রল করে যেতে হবে। আমি আগে যাই।' কোমরের বেল্টে গোঁজা কালো টর্চটা, যেটাতে নেকলেস ভরা আছে, সেটা টেনে খুলে মুসার হাতে গুঁজে দিল সে। 'এটা তোমার কাছে রাখো। পাথর আর মাটি সরিয়ে পথ করে নিতে হতে পারে। হারানোর ভয় আছে। যত্ন করে রাখো।'

মুসাও কোমরের বেল্টের ভেতর গুঁজে রাখল টর্চটা, বাকলেস আরও টাইট করে দিল, যাতে পড়ে না যেতে পারে মহামূল্যবান জিনিসটা। 'আমার হাতে আরেকটা টর্চ থাকলে ভাল হত।'

'তা হত,' স্বীকার করল মিঙ। 'দুটো আছে, এই অন্ধকারে আরেকটা থাকলে কাজে লাগত। রবিন, এক কাজ করো না, তোমারটা দিয়ে দাও মুসাকে। তুমি আমার পেছনে থাকো, তাহলে তোমার আর টর্চের দরকার পড়বে না। কি বলো?'

মাথা কাত করল বটে রবিন, কিন্তু মনে মনে মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটা। এই অন্ধকারে সব চেয়ে যেটা বেশি দরকার, সেটা আলো। কিন্তু অযৌক্তিক কথা বলেনি মিঙ, মুসার হাতে টর্চটা দিল রবিন। তারপর মিঙের পেছনে ক্রল করতে গিয়ে বুঝল, ঠিক কাজই করেছে। হাতে কিছু না থাকায় কাজটা সহজ হয়ে গেছে তার জন্যে।

সুড়ঙ্গের সরু অংশটা বড় জোর শ'খানেক গজ লম্বা, অথচ এটুকু পেরোতেই ওদের মনে হলো অসীম পথ, শেষ আর হতে চায় না। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে ওরা। রবিন আর মুসার অবস্থা যেমন তেমন, মিঙের অবস্থা কাহিল। সামনের পাথর দু'হাতে সরিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে তাকে। ধারাল পাথরে লেগে চামড়া কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেছে হাত।

দাঁড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে রবিনের। কিন্তু সোজা হয়ে বসারই উপায় নেই, দাঁড়াবে কিভাবে? একবার সেটা করতে গিয়ে অল্পের জন্যে বেঁচেছে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠতে চেয়েছিল, তাতেই বিপত্তি, কাঁধের ধাক্কায় ধসে পড়ল ছাতের আলগা পাথর, ঝরঝর করে পড়ে প্রায় ঢেকে দিল রবিনকে। আটকে গেল সে, নড়তে পারল না, পেছন থেকে এসে অনেক কষ্টে পাথর সরিয়ে তাকে মুক্ত করল মুসা।

'ধন্যবাদ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আতঙ্কিত রবিন। আর দাঁড়ানোর চেষ্টা

নয়।

অবশেষে চওড়া হতে শুরু করল সুড়ঙ্গ। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে হাঁপাতে লাগল ওরা। টর্চের আলোয় দেখা গেল, ছাতের কাঠের কড়িবর্গা পাথরের চাপে বাঁকা হয়ে গেছে, একটুখানি ঠেলা বা ধাক্কা লাগলেই ধসে পড়তে পারে তাহলে পাথরের তলায় জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে ওদের।

খানিকক্ষণ একই ভাবে বসে জিরিয়ে নেয়ার পর বলল মিঙ, 'সবচেয়ে খারাপ জায়গাটা পেরিয়ে এসেছি। সামনে আরেকটা আছে, তবে পেছনের মত এত খারাপ নয়। ওটা পেরোতে পারলেই...,' হাসল সে। 'একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। ওই পথে আমাদের পিছু নিতে পারবে না মরিসন, ওই সুড়ঙ্গে জায়গাই হবে না তার, গলে বেরিয়ে আসতে পারবে না, আটকে যাবে।'

বিশ্রাম নিতে নিতে খনির ইতিহাস বলল মিঙ। আঠারোশো উনপঞ্চাশ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় যখন স্বর্ণ আবিষ্কার হয়, তখন খোঁড়া শুরু হয় এই খনি। শুরুর দিকে সহজেই সোনা মিলতে লাগল, ফুরিয়ে আসার পর বেশির ভাগ শ্রমিকই চলে গেল অন্যত্র, কিন্তু কেউ কেউ রয়ে গেল, ওরা বেশি পরিশ্রমী। পাহাড়ের তলায় খুঁড়ে খুঁড়ে সুড়ঙ্গের জাল বানিয়ে ফেলল।

ভারড্যান্ট ভ্যালিতে তার আগে থেকেই আঙুরের চাষ হত। তারও অনেক পরে ওখানে আঙুরের খেত কিনলেন মিস দিনারা কৌনের মা।

তিরিশের দশকের পরেও টিকে ছিল কিছু কিছু খনিশ্রমিক, তারপর উনিশশো চল্লিশে আর সোনা পাওয়া গেল না, একে একে চলে গেল যারা তখনও ছিল। কেউ কেউ খনি খোঁড়া বাদ দিয়ে আঙুরের ফার্মে কাজ নিল।

'এখন আর সোনা আছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আছে, খুব অল্প। তবে সেটা তুলতে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি বলে কেউ আর এগিয়ে আসছে না,' বলল মিঙ। 'জিরানো হয়েছে। চলো, যাই।'

আবার এগোনোর পালা। দেয়ালে আশ্চর্যবোধক আর তীর চিহ্ন এঁকে চলল রবিন।

একটা জায়গায় এসে থমকে গেল মিঙ। কয়েকটা সুড়ঙ্গ এক জায়গায় মিলিত হয়েছে মূল সুড়ঙ্গের সঙ্গে। কোনটা দিয়ে যেতে হবে, ভুলে গেছে সে। অবশেষে ডানের একটা সুড়ঙ্গ বেছে নিয়ে তাতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ভুল করেছে। তিনশো গজ গিয়ে সরু হতে হতে মিলিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।

'ভুল পথে এসেছি,' টর্চের আলো জ্বেলে দেখছে মিঙ। সুড়ঙ্গের মেঝেতে এক জায়গায় আলো ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখো দেখো।'

দেখল রবিন আর মুসা। আলোয় মৃদু চকচক করছে শাদা হাড়। প্রথমে মনে হলো, মানুষের হাড়। কিন্তু ভাল মত দেখে বুঝল, কোন জানোয়ারের, বোধহয় আটকা পড়ে গিয়েছিল এখানে, ঢুকে কোন কারণে আর বেরোতে পারেনি, ক্ষুধাতৃষ্ণায় মরেছে।

'গাধার হাড়,' মিঙ বলল। 'মাল বওয়ার জন্যে নিয়ে আসা হত। হয়তো ধস

নেমে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বেরোতে আর পারেনি অসহায় জানোয়ারটা। লোকটার কি হয়েছিল কে জানে।'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল রবিনের। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল।

আবার আগের জায়গায় ফিরে এল ওরা। এবার সঠিক পথ বেছে নিল মিঙ। এগিয়ে চলল। তারও অনেক সুড়ঙ্গ উপসুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা জায়গায় এসে থামল মিঙ। তার গায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রবিন। 'কি হলো?'

'গলা,' জানাল মিঙ।

'গলা?' মুসা অবাক। 'কিসের গলা?'

'পাথরের মাঝের চিড়, খুব সরু আর রুক্ষ। প্রাকৃতিক। খনি আর গুহার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছে।'

ফাটলের মুখে আলো ফেলল মিঙ। ঠিকই বলেছে, খুবই সরু। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে ওর মধ্যে কোনমতে, কিন্তু সামনা-সামনি ঢুকতে পারবে না, পাশ থেকে ঢুকতে হবে। 'এটাই।'

'এর ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে?' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। 'শিওর?' ওই সরু ফাটলে ঢোকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার।

'শিওর,' বলল মিঙ। 'আগেও গিয়েছি। মুখের কাছে এসে দেখো। বাতাস লাগছে না? বাইরে থেকে আসছে।'

পরীক্ষা করে দেখল মুসা আর রবিন। ঠিকই। গালে ঝিরঝিরে বাতাসের স্পর্শ অনুভব করছে।

'ওর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে আমাদের,' আবার বলল মিঙ। 'আর কোন পথ নেই। আমরা এখনও গায়ে গতরে ছোট, তাই পারব। বড় কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আগে যাচ্ছি। তোমরা দাঁড়াও। ওপাশে গিয়ে তিনবার টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দেব, তারপর তোমরা আসবে। রবিন আসবে আগে। তারপর আবার তিনবার টর্চ জ্বাললে মুসা আসবে। ঠিক আছে?'

মাথা কাত করল দুই গোয়েন্দা।

ঢুকে গেল মিঙ। ডান হাতে টর্চ। খুব সাবধানে এক পা এক পা করে পাশে হেঁটে চলল। সামান্যতম বাড়তি নড়াচড়া করল না, কোনভাবে যদি কোন জায়গা থেকে এখন পাথর ধসে পড়ে, আর বেরোতে হবে না কোনদিন। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি।

রবিনের মুখ কালো। মুসার বুক দুরদুর করছে। বার বার আলো ফেলে দেখছে নিজের শরীর, তাকাচ্ছে সরু ফাটলটার দিকে, অনুমান করতে চাইছে, ফাটলে তার শরীর ঢুকবে কিনা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল, আর কখনও বেশি খাবে না, কোনমতে এখন এখান থেকে বেরোতে পারলে হয়, খাওয়া একেবারে কমিয়ে দেবে, যত লোভনীয় খাবারই সামনে থাকুক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছোঁবেও না। 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করতে লাগল সে।

কতক্ষণ অপেক্ষা করে আছে ছেলেরা, বলতে পারবে না, মনে হলো অনন্তকাল ধরে ফাটলটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবশেষে শেষ হলো প্রতীক্ষা, আলো

জ্বলল তিনবার। ওপাশে পৌঁছে গেছে মিঙ।

'রবিন, যাও,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। 'মিঙ যখন পেরেছে, তুমিও সহজেই পারবে। ওর চেয়ে তোমার শরীর অনেক ছোট, অনেক পাতলা। মুশকিল তো হবে আমার।'

'অত ভেব না,' সান্ত্বনা দিল রবিন। 'মিঙ যখন পেরেছে, তুমিও পারবে। ওর চেয়ে তুমি মোটা নও, একই রকম।' বন্ধুকে বলছে বটে, কিন্তু তার নিজের গলা-ই শুকিয়ে কাঠ। ঢোক গিলল। 'আলো দেখাও।'

পাশ ফিরে 'গলায়' ঢুকে পড়ল রবিন। একেবারে মুখের কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে আলো ফেলল মুসা। অন্য পাশ থেকেও আলো আসছে, টর্চ জ্বেলে রেখেছে মিঙ, রবিনের শরীরের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছে মুসা সেই আলো।

এগিয়ে যাচ্ছে রবিন। একটা সময় ওপাশের আলো আর দেখতে পেল না মুসা, রবিনের শরীর একেবারে ঢেকে দিয়েছে আলো। আরও কয়েক মুহূর্ত আলো জ্বেলে রাখল মুসা, তারপর যখন বুঝল মিঙের কাছাকাছি চলে গেছে রবিন, টর্চ নিভিয়ে দিল। অহেতুক ব্যাটারি খরচ করা উচিত নয় এখন।

আলোর সঙ্কেতের অপেক্ষায় রইল মুসা। কিন্তু কেন জানি দেরি হচ্ছে সঙ্কেত আসতে।

হঠাৎ শোনা গেল উত্তেজিত চিৎকার, 'মুসা-আ। খবরদার, এসো না...'

মিঙের কণ্ঠ, থেমে গেল আচমকা, যেন মুখ চেপে ধরা হয়েছে তার।

কিন্তু কি বলতে চেয়েছে মিঙ, বুঝতে পেরেছে মুসা, তাকে না যেতে বলেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। কিছুক্ষণ পর আলোর সঙ্কেত এল তিনবার, খানিক পরে আবার তিনবার। আলো দেখেই বোঝা গেছে, টর্চ ধরা হাতটা অস্থির। তাছাড়া রবিনকে ডাকার সময় প্রতিবারে যতক্ষণ করে আলো জ্বেলে রেখেছিল মিঙ, এখন তার চেয়ে কম সময় রেখেছে। এর মানে কি?

মিঙ বা রবিন আলোর সঙ্কেত দেয়নি, অন্য কেউ দিয়েছে।

তার মানে শত্রুর হাতে ধরা পড়েছে ওরা।

এগারো

এই সময় মিস কৌনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে কিশোর।

'ওদের কোন খবর নেই, বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন!' বললেন মিস কৌন। 'ঘোড়া নিয়ে গেছে। বলে গেছে, উপত্যকা ঘুরেফিরে দেখবে। সারাদিন আর পাত্তা নেই। এদিকে আমি পড়েছি এক মহা ঝামেলায়, রিপোর্টার, শেরিফ, ওদেরকে নিয়েই এত বেশি ব্যস্ত...। লোক পাঠিয়েছিলাম, অনেক খুঁজেছে। কিন্তু পাওয়া যায়নি ওদেরকে, এমনকি ঘোড়াগুলোও না।'

'কিন্তু গেল কোথায় ওরা?' নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর।

'আমার মনে হয় খনিতে ঢুকেছে। পাহাড়ের তলায় অনেক সুড়ঙ্গ আছে, ঢুকে হয়তো আর বেরোতে পারছে না। ওখানে খুঁজতে লোক পাঠাচ্ছি।'

নিচের ঠোঁটে একনাগাড়ে চিমটি কেটে চলেছে কিশোর। গোস্ট পার্ল চরি

গেছে, এখন তার বন্ধুরা নিখোঁজ। নিশ্চয় কোথাও একটা যোগসূত্র রয়েছে। বলল, 'অনেক লোক পাঠাচ্ছেন তো?'

'নিশ্চই। শ্রমিক, যারা এখনও আছে, ভূতের ভয়ে পালায়নি, সব্বাইকে। এমনকি বাড়ির চাকর-বাকরও কয়েকজনকে পাঠাচ্ছি। ডারড্যান্ট ভ্যালির পরে যে মরুভূমি, সেখানেও পাঠিয়েছি কয়েকজনকে। তারা এখনও ফেরেনি।'

'যারা যাচ্ছে, তাদেরকে বলে দিন আশ্চর্যবোধক চিহ্ন খুঁজতে।'

'কি খুঁজতে?'

'আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। খনির দেয়ালে আঁকা থাকতে পারে। পেলেই যেন আপনাকে জানায়।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না···'

'ফোনে ব্যাখ্যা করতে পারব না,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'আমি আসছি। এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাবেন, প্লীজ? সঙ্গে রবিনের বাবাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠাব। ছেলেগুলোকে এখন ভালয় ভালয় ফিরে পেলে বাঁচি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। তারপর রবিনের বাবাকে ফোন করল। বাড়িতেই পাওয়া গেল তাঁকে। সব শুনে কিশোরের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, পত্রিকার একটা জরুরী কাজে বেরোচ্ছেন, এয়ারপোর্টে দেখা করবেন।

দ্রুত তৈরি হয়ে নিল কিশোর। বোরিসকে এসে জানাল মুসা আর রবিনের নিখোঁজ হওয়ার খবর। স্যালভিজ ইয়ার্ডের ভার তার ওপর দিয়ে রওনা হলো বিমানবন্দরে। বোরিসই ছোট ট্রাকটা নিয়ে তাকে প্লেনে তুলে দিয়ে আসতে চলল।

'গাড়িতে বসে ভাবছে কিশোর। মিস নিনারা কৌন যত সহজ ভাবছেন, তত সহজে রবিন, মুসা আর মিঙকে পাওয়া যাবে বলে মনে হলো না তার।

কিশোরের অনুমান মিথ্যে নয়।

মদের বড় বড় দুটো জালায় ভরা হলো রবিন আর মিঙকে। ট্রাকে তুলে নিয়ে চলল মরিসন আর দলের লোকেরা। কোথায়, জানে না দু'জনে।

'গলার' এপাশে অন্ধকার গুহায় থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ মুসা। বুঝতে পারছে, রবিন আর মিঙকে যারাই বন্দি করে থাকুক, তারা বড় মানুষ, ফাটলে ঢুকতে পারবে না, নইলে এতক্ষণে ঢুকে পড়ত। সে এখন কি করবে?

এখানে থেকে লাভ নেই। আবার হ্যাশনাইফ ক্যানিয়নে ফিরে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে সকাল পর্যন্ত। তাদের খুঁজতে লোক নিশ্চয়ই পাঠাবেন মিস কৌন। তখন রবিন আর মিঙকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে।

নেকলেস ভরা টর্চটা কোমরের বেল্টেই গোঁজা রয়েছে, তাতে হাত বোলাল মুসা। মনে মনে আল্লাহকে ডাকল ঃ যেন হাতের টর্চটার ব্যাটারি না ফুরোয়, অন্তত সে না বেরোনোর আগে।

রবিনের কথা এইবার ফলল, কাজে লাগল চিহ্ন। সবুজ চকে আঁকা চিহ্ন ধরে ধরে ফিরে চলল সে। সত্যিই তীর আর আশ্চর্যবোধকের গোলকধাঁধা সৃষ্টি করে

রেখেছে রবিন, মুসাও একবার ভুল করে বসল। ভুল সুড়ঙ্গ ধরে চলে এল সেই গুহায়, যেটাতে গাধা মরেছে।

শাদা হাড়গুলোর ওপর একবার আলো ফেলেই ফিরল মুসা। পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। আচ্ছা, নেকলেসটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে কেন? যদি ধরা পড়ে যায়? তার চেয়ে লুকিয়ে রাখা কি ভাল নয়? ধরে ফেললেও হারটার লোভে ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হবে মরিসন।

হ্যাঁ, ভাল কথা মনে হয়েছে, তাই করবে সে। কিন্তু লুকাবে কোথায়? কোন পাথরের তলায়? না, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। সবগুলো পাথরই দেখতে প্রায় এক রকম। নিশানা ভুল করে ফেললে শেষে আর নিজেই খুঁজে বের করতে পারবে না। এমন কোথাও রাখা দরকার, যেখানে রাখলে ভুল করবে না, আবার, শত্রুরাও খুঁজে পাবে না সহজে।

কোথায় তেমন জায়গা? গাধার হাড়গুলোর ওপর আলো ফেলল সে আবার। ঘুরিয়ে এনে স্থির করল খুলিটার ওপর। হ্যাঁ, এটাই ঠিক জায়গা। খুঁজে পেতে তার কোন অসুবিধে হবে না, অথচ শত্রুরা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করবে না।

টর্চ থেকে খুলে হারটা কাগজের মোড়কমুক্ত করতে সময় লাগল না। খুলিটা উল্টে একটা খোড়লে নেকলেস ভরে আবার আগের মত করে ফেলে রাখল।

সঠিক সুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করায় মন দিল সে। এই সময় আরেকটা ভাবনা খেলে গেল মনে। খালি টর্চটা সঙ্গে বয়ে বেড়ানোর কোন কারণ নেই। তার চেয়ে···কথাটা কেন তার মনে এল, নিজেই বলতে পারবে না। কয়েকটা পাথর ভরে কোথাও লুকিয়ে রাখবে টর্চটা, সময়ে কাজে লেগেও যেতে পারে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কয়েকটা পাথর রেখে পোঁটলা করে ঠেসে ভরল টর্চের ভেতর। পেছনের ক্যাপটা আবার লাগিয়ে একটা পাথরের আড়ালে রেখে দিল টর্চটা। পাথরটার কয়েক ফুট দূরে ছোট ছোট পাথর দিয়ে একটা স্তূপ তৈরি করল, নিশানা। দরকার লাগলে এসে খুঁজে বের করে নিতে পারবে আবার টর্চটা।

সুড়ঙ্গ ধরে আবার চলতে শুরু করল মুসা। এসে পড়ল সেই সঙ্কীর্ণ জায়গাটায়। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। একটা জায়গায় এসে শুয়ে পড়ে ক্রল করে এগোতে হলো।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে রয়েছে পাহাড়ের তলায়। খালি হয়ে আসছে সেটা জানান দিতে শুরু করেছে পাকস্থলী। এই অন্ধকারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। আরেকবার প্রার্থনা করল সে, যেন টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে না যায়। তাড়াতাড়িও করতে পারছে না। জানে, যে অবস্থায় রয়েছে, তাড়াহুড়ো করলে, কিংবা মাথা গরম করলে, আরও বেশি বিপদে পড়ে যেতে পারে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরেসুস্থে কাজ করাই এখন বাঁচার একমাত্র উপায়।

টর্চ হাতে ক্রল করতে অসুবিধে হচ্ছে। বেল্টের পাশে জ্বলন্ত অবস্থায় ওটা গুঁজে রাখল সে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ খটাস করে তার মাথার সামনে পড়ল একটা পাথর, ছোট। চমকে উঠল সে। ভয়ে ভয়ে তাকাল মাথার ওপর নেমে আসা ছাতের দিকে। ধসে পড়ছে না

তো? এখানে ছাত ধসে পড়ার মানে জ্যান্ত কবর হয়ে যাওয়া। পেটের তলায় মাটিতে কম্পন অনুভূত হলো। দম বন্ধ করে পড়ে রইল সে, বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে।

যেমন সহসা শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল কম্পনটা। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে মাথার কাছ থেকে পাথরটা এক পাশে সরিয়ে দিল মুসা।

মিনিট খানেক চুপচাপ অপেক্ষা করল সে, তারপর আবার চলতে শুরু করল। কাঁপুনিটা কেন শুরু হয়েছিল, বুঝতে পেরেছে। কোথাও ছোটখাট ভূমিকম্প হয়ে গেছে, তারই রেশ এসে পৌঁছেছে এখানে।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রায় সবাই জানে, মুসাও জানে, বিখ্যাত স্যান অ্যানড্রিয়াস ফল্ট—পাথুরে ভূত্বকের এক মস্ত চিড়—চলে গেছে পশ্চিম ক্যালিফোর্নিয়ার নিচ দিয়ে। উনিশশো ছয় সালে ওই ফল্টের কারণেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল স্যান ফ্রান্সিসকোয়। উনিশশো চৌষট্টি সালে আলাসকায় মহাভূমিকম্প ঘটিয়েছিল, ওটাই। সে সময় ওখানকার ভূপৃষ্ঠ কোথাও কোথাও তিনশো ফুট ঠেলে উঠেছিল, কোথাও বসে গিয়েছিল তার চেয়ে বেশি। প্রতি বছরই কমবেশি ভূমিকম্প হয় ওই ফল্টের কারণে, বছরে অসংখ্যবার, তবে তেমন মারাত্মক নয়।

জোরে জোরে দম নিচ্ছে মুসা। পেরিয়ে এল সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ। চিহ্ন ধরে ধরে চলে এল সেই গুহাটায়, যেটা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল।

গুহাটা খালি। নীরব। বাইরে অন্ধকারের কালো চাদর, রাত নেমেছে।

সাবধানে, নিশব্দে গুহামুখের দিকে এগোল সে। টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে। কয়েক কদম এগিয়েই থেমে কান পেতে শুনছে সন্দেহজনক শব্দ পাওয়া যায় কিনা। আশা করছে, এখনও গুহামুখটা খুঁজে পায়নি শত্রুরা।

গুহামুখের বাইরে বেরোল মুসা। তাকাল তারাজ্বলা আকাশের দিকে।

এই সময় পাথরের আড়াল থেকে কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। শক্তিশালী বাহু জড়িয়ে ধরল তাকে, মুখ চেপে ধরল একটা কঠিন থাবা।

বারো

একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছে মিঙ আর রবিনকে। জানালা নেই, শুধু একটা দরজা, তা-ও তালা দেয়া, চেষ্টা করে দেখেছে দু'জনে, খুলতে পারেনি।

দু'জনেরই কাপড়ে বালি, ময়লা, সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দেয়ার সময় লেগেছে। ঝেড়েমুছেও বিশেষ সুবিধে হয়নি, সাফ হয়নি ময়লা। দু'জনেই গোসল করে নিয়েছে। শুধু তাই না, ভরপেট খেয়েছেও। চমৎকার রান্না করা চীনা খাবার।

খিদের জন্যে কথা বলার ইচ্ছেই হয়নি এতক্ষণ, পেট ঠাণ্ডা হতে আরাম করে বসে আলোচনা শুরু করল।

'আছি কোথায় কে জানে?' বলল রবিন, গত কয়েক ঘণ্টার উত্তেজনা অনেকখানি দূর হয়ে গেছে।

'বড় কোন শহরের তলায়,' বলল মিঙ। 'স্যান ফ্রানসিসকো হতে পারে।'

'কি করে বুঝলে? চোখ বেঁধে এনেছে, আমি তো কিছুই দেখিনি, তুমি

দেখেছিলে?'

'না। অনুমান। মাঝে মাঝেই ছাত কেঁপে উঠছে, খেয়াল করছ না? ট্রাক যাচ্ছে ওপর দিয়ে। আর ট্রাক মানেই বড় শহর। চীনা চাকরেরা এই ঘরে নিয়ে এসেছে আমাদের, চীনা খাবার খাইয়েছে। সারা আমেরিকায় স্যান ফ্রানসিসকোতেই রয়েছে সবচেয়ে বড় চায়না টাউন। কোন মস্ত বড় লোকের বাড়িতে বন্দি হয়েছি আমরা।'

'কি করে জানলে?'

'খাবার। রান্না দেখোনি কি চমৎকার? এত ভাল রাঁধতে হলে খুব ভাল বাবুর্চি দরকার, আর সে-রকম বাবুর্চি রাখতে অনেক টাকা লাগে।'

'কিশোরের সহকারী তোমারই হওয়া উচিত ছিল,' আন্তরিক প্রশংসা করল রবিন। 'রকি বীচে থাকলে তোমাকে দলে নিয়ে নিত সে।'

'আমিও খুশি হয়ে যোগ দিতাম। ভারড্যান্ট ভ্যালিতে বড় একা একা লাগে, আমার বয়েসী কেউ নেই তো। হঙকঙে খুব আরামে ছিলাম, বন্ধুরা ছিল, কত খেলেছি। কিন্তু দাদীমার ওখানে···আর খেলার কথা ভেবে কি হবে, এখন হঙকঙও যা, ভারড্যান্ট ভ্যালিও তা।'

মিঙের কথা বুঝতে পারছে রবিন। এখান থেকে বেরোতেই যদি না পারে, কোন জায়গা ভাল আর কোন জায়গা খারাপ, তা দিয়ে কি হবে?

দরজা খোলার শব্দে ভাবনায় বাধা পড়ল। এক বুড়ো চীনা, পরনে প্রাচীন চীনের পোশাক, দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

'এসো,' ডাকল লোকটা।

'কোথায়?' গম্ভীর হয়ে বলল মিঙ।

'বন্দির কোন প্রশ্ন করা উচিত নয়। এসো।'

দৃঢ়, বলিষ্ঠ পায়ে এগিয়ে গেল মিঙ, তাকে অনুসরণ করল রবিন।

বুড়ো চীনার পেছনে পেছনে লম্বা করিডর পেরিয়ে খুদে একটা লিফটে উঠল ওরা। অনেক উপরে উঠে একটা লাল দরজার সামনে থামল লিফট। দরজা খুলে পাশে সরে দাঁড়াল বুড়ো, হাত নেড়ে বলল, 'যাও। যা যা জিজ্ঞেস করা হবে, ঠিক ঠিক জবাব দেবে, যদি ভাল চাও।'

বিশাল এক গোল হলরুমে ঢুকল ওরা। দেয়াল ঢাকা মূল্যবান কাপড়ে, সোনালি সুতো দিয়ে সুচের নানা রকম কাজ ঃ ড্রাগন, চীনা মন্দির, উইলো গাছ, আর আরও নানারকম সুদৃশ্য ছবি। এক জায়গায় কিছু উইলো গাছ ঝড়ে দুলছে, একেবারে জ্যান্ত মনে হয়।

'খুব পছন্দ হয়েছে, না?' হালকা, বয়স্ক কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠস্বর। 'পাঁচশো বছর আগের তৈরি।'

ফিরে চেয়ে দেখল, ওরা একা নয়। কারুকাজ করা বিরাট এক কাঠের চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। কালো রঙ করা চেয়ার, কোমল পুরু গদি।

বৃদ্ধের পরনে ঢোলা আলখেল্লা, প্রাচীন চীনা সম্রাটরা যেমন পরতেন। ছোট্ট, হলদেটে মুখ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

'এগোও,' শান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি, 'খুদে বিচ্ছুর দল। অনেক ঝামেলা করেছ। বসো।'

গালিচার ওপর দিয়ে হেঁটে এল ছেলেরা, এত পুরু যে গোড়ালি ডুবে যায়। ছোট দুটো টুল আছে, ওদের জন্যেই এনে রাখা হয়েছে বোধহয়। বসল। অবাক হয়ে তাকাল বৃদ্ধের দিকে।

'আমি হুয়াঙ। বয়েস একশো সাত।'

বিশ্বাস করল রবিন। এত বয়স্ক লোক আর দেখেনি। বয়েসের তুলনায় বেশ তাজা এখনও মিস্টার হুয়াঙ।

'খুদে ঝিঁঝি পোকা,' মিঙের দিকে চেয়ে বলল বৃদ্ধ, 'আমার দেশী রক্ত বইছে তোমার শরীরে। পুরানো চীনের কথা বলছি, আধুনিক চীন নয়। তোমার পূর্বপুরুষ মিশেছিল তাদের সঙ্গে। তোমার দাদার বাবা আমাদের রাজকুমারীকে নিয়ে এসেছিল। আসুক। মেয়েমানুষের ব্যাপারে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, যাকে পছন্দ হয়েছে তার সঙ্গে এসেছে। কিন্তু তোমার দাদার বাবা জিনিস চুরি করেছিল। গোস্ট পার্ল।'

এই প্রথম উত্তেজনার চিহ্ন দেখা গেল তাঁর চেহারায়।

'মহামূল্যবান মুক্তোর একটা মালা,' আবার বললেন মিস্টার হুয়াঙ। 'প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর লুকানো ছিল জিনিসটা, আবার বেরিয়েছে। ওটা এখন আমার চাই-ই।' সামান্য সামনে ঝুঁকলেন। জোরাল হলো কণ্ঠ, 'শুনছ খুদে ইঁদুরের ছানা? মালাটা আমার চাই।'

ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে রবিন, কারণ, নেকলেসটা তাদের কাছে নেই। চাইলেই মিস্টার হুয়াঙকে দিয়ে দিতে পারছে না।

মিঙ বলল, 'জনাব, জিনিসটা আমাদের কাছে নেই। আরেকজনের কাছে। হরিণের গতি তার, সিংহের হৃদয়, নেকলেসটা নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয় চলে গেছে আমার দাদীমার কাছে। আমাদের বাড়ি যেতে দিন, দাদীমাকে বলব ওটা আপনার কাছে বিক্রি করে দিতে। তবে, আমার চীনা বড় মায়ের কোন আত্মীয় এসে যদি দাবি করে।'

'করবে না,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মিস্টার হুয়াঙের কণ্ঠ, 'কারণ তেমন কেউ নেই। অন্য লোকের কারসাজি রয়েছে এতে, ব্যাপারটা ঘোরাল করে নেকলেস দখল করতে চায়। খুব ধনী এক লোক, আমার চেয়ে অনেক ধনী। একবার ওর হাতে চলে গেলে আর আমি পাব না।'

বাউ করল মিঙ। মিস্টার হুয়াঙের সম্বোধন নকল করে নিরীহ কণ্ঠে বলল, 'আমরা খুদে ইঁদুরের ছানা, অসহায় বটে, কিন্তু আমাদের বন্ধু বাঘের বাচ্চা। ওর কাছে আছে নেকলেস। পালিয়ে যাবেই। ধনী লোকটার হাতে মালা পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।'

'মরবে!' চেয়ারের হাতলে টাট্টু বাজাল মিস্টার হুয়াঙের আঙুল। 'ওকে যারা পালাতে দেবে, তারা মরবে।'

'আমাদের প্ল্যান বুঝে ফেলেছিল আপনার লোক,' বলল মিঙ। 'ফাটলের

কাছাকাছিই ছিল। তবে আমার মুখ চেপে ধরার আগে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিতে পেরেছি আমার বন্ধুকে। তাকে আর ধরতে পারবে না। মরিসন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এত মোটা, ফাটলে ঢুকতেই পারবে না।'

'ঢুকতে তাদের হবেই,' বললেন মিস্টার হুয়াঙ। 'কাল রাতে নেকলেসটা হাতিয়ে নেয়ার পর টেলিফোন করল আমাকে মরিসন, জিনিস পাওয়া গেছে। তখনই হুঁশিয়ার করেছি, গোস্ট পার্ল হাতছাড়া করা চলবে না···'

থেমে গেলেন তিনি। কোথাও বেল বেজে উঠেছে। রবিনকে অবাক করে দিয়ে চেয়ারের গদির তলা থেকে ফোনের রিসিভার বের করে এনে কানে ঠেকালেন। চুপচাপ শুনে আবার রেখে দিলেন আগের জায়গায়।

'অবস্থার উন্নতি হয়েছে।'

নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন মিস্টার হুয়াঙ।

কি ব্যাপার? কৌতূহলে ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ছে রবিন। কি ঘটেছে? হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন কেন মিস্টার হুয়াঙ। তাঁর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা দেখিয়ে চমকে দিতে চাইছেন রবিন আর মিঙকে।

সম্ভব-অসম্ভব অনেক কথাই ভাবল রবিন, একটা কথা বাদে।

খুলে গেল লাল দরজা।

সারা গায়ে ধুলো-ময়লা, ফেকাসে চেহারা, টলোমলো পায়ে ঘরে এসে ঢুকল মুসা আমান।

তেরো

'মুসাআ!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন আর মিঙ। 'তুমি ঠিক আছ?'

'খুব খিদে লেগেছে,' করুণ হয়ে উঠল মুসার চেহারা। 'হাতটা ব্যথা করছে। মরিসনের বাচ্চা মুচড়ে ধরেছিল, নেকলেসটা কোথায় রেখেছি বলিনি, সে জন্যে।'

'হারটা তাহলে লুকিয়ে ফেলেছ?' উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'কাউকে বলোনি তো?' যোগ করল মিঙ।

'নাআ, বলিনি,' হাসি ফুটল মুসার চোখে। 'গুহায় লু···'

'চুপ!' চেঁচিয়ে উঠল মিঙ। 'বোলো না। শুনছে।'

নীরব হয়ে গেল মুসা। এই প্রথম চোখ পড়ল মিস্টার হুয়াঙের ওপর।

'তুমি খুদে ইঁদুর নও,' মিঙের দিকে চোখ ফেরালেন মিস্টার হুয়াঙ, 'ভুল বলেছি। তুমি একটা ড্রাগনের বাচ্চা, ঠিক তোমার দাদার-বাপের মত, হাড়ে হাড়ে শয়তান।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে কি ভাবলেন, তারপর তিন কিশোরকে অবাক করে দিয়ে যেন বোম ফাটালেন, 'তুমি আমার ছেলে হবে? পালকপুত্র? আমি ধনী, অনেক টাকার মালিক, কিন্তু আমার ছেলেপুলে নেই। তোমার মত একটা ছেলে পেলে···হবে? আমার সব সম্পদ দান করে দিয়ে যাব। আরামে কাটাতে পারবে বাকি জীবন।

'হতে পারলে খুব খুশিই হতাম,' শান্ত কণ্ঠে বলল মিঙ। 'কিন্তু দুটো খারাপ কাজ করতে হবে আমাকে।'

'কি কি?'

'একঃ আমার বন্ধুদের সঙ্গে বেঈমানী করে গোস্ট পার্ল আপনার হাতে তুলে দিতে হবে।'

মাথা ঝোঁকালেন মিস্টার হুয়াঙ। 'আমার ছেলে হলে সেটা তোমার কর্তব্য।'

'দুই নম্বরঃ নেকলেসটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকথা আপনি ভুলে যাবেন, আমাকে পালকপুত্র করার ধারেকাছেও যাবেন না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার হুয়াঙ। 'আমি বলামাত্র যদি রাজি হয়ে যেতে, হয়তো ভুলে যেতাম। কিন্তু এখন? এখন সত্যিই তোমাকে ছেলে হিসেবে পেতে চাই।'

'না মিস্টার হুয়াঙ, মাপ করবেন। দুনিয়ার তাবৎ ধনের বিনিময়েও বন্ধুদের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারব না আমি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন মিস্টার হুয়াঙ, 'রাজি হলে ভাল করতে। যাকগে। মনের ওপর তো আর জোর চলে না। তবে দরকার হলে নেকলেস আমি জোর করেই আদায় করব।' গদির তলায় হাত দিয়ে চেয়ারে লাগানো গোপন কুঠুরি থেকে একটা ছোট বোতল, কাচের গেলাস আর গোল একটা জিনিস বের করে আনলেন। 'কাছে এসো, দেখে যাও।'

কাছে এসে দাঁড়াল তিন কিশোর।

মিস্টার হুয়াঙের বৃদ্ধ, শীর্ণ হাতের তালুতে ধূসর রঙের একটা গোল জিনিস, অনেকটা মার্বেলের মত, তবে অত মসৃণ নয়।

জিনিসটা চিনল মিও। 'একটা গোস্ট পার্ল।'

'ভুল নাম দেয়া হয়েছে জিনিসটার,' বলে বোতলের ছিপি খুলে তার ভেতর মুক্তোটা ফেলে দিয়ে ঝাঁকাতে লাগলেন মিস্টার হুয়াঙ। বুদবুদ উঠল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর গলে বোতলের তরল পদার্থের সঙ্গে মিশে গেল।

'এর নাম রাখা উচিত ছিল,' বোতলের তরল জিনিসটা গেলাসে ঢালতে ঢালতে বললেন মিস্টার হুয়াঙ, 'লাইফ পার্ল।'

গেলাসের তরল পদার্থটুকু এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন তিনি, যেন ওষুধ খেলেন, একটা ফোঁটাও রাখলেন না। গেলাসটা আবার রেখে দিলেন গদির নিচে গোপন কুঠুরিতে। 'একটা কথা অনেকেই জানে না,' বললেন তিনি, 'হাতে গোণা কয়েকজনে শুধু জানে, তারা সবাই ধনী, জ্ঞানী। দুনিয়ার লোক জানে গোস্ট পার্ল খুব দামী। কিন্তু কেন দামী জানে? জানে না। সাধারণ মুক্তোর মত সুন্দর নয় এই পার্ল, বরং কুৎসিতই বলা যায়। মনে হয় যেন মৃত কিছু। এজন্যেই এর নাম হয়েছে গোস্ট পার্ল।'

মিস্টার হুয়াঙ কি বলতে চাইছেন, কিছুই বুঝতে পারছে না তিন কিশোর, চুপ করে রইল ওরা।

'কয়েকশো বছরে,' বলে গেলেন বৃদ্ধ, 'মাত্র কয়েকটা গোস্ট পার্ল পাওয়া গেছে, ভারত মহাসাগরের একটা বিশেষ জায়গায়। সেটাও অনেক দিন আগের কথা, তারপর আর একটাও ওরকম মুক্তো পাওয়া যায়নি। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে মাত্র

ছ'টা গোস্ট পার্ল আছে, আর পাঁচটাই প্রাচ্যের লোকের কাছে, খুব কড়া পাহারায়। ওদের একেকজনের কত টাকা আছে, নিজেরাই জানে না। কিন্তু ওই কুৎসিত জিনিসগুলোর এত কদর কেন? কারণ,' নাটকীয় ভাবে থামলেন তিনি। 'ওই মুক্তো খেলে আয়ু বাড়ে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল তিন কিশোরের। যা বলছেন, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন বলেই বলছেন মিস্টার হুয়াঙ।

লম্বা দম নিয়ে আবার বললেন তিনি, 'শত শত বছর আগেই ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হয়েছে চীনে। প্রথমে জানত শুধু রাজ-রাজড়ারা, তারপর জানল বড় বড় জমিদারেরা, তারপর কিছু বড় ব্যবসায়ী—আমার মত লোকেরা। আমার বয়েস একশো সাত, এত দিন কি ভাবে বেঁচেছি জানো। মুক্তো খেয়ে, গোস্ট পার্ল, একশোটার মত খেয়েছি।' তাঁর কালো কুতকুতে চোখের তারা মিঙের ওপর নিবদ্ধ হলো। 'বুঝতে পারছ খুদে ড্রাগন, কেন নেকলেসটা আমার চাই? একেকটা মুক্তো তিন মাস করে আয়ু বাড়ায়, নেকলেসটাতে আছে আটচল্লিশটা মুক্তো, তার মানে আরও বারো বছর বাড়তি জীবন!' কণ্ঠস্বর চড়ছে তাঁর। 'মুক্তোগুলো আমার চাই, যে করেই হোক, কিছুই আমাকে ঠেকাতে পারবে না। আমার পথে বাধা হলে ধুলোর মতই ঝেড়ে ফেলে দেব তোমাদেরকে। আরও বারো বছর জীবন···বুঝতেই পারছ কত মূল্যবান আমার জন্যে।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল মিঙ। মুসা আর রবিনের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'ফালতু হুমকি দিচ্ছে না। যা বলছে, করবে। দেখি দর কষাকষি করে।'

'দর কষাকষি করবে?' শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর মিস্টার হুয়াঙের, মিঙের কথা সব শুনেছেন। 'ঠিক প্রাচ্যের লোকের মত কথা বলেছ। ন্যায্য দর কষাকষিতে উভয় দিকই রক্ষা হয়। বলে ফেলো।'

'নেকলেসটা কোথায় আছে, মুসা যদি বলে, কিনে নেবেন? না না, আমার জন্যে বলছি না, টাকাটা দাদীমাকে দেবেন?'

মাথা নাড়লেন মিস্টার হুয়াঙ। 'টাকা দিয়ে দিয়েছি মরিসনকে, তাকে দেব বলেছিলাম, দিয়েছি। তবে,' মিঙের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে করতে বললেন, 'একটা কাজ করতে পারি। তোমার দাদীমা আঙুর খেত আর মদের কারখানা আমার কাছে বন্ধক রেখেছে। আমি তোমার দাদীমাকে সময় বাড়িয়ে দিতে পারি টাকা শোধ করার জন্যে, ছোট ছোট কিস্তিতে দেয়ার পরামর্শ দিতে পারি। কথা দিতে পারি, ভূতটা আর দেখা দেবে না। শ্রমিকেরা ফিরে এসে কাজে লাগবে, তোমার দাদীমা ভরাডুবির হাত থেকে রেহাই পাবে।'

চোখ মিটমিট করল তিন কিশোর।

'কার ভূত জানেন তাহলে?' চেঁচিয়ে উঠল মিঙ। 'কি করে জানলেন।'

মৃদু হাসলেন মিস্টার হুয়াঙ। 'ছোট ছোট অনেক বিদ্যেই জানা আছে আমার। নেকলেসটা কোথায় আছে মরিসনকে দেখিয়ে দাওগে, তোমার দাদীমার সব দুঃখ শেষ।'

'শুনতে ভালই লাগছে,' মাথা ঝোঁকাল মিঙ। 'কিন্তু বিশ্বাস কি?'

অবচেতনভাবে রবিন আর মুসাও মাথা ঝোঁকাল. এই প্রশ্ন তাদের মনেও।

'আমি মিস্টার হুয়াঙ,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর, 'আমার দেয়া কথা ইস্পাতের চেয়েও শক্ত।'

'ওনাকে জিজ্ঞেস করো, মিঙ,' বলল রবিন, 'মরিসনকে বিশ্বাস কি?'

'ঠিক,' সায় দিল মুসা। 'মরিসন যা বলে, করে ঠিক তার উল্টো। কেউটে সাপকে বরং বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু ওকে নয়।'

দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন মিস্টার হুয়াঙ, 'মরিসনকে আসতে বলো।'

দীর্ঘ দুই মিনিট অপেক্ষা করে রইল ছেলেরা। খুলে গেল লাল দরজা। লিফট থেকে নামল মরিসন। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, হাবভাবে অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছে।

'মুখ খুলেছে?' ছেলেদের দিকে বুড়ো আঙুলের ইঙ্গিত করে মিস্টার হুয়াঙকে জিজ্ঞেস করল মরিসন।

'ভদ্রভাবে কথা বলো।' গর্জে উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ। 'ওদেরকে অবহেলা করবে না। তোমার মত নর্দমার কীট নয় ওরা। ড্রাগনের বাচ্চার সঙ্গে ক্রিমির যে-রকম ব্যবহার করা উচিত, তেমন ব্যবহার করো।'

রাগে লাল হয়ে গেল মরিসনের মুখচোখ, কিন্তু মিস্টার হুয়াঙের কালো চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ফেকাসে হয়ে গেল চেহারা, মড়ার মুখের মত ফেকাসে। 'সরি, মিস্টার হুয়াঙ, আমি জানতে চাইছিলাম।'

'তোমার চাওয়া না চাওয়ায় কিছুই এসে যায় না,' ধমকে উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ। 'যা হুকুম করব, পালন করবে। শোনো, আজ রাতে ওরা যদি নেকলেসটা তোমার হাতে তুলে দেয়, কোন ক্ষতি করবে না ওদের। বেঁধে রাখতে পারো, তবে খুব শক্ত করে নয়। এমনভাবে বাঁধবে, যাতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিজেরাই বাঁধন মুক্ত হতে পারে। ভালমত শুনে রাখো, ওরা একটা আঘাত পেলে, তোমাকে একশোটা আঘাত করা হবে। আমার আদেশ অমান্য করলে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হবে তোমাকে।'

কয়েকবার ঢোক গিলল মরিসন, তারপর বলল, 'ভারড্যান্ট ভ্যালিতে লোক গিজগিজ করছে, গরুখোঁজা খুঁজছে। অনেক কষ্টে ওদের নজর হ্যাশনাইফ ক্যানিয়ন থেকে অন্য দিকে সরাতে পেরেছি। ছেলেগুলোকে আবার ওখানে নিয়ে গেলে...'

'ওখানে ওদের কে নিতে বলেছে তোমাকে? নেকলেসটা কোথায় আছে জেনে নিলেই তো হয়। তারপর তোমার সুবিধেমত জায়গায় নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখো। এমন কোথাও যেখানে থেকে ওদের বাড়ি ফেরা সহজ হয়।'

উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ। ঢোলা আলখেল্লার নিচটা গাউনের মত ছড়িয়ে রইল। বসা অবস্থায় বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু এখন দেখা গেল, লম্বা নন তিনি, বেঁটেই বলা চলে, পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি।

'এসো,' মরিসনকে ডাকলেন তিনি। 'ওরা এখানেই থাকুক। নিজেদের মাঝে আলোচনা করে ঠিক করুক কি করবে। বুদ্ধি আছে ওদের, আমার ধারণা, ঠিক সিদ্ধান্তই নেবে।'

মিস্টার হুয়াঙের পেছনে বেরিয়ে গেল মরিসন।

চোদ্দ

'আস্তে কথা বলবে,' ফিসফিস করে বলল মিঙ। 'মুসা, নেকলেসটা কোথায়, উচ্চারণও করবে না। লুকানো মাইক্রোফোন নিশ্চয় আছে। অন্য কথা বলো, সময় নষ্ট করো।'

'নেকলেসটা লুকিয়ে কাজের কাজ করেছি,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মুসা, 'অন্তত সময় তো পাওয়া গেল। নইলে তো গেছিলাম।...তোমরা ধরা পড়লে কিভাবে?'

'লুকিয়েছিল ব্যাটারা,' বলল মিঙ। 'আমাকে বেরোতে দেখেছে। আমি রবিনকে টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিয়েছি, তা-ও দেখেছে। রবিন বেরোতেই এসে আমাকে আর রবিনকে জাপটে ধরেছে।'

'এবং গাধামী করেছে,' রবিন বলল। 'অপেক্ষা করা উচিত ছিল ওদের। মুসা বেরোলে তারপর ধরা উচিত ছিল।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'মিঙ চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করল। বুঝলাম, কিছু হয়েছে। তারপর টর্চ জ্বালল তিনবার, ওতেও গোলমাল লক্ষ্য করলাম। আর কি বেরোই!' হাসল সে। 'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, আমরা কোথায় আছি, সেটা জানল কি করে?'

'ঘোড়া নিয়ে এসে পাহাড়ে চড়েছিল মরিসন,' বলল মিঙ। 'আমাদেরকে হ্যাংনাইফ ক্যানিয়ন পেরিয়ে যেতে দেখেছে। অনুমান করে নিয়েছে আমরা কি করতে যাচ্ছি। ওর জানা আছে গলাটার কথা।' বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'আমি ভেবেছি আমি খুব চালাক। অথচ সোজা এসে মরিসনের খপ্পরে পড়লাম।'

'আমাদেরকে ক্যানিয়ন পেরিয়ে যেতে না দেখলে ধরতে পারত না,' মুসা বলল, 'সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তোমার আর কি করার ছিল? যাকগে, যা হবার হয়েছে। একটা ব্যাপারে তো শিওর হলে, মরিসন বেঈমান। মেশিনপত্র সে-ই ভেঙেছে, ইচ্ছে করে, মদের পিপা ফুটো করে দিয়েছে। সব তার শয়তানী।'

'হ্যাঁ,' বলল মিঙ। 'ও আর ওর সাঙ্গোপাঙ্গরাই করেছে। কিন্তু কেন? এসব তো শুরু করেছে বছর খানেক আগে থেকে, ভূত দেখা যায়নি তখনও। ভারড্যান্ট ভ্যালিতে গোস্ট পার্লের কথা ওখানকার কেউ জানত না তখন।'

'নিশ্চয় আছে কোন কারণ,' বলল রবিন। 'আমাদেরকে কিভাবে এনেছে, শোনো। পিপায় ভরে ট্রাকে করে এনেছে। একটা জায়গায় এসে থামল ট্রাক, মরিসনের সঙ্গে কথা বলল কয়েকজন লোক। কথাবার্তায়ই বুঝলাম, তাদেরকে পাঠিয়েছেন মিঙের দাদীমা, আমাদের খুঁজতে। ওরা নিশ্চয় কল্পনাও করেনি, ওদের কয়েক হাতের মধ্যেই রয়েছি আমরা।'

'চেঁচালে না কেন?' বলল মুসা।

'মুখ বেঁধে রেখেছিল,' বলল মিঙ। 'চালাক আছে মরিসন। মদের পিপায় মানুষ রয়েছে কে ভাববে? তাছাড়া তাকে সন্দেহও করে না কেউ। সে বলল, স্যান ফ্রানসিসকোর দিকে যাচ্ছে, আমাদের খুঁজতে। আমাদের না নিয়ে ফিরবে না। কাজেই তার অনুপস্থিতিতে সন্দেহ করবে না কেউ।'

'হুঁ, ব্যাটা চালাকই,' স্বীকার করল মুসা।

'স্যান ফ্রানসিসকোর পথে কয়েক মাইল চলল ট্রাক,' আবার বলল মিঙ, 'তারপর থামল। মদের পিপা থেকে বের করে একটা স্টেশন ওয়াগনে তোলা হলো আমাদের। পেছনে শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। আমার ধারণা, হ্যাশনাইফ ক্যানিয়নের দিকে যে আমরা গেছি তার সব চিহ্ন মুছে দিয়েছে মরিসন। ঘোড়াগুলোও নিশ্চয় সরিয়ে ফেলেছে। ভেবেছিলাম, তোমাকে ধরতে পারবে না, কিন্তু ধরে ফেলল। নেকলেসটা ছিনিয়ে নেবে এখন!'

'তা পারছে না। নেকলেস আমি দেব না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মুসা।

'না দিয়ে পারবে না।'

'সেটা দেখা যাবে,' নিজের দুই হাতের দিকে তাকাল মুসা। 'আপাতত হাতমুখ ধোয়ার পানি যদি পেতাম, আর কিছু খাবার। পেট জ্বলছে। গুহায় বসে কি খেয়েছি না খেয়েছি, কখন হজম হয়ে গেছে। আর যা কষ্ট করেছি বেরোতে! ভাগ্যিস রবিন চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল, নইলে বেরোতেই পারতাম না।'

ফিসফিস করে বলল রবিন, 'যে দুটো পিপায় ভরা হয়েছিল আমাদেরকে, এক সুযোগে সে দুটোতেও চিহ্ন এঁকে দিয়েছি।'

'তাতে কি?' নিচু গলায় বলল মুসা। 'কিচ্ছু বুঝবে না কেউ। কিশোরও বুঝবে কিনা সন্দেহ।'

'ফিসফিসানি বাদ দাও,' বলল মিঙ। 'স্বাভাবিক গলায় কথা বলো, নইলে সন্দেহ করবে আমরা ফন্দি আঁটছি।'

'ফন্দি আর কি করব?' হতাশ ভঙ্গিতে দু'হাত নাড়ল মুসা। 'মিস্টার হুয়াঙের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া মুশকিল।'

'আমারও তাই ধারণা,' মাথা দোলাল মিঙ। 'বোঝাই যাচ্ছে, অনেক বড়লোক তিনি, প্রচণ্ড ক্ষমতা। একটাই উপায় আছে আমাদের, নেকলেসটা তাঁকে দিয়ে দেয়া।'

'এত সহজেই দিয়ে দিতে বলছ?' ভুরু কুঁচকাল মুসা। ভাবছে, কি কষ্ট করেই না লুকিয়েছে নেকলেসটা। এত কিছুর পর, মিস্টার হুয়াঙকে দিয়ে দিতে হবে?

'মুফতে তো দিচ্ছি না,' মুসার হতাশা দূর করার চেষ্টা করল মিঙ। 'মিস্টার হুয়াঙ কথা দিয়েছেন, আমাদেরকে মুক্তি দেবেন। তাঁর কথা বিশ্বাস করি। তাছাড়া দাদীমার কষ্টও কমবে, ধীরেসুস্থে ঋণ শোধ করতে পারবে! এর বেশি আর কি চাই আমরা।'

'তা-ও বটে। আচ্ছা, সত্যি কি বিশ্বাস হয়, মুক্তো আয়ু বাড়াতে পারে? আমার কাছে পাগলামি মনে হচ্ছে।'

'আমি অবিশ্বাস করছি না। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যি হতে পারে। চীনের ওষুধ বিদ্যা অনেক পুরানো। ইদানীং পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, বিশেষ এক ধরনের ব্যাঙের চামড়ায় মূল্যবান ওষুধ হয়, অথচ শত শত বছর আগেই এটা জানা ছিল চীনের কবিরাজদের। বাঘের গোঁফ আর দানবের হাড়ের গুঁড়ো অনেক জটিল রোগের মহৌষধ, এটা অনেক আগে থেকেই বিশ্বাস করে চীনারা।'

'আমিও পড়েছি এ-ব্যাপারে,' বলল রবিন। 'ওই দানবরা হলো প্রাগৈতিহাসিক ম্যামথ, সাইবেরিয়ার দাঁতাল বাঘ আর কিছু প্রকাণ্ড প্রাগৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ার।'

'এখন কথা হলো, ওসবে যদি রোগ সারে, ভূতুড়ে মুক্তোই বা কেন আয়ু বাড়াবে না?' প্রশ্ন রাখল মিঙ। 'মিস্টার হুয়াঙ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন এটা, আর শুধু বিশ্বাসই অনেক সময় জটিল রোগ সারিয়ে দেয়, এটা তো এখন বৈজ্ঞানিক সত্য।'

'আচ্ছা, সবুজ ভূতের ব্যাপারে সত্যি সব জানেন মিস্টার হুয়াঙ?' বলল রবিন। 'একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে। প্রায় একই সময়ে একই জায়গায় উদয় হলো সবুজ ভূত আর ভূতুড়ে নেকলেস!'

'ওসব ভেবে লাভ নেই,' বলল মিঙ। 'নেকলেসটা দিয়ে দিচ্ছি এ ব্যাপারে তাহলে একমত আমরা?'

মাথা কাত করল মুসা আর রবিন।

'গলা চড়িয়ে ডাকল মিঙ, 'মিস্টার হুয়াঙ, সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।'

এক জায়গায় কাপড় সরিয়ে বেরিয়ে এলেন মিস্টার হুয়াঙ, সঙ্গে তিনজন চাকর। কাপড়ের পেছনে ওখানে চার-চারজন মানুষের লুকানোর জায়গা থাকতে পারে, বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না।

'কি সিদ্ধান্ত নিলে, খুদে ড্রাগন?' জানতে চাইলেন মিস্টার হুয়াঙ, হয়তো আড়ালে থেকে সবই শুনেছেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না।

'নেকলেসটা দেব।'

'কোথায় আছে ওটা?'

'খনিতে,' জবাব দিল মুসা।

মরিসনকে ডেকে আনালেন মিস্টার হুয়াঙ। 'ও গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। ততক্ষণ তোমরা এখানে আমার মেহমান। নেকলেসটা পেলে তোমাদের ছেড়ে দেব। বাঁধার আর দরকার হবে না। ফিরে গিয়ে পুলিশকে হয়তো বলবে আমার কথা, কিন্তু লাভ হবে না। আমাকে খুঁজে পাবে না ওরা, হাওয়ায় মিলিয়ে যাব। আমেরিকার এই বিশাল চায়না টাউনেও আমি একটা বিরাট রহস্য, এখানকার যে কোন চীনাকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝবে।'

'মরিসন আনতে পারবে না খনি থেকে,' বলল মুসা। 'ও খুব বেশি মোটা। সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবেই না তার শরীর, বোতলের গলায় ছিপির মত আটকে যাবে,' ফোরম্যানের দিকে চেয়ে মুচকি হাসার লোভ সংবরণ করতে পারল না সে।

'রোগাটে লোক জোগাড় করতে পারব...,' বাধা পেয়ে থেমে গেল মরিসন। হাত তালি দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলেন মিস্টার হুয়াঙ। 'নাআ! তোমাকে আনতে হবে। আর কাউকে বিশ্বাস করি না। যেভাবে পারো ঢুকবে।'

'খুদে ব্যাঘ্রশাবক,' মুসার দিকে ফিরে বললেন তিনি, 'সুড়ঙ্গটা কতখানি সরু? সত্যিই ঢুকতে পারবে না হোঁতকাটা?'

'না স্যার, সত্যি পারবে না,' বলল মুসা।

'নেকলেসটা টর্চের মধ্যে?'

'হ্যাঁ,' ঢোক গিলল মুসা।

'টর্চটা কোথায়?'
'পাথরের আড়ালে।'
'কোন জায়গায়?'
'কোথায় বলতে পারব না, তবে খুঁজে বের করতে পারব। ম্যাপট্যাপ কিছু এঁকে রাখিনি।'
'হুঁ,' ভাবলেন মিস্টার হুয়াঙ। মরিসনের দিকে ফিরে বললেন, 'সহজ হয়ে গেল। ওদেরকে নিয়ে যাও। মুসা টর্চটা বের করে দেবে।'
'কিন্তু তাতে বিপদ আছে,' বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে মরিসনের কপালে। 'ওদের খোঁজা হচ্ছে, যদি দেখে ফেলে···'
'ঝুঁকি নিতেই হবে। আগে সাবধান থাকোনি, তাই বিপদে পড়েছ। কিভাবে সামলাবে সেটা তোমার ব্যাপার। একটা কথা, ছেলেদের কোন ক্ষতি করা চলবে না।'
'কিন্তু ফিরে গিয়ে সব জানিয়ে দেবে ওরা।'
'জানাক। আমি তোমাকে রক্ষা করব। নিরাপদে বের করে দেব দেশের বাইরে। তোমার সহকর্মীরাও গায়েব হয়ে যাবে, পুলিশ খুঁজে পাবে না। আমাকে তো পাবেই না। কাজেই ওরা বললেও কিছু এসে যায় না। বুঝেছ?'
জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে মরিসন। 'হ্যাঁ, স্যার,' গলা কাঁপছে। 'আপনার কথামতই কাজ হবে। কিন্তু ছেলেরা যদি আমার সঙ্গে বেঈমানী করে?'
হাসলেন মিস্টার হুয়াঙ। 'সেক্ষেত্রে আমার আর কোন দায়িত্ব থাকবে না। ওদেরকে যা খুশি করতে পারো। তোমার নিরাপত্তার পথ তুমি বেছে নেবে। তবে আমার মনে হয় না ওরা কোন চালাকি করবে। প্রাণের মায়া কার না আছে? এই বুড়ো বয়েসেও আমার বেঁচে থাকার সাধ, আর ওরা তো শিশু।'
মিস্টার হুয়াঙের কণ্ঠে কিছু একটা রয়েছে, শিউরে উঠল রবিন। মনে মনে সে আশা করল, সত্যি কথাই বলেছে মুসা, নেকলেসটা খুঁজে বের করতে পারবে।
মুসা ভাবছে, মিস্টার হুয়াঙকে মিথ্যে কথা বলেছে সে, এর পরিণতি কি হবে?
'জলদি করো,' মরিসনকে তাড়া দিলেন মিস্টার হুয়াঙ, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে।'
'ওদের বেঁধে নিই···,' বাধা পেয়ে আবার থেমে গেল মরিসন।
ধমকে উঠলেন মিস্টার হুয়াঙ, 'নাআ! তার দরকার হবে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাবে ওরা। আরামে যাবে।' মিঙের দিকে ফিরলেন। 'খুদে ড্রাগন, তাকাও তো আমার দিকে।'
মিস্টার হুয়াঙের চোখের দিকে তাকাল মিঙ, আটকে গেল দৃষ্টি, চেষ্টা করেও আর সরাতে পারল না।
একঘেয়ে কণ্ঠে বলে চললেন মিস্টার হুয়াঙ, 'খুদে ড্রাগন, তুমি ক্লান্ত, খুব ক্লান্ত। ঘুম পেয়েছে তোমার, অনেক ঘুম। কোমল হাতে তোমার চোখে পরশ বুলাচ্ছে ঘুম, ঘুমের রাজ্যে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছ তুমি, তোমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।'
অবাক হয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, সত্যিই চোখ বন্ধ হয়ে আসছে মিঙের।

ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে মিঙ। জোর করে টেনে খুলল চোখের পাতা।

আবার শুরু হলো একঘেয়ে কণ্ঠ, 'চোখ বন্ধ হয়ে আসছে! বাধা দিতে পারছ না তুমি, আমার ইচ্ছেই তোমার ইচ্ছে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে তোমার, বন্ধ করো, বন্ধ,...বন্ধ...বন্ধ...'

পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল মিঙের চোখের পাতা। খুলতে পারছে না।

মোলায়েম একঘেয়ে কণ্ঠ থামল না মিস্টার হুয়াঙের, 'ঘুম আসছে তোমার চোখ জুড়ে। গভীর ঘুম। অন্ধকারের চাদর গ্রাস করছে তোমাকে। ঘুমের দরিয়ায় তলিয়ে যাচ্ছ তুমি। তোমার ইচ্ছাশক্তিকে দাবিয়ে দিয়েছে ঘুম। ঘুমিয়ে পড়ছ তুমি। ঘুমিয়ে থাকবে, আমি না বললে জাগবে না। খুদে ড্রাগন, শান্তিতে ঘুমাও এখন...ঘুমাও...ঘুমাও...ঘুমাও...ঘুমাও...'

হঠাৎ টলে পড়ে যেতে শুরু করল মিঙের শরীর। লাফিয়ে এসে ধরে ফেলল তিন চাকর। একটা সোফায় শুইয়ে দিল।

'খুদে ব্যাঘ্রশাবক, এবার তুমি তাকাও আমার দিকে,' বললেন মিস্টার হুয়াঙ।

দুরুদুরু করছে মুসার বুক। না তাকিয়ে পারল না। একবার চেয়ে আর দৃষ্টিও সরাতে পারল না কোনদিকে। জোর করে ঘুম ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করল না মুসা, কেমন একটু যেন মজা পাচ্ছে, দেখি না কি হয় ভাব। অবশ করে ফেলছে যেন তাকে মিস্টার হুয়াঙের একঘেয়ে মোলায়েম কণ্ঠ। এক সময় সে-ও টলে পড়ে যেতে শুরু করল, তাকেও ধরে শুইয়ে দিল চাকরেরা।

রবিন বুঝতে পারছে, মিঙ আর মুসাকে সম্মোহন করেছেন মিস্টার হুয়াঙ। সে বইয়ে পড়েছে, রোগীকে সম্মোহন করে ঘুম পাড়িয়ে অপারেশন করা সম্ভব, কোন ব্যথা নাকি অনুভব করে না রোগী। মুসার মত ভয় পেল না সে। তার পালা এল।

'শক্তহৃদয়, তাকাও আমার দিকে,' বললেন মিস্টার হুয়াঙ। 'তোমার ঘুম পেয়েছে, তোমার বন্ধুদের মতই। ক্লান্ত তুমি, ভীষণ ক্লান্ত, চোখ বন্ধ করো...'

চোখ বন্ধ করে ফেলল রবিন।

মিস্টার হুয়াঙের একঘেয়ে কণ্ঠ চলল থেমে থেমে।

পড়ে যেতে শুরু করল রবিন, তাকে ধরে ফেলল চাকরেরা।

মরিসনকে বললেন মিস্টার হুয়াঙ, 'কোন রকম গোলমাল করতে পারবে না ওরা। জায়গামত পৌঁছে ডাক দিও, জেগে উঠবে। নেকলেসটা নিয়ে ছেড়ে দেবে। আর যদি...'

অপেক্ষা করে রইল মরিসন।

'আর যদি,' বলেন মিস্টার হুয়াঙ, 'গোলমাল কিংবা চালাকি করে, গলা কেটে ফেলে দিও কোথাও।'

পনেরো

'আশ্চর্যবোধক চিহ্ন কেউ খুঁজে পায়নি?' বিস্মিতই মনে হচ্ছে কিশোরকে। এই খানিক আগে ডারড্যান্ট ভ্যালিতে পৌঁছেছে সে আর রবিনের বাবা।

জোরে জোরে মাথা নাড়লেন মিসেস দিনারা কৌন। 'না। পুরো উপত্যকায়

খোঁজ করিয়েছি আমি। গাঁয়ে যত লোক আছে, সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, বাচ্চারাও বাদ যায়নি।'

'আশ্চর্যবোধক নিয়ে এত তোড়জোর কেন?' ভুরু নাচাল ডলফ টার্নার। মিসেস কৌনের মতই তাকেও খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ব্যাখ্যা করে বলল কিশোর।

'মরুভূমিতে চিহ্ন দেবে কোথায়?' বলল টার্নার। 'আমি শিওর, ওদিকেই গেছে ওরা। কাল ভোরেই প্লেন নিয়ে খুঁজতে পাঠাব। মরুভূমিতেই কোথাও পথ হারিয়েছে ওরা। খনিতে আটকা পড়লে বাইরে ওদের ঘোড়াগুলো অন্তত খুঁজে পাওয়া যেত।'

'তা ঠিক,' সায় দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড, বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর। 'হ্যাঁ, মিস কৌন, কিশোর আপনাকে কিছু বলতে চায়।'

অপেক্ষা করে রইলেন মিস কৌন আর টার্নার। মস্ত হলঘরে বসেছে ওরা, চারজনই শুধু, অন্য কেউ নেই।

'মিস কৌন,' নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল কিশোর, কথার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে বড়দের মত গম্ভীর করে তুলল চেহারাকে, 'সবুজ ভূতের ব্যাপার নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করেছি আমি। আমার দুই বন্ধু ওটাকে দেখেছে, চিৎকার শুনেছে। তদন্ত করে আমি জেনেছি, চিৎকারটা বাড়ির ভেতর থেকে আসেনি। খুব মজবুত বাড়ি, নিখুঁত করে তৈরি হয়েছিল, প্রায় সাউণ্ড প্রুফ, ভেতরের শব্দ বাইরে আসতে পারে না ভাল মত।

'একটা কথা আমাকে বলুন, ভূত যদি থেকেই থাকে, আর থাকে বাড়ির ভেতরে, শুধু চিৎকার করার জন্যে বাইরে আসবে কেন? আসেওনি। চিৎকারটা করেছিল আসলে মানুষে, আমাদেরই মত জলজ্যান্ত মানুষ। আরেকটা ব্যাপার, সে-রাতে যে ক'জন দেখতে গিয়েছিল, তারা কেউই শিওর নয়, দলে কতজন ছিল। কেউ বলছে ছয়, কেউ বলছে সাতজন। সবার কথাই ঠিক।

'চিৎকারটা ড্রাইভওয়ে থেকে শুনেছে ছয়জন, আর ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে থেকে শুনেছে একজন, সে-ই চিৎকার করেছিল। তারপর কোন এক ফাঁকে বেরিয়ে এসে যোগ দিয়েছে দলের সঙ্গে।'

'কিশোর ঠিকই বলেছে,' একমত হলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'আশ্চর্য! এই সহজ কথাটা আমার আর পুলিশ চীফের মাথায় এল না।'

মিস কৌন ভ্রূকুটি করলেন।

'কথায় যুক্তি আছে,' ভুরু কুঁচকে গেছে টার্নারের, 'কিন্তু এই কাণ্ড কেন করতে যাবে লোকে?'

'দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে,' জবাব দিল কিশোর। 'পুরানো বাড়িতে ওরকম চিৎকার শুনলে অবাক হবেই লোকে। তাছাড়া ওরকম কিছু একটা ঘটবে, আশাও করছিল ছয়জন মানুষ। বলতে গেলে, একরকম জোরজার করেই নিয়ে আসা হয়েছিল ওদের পাঁচজনকে।'

'হুঁ। সাজানো ব্যাপার,' বললেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'একেবারে,' বলল কিশোর। 'একজন লোক ডেকে এনেছিল পাঁচজনকে, চাঁদের

আলোয় পোড়ো বাড়ি দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। চাঁদের আলোয় অ্যাডভেঞ্চারের লোভেই রাজি হয়ে গিয়েছিল পাঁচজন, ছয় নম্বর লোকটাকে সন্দেহ করেনি ওরা, ধরে নিয়েছে নতুন কোন প্রতিবেশী। তার সঙ্গী তখন লুকিয়েছিল ঝোপের ভেতরে। ড্রাইভওয়েতে দলটাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে।'

চোখ মিটমিট করছে টার্নার, কিশোরের কথা বোঝার চেষ্টা করছে যেন।

মিস দিনারা কৌনের চোখে বিস্ময়। 'কিন্তু…কিন্তু কেন? দুজন লোক কেন ওরকম করবে?'

'দলটাকে বাড়িতে ঢোকানোর জন্যে,' বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'যাতে ভূত দেখে গিয়ে খবরটা ছড়াতে পারে। ভাল ফন্দি এঁটেছিল।'

'আমার মনে হয় না,' প্রতিবাদ করল টার্নার। 'এসব অতিকল্পনা।'

'তাই? কিশোর, টেপটা চালিয়ে শোনাও ওঁকে।'

রেকর্ডার রেডিই করে রেখেছে কিশোর। চালিয়ে দিল। কুৎসিত চিৎকারে ভরে গেল ঘর। লাফিয়ে উঠলেন মিস কৌন, চমকে গেল টার্নার।

'এটা শুরু,' মোলায়েম গলায় বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'আরও কিছু আছে। সে-রাতে যারা যারা কথা বলেছিল, সবার কণ্ঠস্বর ধরা পড়েছে টেপে। চিনতে পারলে জানাবেন।'

ভারি-কণ্ঠের কথা শুনে হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন মিস কৌন। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, 'হয়েছে হয়েছে, আর শোনার দরকার নেই, বন্ধ করো। এই ডলফ, এ-তো তোমার গলা! ভারি করেছ ইচ্ছে করেই। সেই যে, কলেজে যখন পড়তে, নাটকে ভিলেনের অভিনয় করার সময় ওরকম করে কথা বলতে, আমি ভুলিনি।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন,' মাথা ঝোকাল কিশোর, 'মিস্টার টার্নারের গলা। প্রথমে ধরতে পারিনি, তবে চেনা চেনা লাগছিল। কৌন ম্যানসনে ওঁর কথা শুনেছি তো। বদলে ফেলেছিলেন, তবে পুরোপুরি পারেননি। সে-রাতে নকল গোঁফ পরেছিলেন তিনি। অন্ধকারে ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল। সহজেই বোকা বানিয়ে দিয়েছেন পাঁচজনকে।'

মুখ নিচু করে সোফায় বসে আছে টার্নার, পুরানো কাপড়ের একটা দোমড়ানো বাণ্ডিল যেন।

'চুপ করে আছ কেন, ডলফ?' বরফের মত শীতল মিস কৌনের কণ্ঠ। 'কিছু বলার থাকলে বলো।'

বার কয়েক ঢোক গিলল টার্নার, অযথাই নিজের হাতের তালুর দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর শুরু করল, 'গোলমালটা শুরু হয়েছে বছর দেড়েক আগে, যখন ঘোষণা করলেন, আপনার সব সম্পত্তি মিঙকে দিয়ে যাবেন। অথচ ও আসার আগে জানতাম, সব আমি পাব,' গুঙিয়ে উঠল সে। 'কারণ মিঙ আপনার সব সম্পত্তির মালিক আইনত আমিই হতাম। নিজের জিনিস মনে করে ওই আঙুর খেত আর মদের কারখানার উন্নতির জন্যে গাধার মত খেটেছি। অথচ শেষে কি হলো? মনে হলো, আমার জিনিস আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে,' থামল

সে।

'বলে যাও,' কঠিন কণ্ঠে বললেন মিস কৌন।

হাত দিয়ে কপাল মুছল টার্নার। 'সহ্য করতে পারলাম না। একটা ফন্দি আঁটলাম। বন্ধুবান্ধব আর ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা ধার করলাম খেত বন্ধক রেখে, নতুন মেশিনারি কিনলাম। মরিসন আর তার কয়েক দোস্তকে টাকা খাইয়ে বশ করলাম, আমার হয়ে গোলমাল পাকাতে লাগল ওরা, যন্ত্রপাতি ভাঙতে লাগল, পিপায় ফুটো করে মদ ফেলে দিল। ক্ষতি করে করে এমন অবস্থায় নিয়ে আসতে চাইলাম, যাতে ভারড্যান্ট ড্যালির সবকিছু বিক্রি করে আপনি কৌন ম্যানশনে চলে যেতে বাধ্য হন।'

'হুঁ, তুমিই আমাকে কৌন ম্যানশন বিক্রি করতে বাধ্য করেছ, এখন বুঝতে পারছি। বলে যাও।'

গভীর আগ্রহে শুনছে কিশোর। চিৎকারটা কার, বুঝেছিল সে, অনুমান করেছিল, টার্নার কোন না কোনভাবে জড়িত, কিন্তু কিভাবে, সেটা জানত না।

'বাড়ির অনেক দাম উঠল,' আবার বলল টার্নার, 'এত উঠবে কল্পনাও করিনি। বুঝলাম, ওই টাকা দিয়ে ঋণের বেশির ভাগই শোধ করে ফেলতে পারবেন। কি করব ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েছি, এই সময় একটা মেসেজ এল।'

'মেসেজ?' বলে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কি মেসেজ?'

'স্যান ফ্রানসিসকোয় যেতে হবে একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। গেলাম। বৃদ্ধ এক চীনা, তাঁর নাম মিস্টার হুয়াং। চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাকে, তাই কোন পথে গেছি বলতে পারব না। তিনি আমাকে জানালেন, ব্যাংকের কাছে রাখা ভারাড্যান্ট ড্যালির মর্টগেজ তিনি কিনে নিয়েছেন। বন্ধুবান্ধব যাদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলাম, তাদের সব টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে। শুধু তাই না, মুখ বন্ধ রাখার জন্যে বাড়তি টাকাও দিয়েছেন তাদেরকে।'

'কেন? তার কি লাভ?' জিজ্ঞেস করলেন মিস কৌন।

'আসছি সে কথায়,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল টার্নার। 'তাঁর বাড়িতে বুড়ো এক চীনা চাকরানী আছে, মিস্টার ফারকোপারের বাড়িতে চাকরানী ছিল গোস্ট পার্লের কথা সে জানে। জানে, মিস্টার ফারকোপারের স্ত্রীর লাশের সঙ্গে ওটাকে কবর দেয়া হয়েছে।' মুখের ঘাম মুছল সে। 'মিস্টার হুয়াং যেন সবজান্তা। আপনার কথা, মিস্টার ফারকোপারের কথা, ভারড্যান্ট ড্যালির কথা, সবই তাঁর জানা। আমার সামনে টোপ ফেললেন তিনি। বুদ্ধিও বাতলালেন।

'বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি হিসেবে বদনাম রটানোর পরামর্শ দিলেন তিনি আমাকে, কি ভাবে কি করতে হবে তা-ও বুঝিয়ে দিলেন। এতে বাড়ির খরিদ্দার যাবে কমে, বাড়ি বিক্রি করতে দেরি হবে। গুপ্ত ঘরটা খোঁজার সুযোগ পাব, নেকলেসটা বের করে দিতে পারব। আমার কাছ থেকে দশ লাখ ডলারে কিনে নেবেন ওটা তিনি।

'আরও কিছু চালাকি করতে বললেন তিনি। ভূতটা প্রথম দেখা যাবে পোড়ো বাড়িতে. তারপর রকি বীচের এখানে-সেখানে, সব শেষে ভারড্যান্ট ড্যালিতে।

গুজব ছড়াতে হবে। যাতে ভয় পেয়ে কাজ ফেলে পালায় শ্রমিকেরা। ঋণের দায়ে শেষে নিলামে উঠবে আঙুরের খেত আর মদের কারখানা। তখন নেকলেস বিক্রির টাকা দিয়ে সব কিনে নিতে পারব আমি।

'পুরো ব্যাপারটাই খুব সহজ মনে হয়েছিল আমার কাছে। মরিসনকে নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। প্ল্যান করলাম, কবে থেকে কিভাবে ভূত দেখানো শুরু করব। কিন্তু গোলমাল করে দিল কন্ট্রাকটর, এক সপ্তাহ আগেই এসে বাড়ি ভাঙতে শুরু করল। সমস্ত প্ল্যান বদলে তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে হলো আমার। ছোটখাট ভুলচুক হয়ে গেল এ-কারণেই।

'বাড়ি ভাঙার খবর শুনে মরিসনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম রকি বীচে। কয়েকজন লোককে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভূত দেখালাম। তারপর গায়েব হয়ে গেলাম দুজনে। সে-রাতেই চলে এসেছি ভারড্যান্ট ভ্যালিতে। পর দিন আবার গেলাম, আমি একা। আমার দুর্ভাগ্য, পুলিশ ঢুকতে দিল না বাড়িতে, তাহলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হত না, আমার কণ্ঠস্বরও শুনতে না, ধরতেও পারতে না।'

'পারতাম,' বলল কিশোর। 'সেদিন আপনার কথা শুনতে পেতাম না বটে, কিন্তু আজ তো পেতাম। রহস্যের সমাধান করতে আরেকটু সময় লাগত, এই আর কি। আচ্ছা, সেফ থেকে নেকলেসটা তো আপনিই সারিয়েছেন, নাকি?'

'প্ল্যানটা আমারই,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল টার্নার। 'প্রেসিং হাউসে ভূত দেখানোর বন্দোবস্ত করলাম। গুজব বেশি করে ছড়ানোর জন্যে। নেকলেসটা রবিন, মুসা আর মিঙকে দেখালাম, সাক্ষী রাখলাম যে সেফেই ওটা রেখেছি। এই সময় খবর এল প্রেসিং হাউসে ভূত দেখা গেছে, উত্তেজনায় ভুলে যাওয়ার ভান করে সেফ খোলা রেখেই বেরিয়ে পড়লাম। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভান করে আবার তাড়াহুড়ো করে ফিরে এলাম। মরিসনকে দিলাম নেকলেসটা। সে আমাকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্যে আমার হাত পা বেঁধে রেখে গেল।'

'তুমি এত বড় শয়তান জানলে···ছিহ্!' ঘৃণায় মুখ বাঁকালেন মিস কৌন। 'আর দশটা চোরছ্যাঁচোরের সঙ্গে কোন পার্থক্য দেখছি না তোমার। নেকলেস জাহান্নামে যাক, ছেলেগুলোর কি হলো? ওদেরকে ফেরত পেলেই আমি খুশি। কোথায় ওরা?'

মাথা নাড়ল টার্নার। 'জানি না। সত্যি বলছি।'

'তোমার সত্যি আর কে বিশ্বাস করতে যাচ্ছে,' তীব্র কণ্ঠে বললেন মিস কৌন।

কিশোরের মনে হলো, সত্যি কথাই বলছে টার্নার। বলল, 'আমার মনে হয়, ওরা মরিসনকে সন্দেহ করেছে। হয়তো অনুসরণও করেছে। তাই কোথাও আটকে রেখেছে মরিসন।'

মাথা দোলালেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'হতে পারে। আজ সারাদিনে মরিসনেরও পাত্তা নেই। কোথায় সে?'

'ছেলেগুলোকে না হয় লুকিয়ে রাখল,' প্রতিবাদ করল টার্নার, 'কিন্তু ঘোড়া? তিন-তিনটে ঘোড়া লুকাবে কোথায়? উপত্যকা চষে ফেলেছে লোকেরা, তাদের চোখে পড়তই।'

'কোথায় লুকিয়েছে সেটা আমরা কি জানি?' ঝাঝাল কণ্ঠে বললেন মিস কৌন।

'চোরে চোরে খালাত ভাই, সেটা তোমার জানার কথা।'

'কেউ যদি খালি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন খুঁজে পেত,' আফসোস করল কিশোর, 'তাহলেই খুঁজে বের করে ফেলতাম ওদের। কিন্তু চিহ্ন রেখে যেতে পেরেছে কিনা, কে জানে। থাকলে চোখে পড়বে না কেন?'

ঘরে এসে ঢুকল সুই। 'শেরিফ এসেছেন, ম্যাডাম। বললেন খবর আছে।'

'জলদি নিয়ে এসো,' বললেন মিস কৌন।

ঘরে ঢুকলেন শেরিফ। সঙ্গে একটা ছেলে।

'কি খবর শেরিফ?' তর সইছে না আর মিস কৌনের। 'ওদের খোঁজ পাওয়া গেল?'

'না, ম্যাডাম,' মাথা নাড়ল শেরিফ। 'তবে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেখা গেছে। এই ছেলেটা দেখেছে।'

ময়লা পোশাক পরা ছেলেটা এগিয়ে এল। 'হ্যাঁ, ম্যাডাম। পাখির ডিম খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, পিপাসা পেল খুব। কয়েকটা পিপা দেখে পানি আছে কিনা উঁকি দিলাম, দেখি চিহ্ন।'

'কোথায়?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে কিশোর।

'মরুভূমির ধারে, পথে।'

'মরুভূমিতে, পিপার ভেতরে,' বিড়বিড় করলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'নাহ্, বিশেষ সুবিধে হবে না।'

'হতেও পারে,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলুন দেখে আসি।'

মিস কৌনও উঠলেন। 'আমিও যাব।'

'আমিও আসি,' বলল টার্নার।

'না,' ধমকে উঠলেন মিস কৌন, 'তোমার যেতে হবে না।'

তাড়াতাড়ি এসে শেরিফের পুরানো সিডানে উঠে গাদাগাদি হয়ে বসল ওরা।

বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা নির্জন জায়গায় দুটো পিপা পড়ে থাকতে দেখা গেল হেডলাইটের আলোয়।

'ওই যে, ওই দুটোই,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল ছেলেটা।

কাছে এসে থামল গাড়ি।

পিপাগুলো ভালমত দেখে বললেন মিস কৌন, 'পুরানো বাতিল জিনিস। এর মধ্যে আঙুর বা রস কোনটাই রাখা যাবে না। কিন্তু এখানে এনে ফেলল কে?'

পিপার ভেতরে ঝুঁকে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। একটা পিপার তলায় সবুজ চক দিয়ে আঁকা রয়েছে বড় একটা আশ্চর্যবোধক। 'হুঁম্, রবিন ছিল এর ভেতরে।'

'বুঝেছি!' চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ মিস কৌন। 'এখানে পুরানো পিপা এতই সাধারণ জিনিস, কেউই সন্দেহ করেনি। কল্পনাও করেনি কেউ ওগুলোর ভেতরে ভরে মানুষ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এগুলোতে করেই ছেলেগুলোকে পাচার করেছে মরিসন। কিন্তু আছে তো দুটো। আরেকজনকে কি করে নিল?'

'কি শয়তানী বুদ্ধি!' বিড়বিড় করলেন শেরিফ। 'কিন্তু এখানে ফেলে গেল কেন

পিপাগুলো?'

'হয়তো গাড়ি বদল করেছে এখানে,' বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'মরিসনের লোক আগে থেকেই গাড়ি নিয়ে বসেছিল, নির্জন জায়গায় এসে পিপা থেকে ছেলেদেরকে বের করে অন্য গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্যান ফ্রানসিসকোয়। চলুন, জলদি বাড়ি চলুন। পুলিশকে টেলিফোন করতে হবে।'

ফিরে চলল গাড়ি। হেডলাইটের আলোয় পথের ধারে একটা কাগজের টুকরো পড়ে থাকতে দেখল কিশোর। খানিক দূরে একটা, তারপর আরেকটা। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। কই, আসার সময় তো দেখেনি? নাকি বেশি উত্তেজিত ছিল বলে খেয়াল করেনি? তাই হবে।

খানিক দূরে আরেকটা একই রকম কাগজের টুকরো চোখে পড়তেই গাড়ি থামাতে বলল কিশোর। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তুলে নিল টুকরোটা। টর্চের আলোয় দেখল, তাতে লেখা রয়েছে কিছু। আরে, রবিনের হাতের লেখা না! দ্রুত চলে এল গাড়ির কাছে। মিস্টার মিলফোর্ডকে ডাকল, 'আংকেল, দেখুন, রবিনের লেখা!'

ছেলের হাতের লেখা চিনতে পারলেন বাবাও।

লেখা রয়েছে ঃ ৪৭ খনি সাহায্য চাই!!!

'কি মানে এর!' আপনমনেই বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কিশোর, কিছু বুঝতে পারছ?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কিছুই বুঝছি না। হতে পারে সাতচল্লিশ মাইল দূরের কোন খনির কথা বলছে।'

'সাতচল্লিশ মাইল দূরে কোন খনি নেই,' বললেন মিস কৌন, 'যা আছে, মাইল দশেকের মধ্যেই রয়েছে। এখানকার কোন খনিই খোঁজা বাদ রাখেনি।'

স্থির দৃষ্টিতে কাগজটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। দশ মাইলের মধ্যেই কোন খনিতে রয়েছে ওরা খনির উল্লেখ তাই বোঝাচ্ছে। কিন্তু সাতচল্লিশ মানে কি তাহলে?

ষোলো

গুহার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে আছে রবিন আর মিও। পা বাঁধা। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে ওদের দু'পাশে বসে আছে দু'জন লোক, পাহারায়।

গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

স্টেশন ওয়াগনের পেছনে তুলে চাদর দিয়ে ঢেকে নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে হ্যাশনাইফ ক্যানিয়নে। গাড়ি যতদূর আসতে পারে এসেছে, তারপর ঘুম থেকে তুলে হাঁটিয়ে এনেছে বাকি পথ।

মুসাকে নিয়ে নেকলেস আনতে গেছে মরিসন।

সুড়ঙ্গের সঙ্কীর্ণ অংশটার কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে। এর পর আর মরিসন যেতে পারবে না। মুসার হাতে একটা টর্চ, ধরিয়ে দিয়ে শাসিয়ে বলল, 'যাও। কোন রকম চালাকি করবে না। তুমি ফিরে না এলে তোমার দুই বন্ধুর গলা কেটে ফেলে

দেব। মনে থাকে যেন।'

না ফেরার কোন ইচ্ছে নেই মুসার। সেকথা মরিসনকে জানিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে।

দুইবার গেছে-এসেছে এই পথে, তৃতীয়বার যেতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। পেরিয়ে এল সঙ্কীর্ণ অংশটা। তারপর চিহ্ন ধরে ধরে এসে ঢুকল সেই গুহায়, যেখানে লুকিয়েছে নেকলেস। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, নেকলেসটা দিয়ে দেবে মিস্টার হুয়াঙকে, কোনরকম চালাকি করবে না। অহেতুক ঝুঁকি নেয়ার কোন অর্থ নেই।

কিন্তু কঙ্কালটা যেখানে থাকার কথা সেখানে আলো ফেলেই স্থির হয়ে গেল। ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত শিরশির করে নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। কঙ্কালের চিহ্নও নেই, মাথার খুলিটাও গায়েব। সে জায়গায় মস্ত এক কালো গর্ত, বড় পাথর ধসে পড়ে রয়েছে। নিশ্চয় গুঁড়িয়ে দিয়েছে হাড়, সেই সঙ্গে ভঙ্গুর মুক্তোগুলোও।

প্রমাদ গুনল মুসা। এখন কি করবে? মরিসনকে বিশ্বাস করানো যাবে না। কি করবে? ভাবতে ভাবতেই ফিরল সে। পাথরের আড়াল থেকে বের করে নিল কালো টর্চটা। মরিসন কি খুলে দেখবে? নাকি না দেখেই ছেড়ে দেবে তাদেরকে?

ঘটল কি করে এই কাণ্ড? মনে পড়ল মুসার, দ্বিতীয়বার সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ দিয়ে ফেরার পথে ভূমিকম্প হয়েছিল। সে-কারণেই হয়তো ধসে পড়েছে পাথর। একেই বলে দুর্ভাগ্য। পড়ার আর জায়গা পেল না, পড়ল একেবারে কঙ্কালটার ওপর।

ভগ্নহৃদয়ে কালো টর্চটা নিয়ে ফিরে চলল মুসা। জানে, না দেখে নিশ্চিন্ত হবে না মরিসন, তবু ক্ষীণ একটা আশা দুলছে মনে। যদি না দেখেই ছেড়ে দেয়?

সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এল মুসা।

দেখেই ধমকে উঠল মরিসন, 'এত দেরি কেন? কই, এনেছ?'

নীরবে কালো টর্চটা মরিসনের হাতে তুলে দিল মুসা।

হাতে নিয়ে একবার ওজন পরীক্ষা করেই মাথা নাড়ল মরিসন। 'হুঁ। চলো, এগোও।'

কিন্তু দশ পা এগিয়েই থেমে গেল মরিসন। 'আছে কিনা দেখি তো? বিচ্ছুটাকে বিশ্বাস নেই।' টর্চের পেছনের ক্যাপ ঘুরিয়ে খুলতে শুরু করল।

দৌড় দিল মুসা। দুই লাফে এসে তার কলার চেপে ধরল মরিসন, ল্যাঙ মেরে ফেলে দিল মাটিতে। দ্রুত হাতে ক্যাপ খুলে টর্চের ভেতর থেকে বের করে আনল রুমালে বাঁধা পাথরের পুঁটুলি।

গর্জে উঠে একটানে ছুরি বের করল মরিসন। উঠে দাঁড়িয়েছে মুসা। ছুরির চোখা ফলা তার পিঠে ঠেসে ধরে বলল ফোরম্যান, 'গোলমাল করলে কি করতে হবে বলেই দিয়েছেন মিস্টার হুয়াঙ। জবাই করব আমি তোমাদের। নেকলেসটা কোথায়?'

'নেই। পাথর পড়ে ভেঙে গেছে,' মিনমিন করে বলল মুসা।

'চুপ! চালাকির আর জায়গা পাওনি! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। তোমাকে কিছু বলব না, তোমার বন্ধুদের আঙুল কাটব এক এক করে। চলো, হাঁটো। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। হাঁটো,' ছুরির মাথা দিয়ে মুসার পিঠে খোঁচা লাগাল মরিসন।

গুহাটায় ফিরে এল দু'জনে। টর্চের আলোয় দেখা গেল তেমনি বসে আছে রবিন আর মিঙ। তার পাশে মুখ গুঁজে বসে আছে দু'জন লোক।

'এই…,' বলেই থেমে গেল মরিসন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দু'জন, হাতে রিভলভার। তার রেখে যাওয়া প্রহরীরা নয়, অন্য লোক।

প্রায় একই সঙ্গে গুহার চারপাশ থেকে জ্বলে উঠল ছয়টা টর্চ। শেরিফের ধমক শোনা গেল, 'খবরদার, নড়বে না, খুলি উড়িয়ে দেব!'

কিন্তু নড়ল মরিসন। চোখের পলকে মুসার কলার চেপে ধরে একটানে তাকে নিয়ে ঢুকে গেল আবার সুড়ঙ্গে। কেউ গুলি করার সাহস পেল না, মুসার গায়ে লাগতে পারে। এতই তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ঘটনাটা, কেউই কিছু করতে পারল না। তবে দাঁড়িয়েও থাকল না। টর্চ আর রিভলভার হাতে ছুটে এসে ঢুকল সুড়ঙ্গে।

ঝাড়া দিয়ে মরিসনের হাত থেকে কলার ছুটিয়ে নিয়ে দৌড় দিল মুসা। এসে পড়ল একেবারে শেরিফের গায়ে।

'কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

আঙুল তুলে একটা সুড়ঙ্গ মুখ দেখিয়ে দিল মুসা, কথা বলতে পারছে না, হাঁপাচ্ছে।

'যাক,' বলল শেরিফ। 'আজ আর খুঁজব না। খনির মুখে পাহারা রেখে যাব। কাল সকালে এসে ধরব ব্যাটাকে।'

ফেরার পথে গাড়িতে রবিন জানতে চাইল, ওরা কোথায় আছে তা জানা গেল কি করে।

'কিশোরের কৃতিত্ব,' বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'পথের ধারে তোমার লেখা কাগজ তার চোখেই পড়েছে। বোঝা গেল; খনিতে রয়েছ তোমরা। কিন্তু কোনটায়? যত খনি আছে, জানামত সব খুঁজেছে মিস কৌনের লোকেরা। শেষে তাঁরই মনে পড়ল একটা কথা, প্রায়ই নাকি মিঙ কোন্ এক খনিতে যেত, একজন লোকের সঙ্গে। লোকটার নাম ন্যাট বারুচ, স্যান ফ্রানসিসকোর এক হাসপাতালে রয়েছে এখন। অসুস্থ। তাকে ফোন করলেন মিস কৌন। জানা গেল, আরেকটা খনিমুখ আছে, যেটা খোঁজা হয়নি। দুটো হলদে পাথর আছে খনির মুখে। তখনই লোক জোগাড় করে ওটাতে এসে ঢুকলাম। তারপর আর কি? ঢুকেই দেখি তুমি আর মিঙ…' থামলেন তিনি। 'আচ্ছা, সাতচল্লিশ লিখেছিলে কেন? মানে কি?'

হাসল রবিন। 'কিশোর এর মানে বের করতে পারেনি?'

'না,' বলল কিশোর।

'তুমি বোঝো না, এমন জটিল সমস্যাও তাহলে আছে,' বলল রবিন। 'স্টেশন ওয়াগনের পেছনে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আমাদেরকে। নোট বই থেকে পাতা ছিঁড়ে তাতে সংকেত লিখে একটা ফাঁক দিয়ে ফেলেছি। একটা মাত্র পাতা ফেললে লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই একটার পর একটা পাতা ছিঁড়ে একই কথা বারবার লিখে ফেলেছি। সিরিয়াল নম্বর দিয়ে দিয়েছি এক দুই করে। ধরে নিয়েছি, বেশি পাতা ফেললে একটা অন্তত কারও না কারও চোখে পড়বেই। তোমরা যেটা পেয়েছ, সেটা সাতচল্লিশ নম্বর।'

'নম্বর দিয়েছ কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এমনি। মনে হলো, তাই দিলাম।'

'খনির নাম-ঠিকানা লিখলে না কেন?'

'নাম জানি না। তাছাড়া বেশি লেখার সুযোগ কোথায়? চাদরের নিচে অন্ধকারে বসে লিখেছি, চলন্ত গাড়িতে। ওটুকু যে লিখতে পেরেছি তা-ই বেশি।'

সতেরো

পরদিন ধরা পড়ল না মরিসন। ধরা গেল না কোনদিনই। তার আর কোন খোঁজই কেউ কোনদিন পেল না। হয়তো এমন কোন সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে পালিয়েছে সে, যেটা সম্পর্কে আর কেউই জানে না। কিংবা হতে পারে, কোন সুড়ঙ্গ বা গুহায় বেকায়দা অবস্থায় আটকা পড়ে গাধাটার মতই মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করছে।

মিস্টার মিলফোর্ড ফিরে গেলেন রকি বীচে।

মিঙের দাদীমার মেহমান হয়ে আরও কয়েক দিন ভারড্যান্ট ভ্যালিতে থাকল তিন গোয়েন্দা।

যেসব জায়গা দেখা হয়নি, ঘুরে ঘুরে সব দেখাল তাদেরকে মিঙ। চমৎকার কেটে গেল কয়েকটা দিন।

ভূতের ব্যাপারটা ভুয়া, সব টার্নারের শয়তানী, এটা প্রকাশ পেতেই আবার ফিরে এল শ্রমিকের দল, শেষ মুহূর্তে রক্ষা পেল পাকা আঙুর, তাড়াতাড়ি তুলে পাঠানো হলো ওগুলোকে প্রেসিং হাউসে, রাতদিন পরিশ্রম করে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হলো।

টার্নারকে পুলিশে দেননি মিস কৌন, আত্মীয় বলে মাফ করে দিয়েছেন। তবে তাড়িয়ে দিয়েছে ভারড্যান্ট ভ্যালি থেকে। সাবধান করে দিয়েছেন, ওখানে আর কোন দিন তাকে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে দেবেন।

অবশেষে একদিন রকি বীচে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। খবর পেয়ে সেদিনই এসে তাদের সঙ্গে দেখা করলেন পুলিশ-প্রধান ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। বার বার ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'উফ্, কি মানসিক অশান্তি থেকেই না মুক্ত করেছ তোমরা আমাকে। নিজের চোখে ভূত দেখলাম অথচ ভূত বিশ্বাস করি না, রহস্যটা রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল আমার।'

পকেট থেকে তিনটে সবুজ কার্ড বের করলেন ক্যাপ্টেন, একেকজনকে একটা করে দিলেন।

লেখা রয়েছে ঃ

এই কার্ডের বাহক ভলানটিয়ার জুনিয়র, রকি বীচ পুলিশকে সহায়তা করছে। এদেরকে সাহায্য করা মানে, পক্ষান্তরে পুলিশকেই সাহায্য করা।

সার্টিফিকেটের নিচে ক্যাপ্টেন ফ্লেচারের সই আর সীল।

আনন্দে লাল হয়ে গেল কিশোরের মুখ। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ক্যাপ্টেন। গোয়েন্দাগিরি করা এখন অনেক সহজ হয়ে গেল আমাদের জন্যে।'

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'থ্রী চিয়ার্স ফর...'

'ক্যাপ্টেন ফ্লেচার!' সমস্বরে শ্লোগান দিল কিশোর আর রবিন।

হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'এখন থেকে কোনরকম অসুবিধে হলেই আমাকে জানাবে। যত ভাবে পারি, সাহায্য করব।'

বাইরে বোরিস আর রোভারকে খাটাচ্ছেন মেরিচাচী, চেঁচামেচি শুনে উঁকি দিলেন অফিসে। হাসিমুখে বেরিয়ে আসছেন ক্যাপ্টেন ফ্লেচার, ব্যাপারটা অবাকই লাগল তাঁর কাছে। 'কি ব্যাপার, চীফ? আপনার মুখে হাসি অবাক কাণ্ড!'

'হাসব না বলছেন কি?' হাসতে হাসতেই বললেন ক্যাপ্টেন। 'ভূতে ধরেছিল আমাকে, আপনার ছেলেরা ছাড়িয়েছে।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলেন মেরিচাচী। 'ছেলেগুলো আপনার মাথাও খেয়েছে তাহলে?...যাচ্ছেন যে? চা খেয়েছেন?'

'না, খাইনি। বসব?'

'বসুন বসুন, আমি এখুনি নিয়ে আসছি। তারপর ভূতের গল্প শুনব।'

বড়দের কথায় আর থাকল না তিন গোয়েন্দা, বেরিয়ে এল। রওনা হলো হেডকোয়ার্টারে।

তার পরদিন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে এল তিন গোয়েন্দা। তাদেরকে দেখেই বলে উঠলেন তিনি, 'এই যে, এসে পড়েছ, বসো। খবরের কাগজে পড়েছি সব। দু'মিনিট বসো, হাতের কাজটা সেরে নিই, তারপর শুনব।'

কাজ শেষ করে কাগজপত্র এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রাখলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। হাত বাড়ালেন। ফাইলটা বাড়িয়ে দিল রবিন।

মন দিয়ে রবিনের লেখা রিপোর্ট পড়লেন তিনি। মুখ তুললেন। 'মিস্টার হুয়াঙের খবর কি? তার কথা তো আর কিছু লেখোনি।'

রবিন বলল, 'আমার ওখানে থাকতেই একদিন মিঙের দাদীমার বাড়িতে এল দু'জন চীনা। তারা বলল, নেকলেসটা কোথায় রেখেছিল মুসা দেখিয়ে দিলে মিস্টার হুয়াঙ কিস্তিতে ঋণের টাকা নিতে রাজি আছেন। দেখিয়ে দিল মুসা। নেকলেস পাওয়া যায়নি, তবে ওখানকার সমস্ত ধুলো পোঁটলা করে নিয়ে গেছে লোকগুলো।'

'মুক্তোর গুঁড়ো মেশানো ধুলো খেয়েই বেঁচে থাকার ইচ্ছে। হুঁহ, কতরকম লোক যে আছে দুনিয়ায়, সব কুসংস্কার।' কিশোরের দিকে ফিরলেন, 'কিশোর, কুকুরের উল্লেখ আছে রিপোর্টে, কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয়নি। খুলে বলো তো।'

'কুকুরটার কথা ভাবতে শার্লক হোমসের একটা গল্প মনে পড়ে গেল,' বলল কিশোর। 'আপনার নিশ্চয় মনে আছে, স্যার, ডক্টর ওয়াটসনকে শার্লক হোমস কি বলেছে, রাতে কুকুরের আচরণ সম্পর্কে?'

'নিশ্চয়!' বুঝে ফেললেন চিত্রপরিচালক, চেহারার ভাবেই প্রকাশ পেল সেটা। 'ডক্টর ওয়াটসন বলছে, রাতে অদ্ভুত কিছুই করে না কুকুরটা। শার্লক হোমসের জবাব, করে না যে সেটাই তো অদ্ভুত।'

'বুঝেছেন, স্যার।'

রিপোর্টের পাতা উল্টে একটা জায়গায় এসে থামলেন চিত্রপরিচালক। 'এই যে, এখানে লেখা রয়েছে, ছোট্ট কুকুরটা শান্ত ছিল লোকটার কোলে, চেঁচামেচি করেনি। কিশোর, না বলে পারছি না, তোমার ব্রেনটা অসাধারণ। এই অতি সামান্য একটা ব্যাপার থেকে রহস্যের সমাধান করে ফেললে?'

মুসা আর রবিনের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। হেঁয়ালি মনে তাদের কাছে কিশোর আর চিত্রপরিচালকের কথাবার্তা।

'কুকুরটা শান্ত ছিল, তাতে কি?' আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কুকুর আর বিড়ালের স্বভাব জানো?' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'রাতের বেলায় ভয় পেলে কিংবা অদ্ভুত কিছু দেখলে কি রকম উত্তেজিত হয়ে ওঠে? রোম খাড়া হয়ে যায়, চিৎকার করে। ছোট্ট কুকুরটা সেরাতে কিছুই করেনি, তার মানে কি?'

'ও, বুঝেছি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'যেহেতু ভূত ছিল না সেটা, সেজন্যেই চেঁচামেচি করেনি কুকুরটা। আমাদের কাছে অস্বাভাবিক, কিন্তু তার কাছে ব্যাপারটা সাধারণ ছিল। ইস্, আমরা কি! এই সহজ কথাটা...'

'তোমরা? আর দশটা ছেলের চেয়ে বুদ্ধিমান, সাহসী, রীতিমত দুঃসাহসী,' বললেন চিত্রপরিচালক, 'নেকলেসটা যেভাবে লুকিয়েছ, মরিসনকে ধোঁকা দিতে চেয়েছ, সেটা বুদ্ধি আর সাহসের পরিচয় নয়? রবিন যে ঘুমের ভান করে থাকল সেটা বুদ্ধির পরিচয় নয়?...'

'হ্যাঁ, ঠিক,' হাসল মুসা। 'মিস্টার হুয়াঙকেও বোকা বানিয়ে ছাড়ল। সম্মোহিত হওয়ার ভান করে চোখ বুজে রইল। তারপর সুযোগমত সাহায্যের আবেদন ছড়িয়ে দিল পথে পথে। এটা শুনলে মিস্টার হুয়াঙের চেহারা কেমন হয় দেখতে ইচ্ছে করছে। হা-হাহ্!'

'আজ তাহলে উঠি, স্যার?' ওঠার উপক্রম করল কিশোর।

'আরে বসো,' হাত নাড়লেন চিত্রপরিচালক। 'আসল কথাটাই তো জানা হয়নি এখনও। ভূতের ব্যাপারটা ফাঁকিবাজি, কিন্তু একটা কিছু তো দেখা গেছে। কি ওটা?'

'কুকুরের ব্যাপারে ভাবতে গিয়েই ওটা বুঝতে পেরেছি। কুকুরটা তেমন বিশেষ কোন গন্ধ পেল না, বিশেষ কিছু দেখল না, তার আচরণ থেকেই এটা স্পষ্ট।...ঘরটা অন্ধকার করে দিই, স্যার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও।'

জানালার সবগুলো পর্দা টেনে দিল কিশোর। আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিল। 'ডানে, দেয়ালের দিকে তাকান।'

রবিন আর মুসাও তাকাল। সবুজ আলো ফুটছে শাদা দেয়ালে। আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হলো আলো। যেন একটা মানুষের রঙিন ছায়া, নড়ছে। দেয়ালের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ভেসে চলে গেল যেন ওটা। ম্লান হতে হতে মিলিয়ে গেল।

আলো জ্বেলে দিল আবার কিশোর।

'তাজ্জব ব্যাপার।' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'বুঝেছি,' মাথা ঝোঁকালেন চিত্রপরিচালক। 'আরও আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। এতদিন সিনেমা লাইনে আছি...'

'কী, স্যার?' কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারছে না মুসা।

'প্রোজেক্টর। মিনি প্রোজেক্টর। লাইটিং খুব কমিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দেয়ালে ছবি ফেলা হয়েছে, আর কিছু না। রঙিন ছবি।'

'কিশোরের হাতের ওই টর্চটা?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'এটা টার্নারের অফিসে খুঁজে পেয়েছি। জাপানের তৈরি। দেয়ালে ছবি ফেলে টর্চটা যেদিকে ঘোরাবে সেদিকেই যাবে ছবি। ওপরে নিচে কিংবা পাশে দ্রুত নাড়ালে মনে হবে ছবিটা নাচছে। একটা সুইচ আছে, এই যে এটা, এটা দিয়ে লাইট কন্ট্রোল করা যায়, আলো কমানো বাড়ানো যায়। মিস্টার হুয়াঙ দিয়েছেন এটা টার্নারকে।'

'কি করে জানলে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'টার্নার বলেছে।'

'টার্নারই তাহলে ভূত দেখিয়েছে?' মুসা বলল।

'সে-ও দেখিয়েছে, মরিসনও দেখিয়েছে। টর্চের মত দেখতে, হাতে নিয়ে ঘুরলে কেউ সন্দেহ করে না। পকেটেও জায়গা হয়,' পকেটে ঢুকিয়ে রাখল কিশোর। 'তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে স্যুভেনির রাখব এটা।' চিত্রপরিচালকের দিকে ফিরে বলল, 'তাহলে এখন যাই, স্যার।'

'কিছু খাবে না? আইসক্রীম?'

মুসার মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেল, কিন্তু সেদিকে খেয়াল না দিয়ে উঠে পড়ল কিশোর।

'না, স্যার, বাড়ি গিয়ে একবারে খাব। চলি।'

একে একে বেরিয়ে গেল ওরা অফিস থেকে।

পেছনে তাকিয়ে রইলেন চিত্রপরিচালক। আপনমনেই বিড়বিড় করলেন, 'আশ্চর্য এক ছেলে! শার্লক হোমসের কিশোর সংস্করণ। শুধু একটা কুকুরের আচরণ থেকেই...' হাত বাড়িয়ে বেলপুশ টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন। লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

—ঃ০ঃ—